শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

Vol-32

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বার্ত্তিক

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাবিত্রী	...
আত্রেয় ঋষিদের অগ্নিযজ্ঞ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
দুটি শিক্ষা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা	পবিত্র
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী	
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
গল্প শোনো মণিবালা	সোমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত
উঠে চল	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
প্রণামের পর	সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কঠিন ডানায় ওড়া	বীরবাহু

বর্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে কোনো সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিস কিম্বা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: **Nolini Kanta Gupta**
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry—2

"ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া বঙ্গজননী উঠিতেছে···

—শ্রীঅরবিন্দ

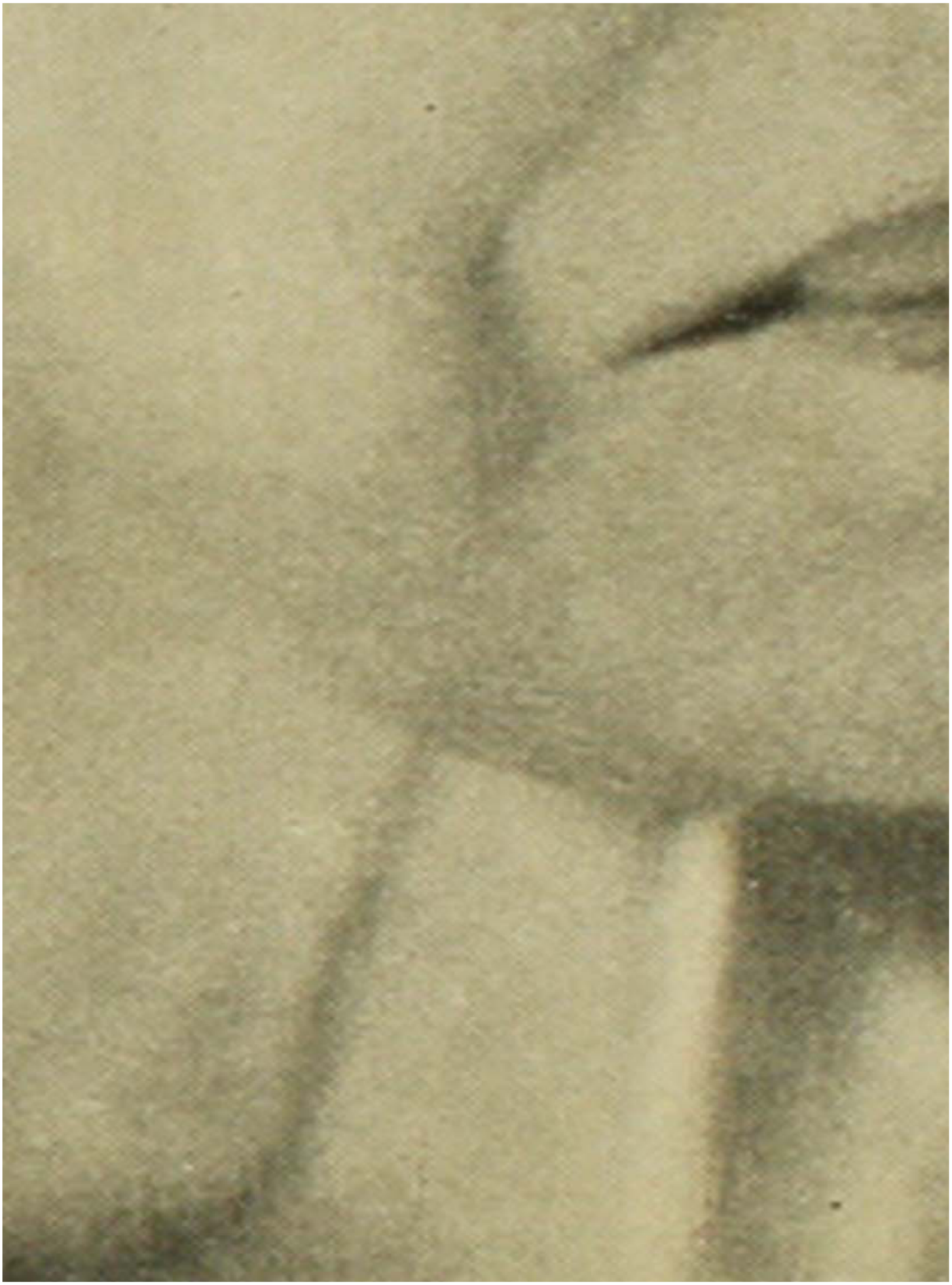

বঙ্গজননী

এক উপসাগরে বিধৌত, একই হিমগিরিমালায় বেষ্টিত, নিকটাগীয় নদনদীমালার পরিস্নাত ও উর্বর, এক আবহাওয়ার পরিমণ্ডলে শোভিত, এক ইতিহাসের ঐতিহ্যে ও মনস্তত্ত্বের গ্রন্থিতে নিবিড়, এক ভবিষ্য সিদ্ধির দিকে একই নিয়তি-প্রচালিত, একই ভাষার বন্ধনে অভিন্ন এত রত্নে ভরা এই বঙ্গ। বঙ্গদেশ আর বাংলাদেশ এক বঙ্গজননীর দুই বাহু, এক হৃদ্‌পিণ্ডের দুই কক্ষ, এক চেতনার ও এক দেশাত্মার পরস্পর অনুপূরক দুটি ছন্দ ও স্পন্দন। কবি শিল্পী দার্শনিক সাধক বারোভরের অমর দানে নিত্যপ্রদীপ্ত বঙ্গজননীর এই মধুরানন।

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

পূর্ণ আন্তরিকতা বাস্তব ক'রে তুলতে হ'লে মূল প্রয়োজন হ'ল চৈত্যসত্তাকে ঘিরে সমগ্র আধার ঐক্যবদ্ধ করে ধরা।

—শ্রীমা

সাবিত্রী

পর্ব্ব ২—সর্গ ৮

নিশার জগৎ—অশুভের জননী ও তন্দ্রিত্রার পুত্রগণ

ত্রিলোকের যাত্রীকে এ সকলেরও সম্মুখে দাঁড়াতে হবে সাহসে ভর করে।
অনাদি দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের যোদ্ধা সে,
প্রবেশ করেছে বুক হতাশার রাত্রিগর্ভে,
তন্দ্রিত্রাকে রণে আহ্বান করে সে
তার জ্যোতির্ম্ময় অন্তঃপুরুষ ভর করে।
পদক্ষেপে তার ত্রস্ত আঁধার-প্রবেশদ্বার :
পৌঁছিল সে হিংস্র আর্ত্ত রাজ্যে এক,
বাস করে সেখানে আত্মা যত কখন আস্বাদন করে নাই আনন্দ ;
অজ্ঞান তারা জন্মান্ধ মানুষের মত
আলো যারা জানে নাই কোনদিন ;
হীনতম শ্রেয় আর শ্রেষ্ঠতম শ্রেয় সমান মূল্যের তাদের কাছে,
তাদের চোখে পুণ্য হ'ল পাপেরই আর এক মূর্ত্তি,
দুর্ম্মতি আর দুর্গতি হ'ল তাদের স্বাভাবিক স্থিতি।
নিষ্ঠুর এক প্রশাসনের দণ্ডবিধি
দুঃখ আর বেদনাকে করেছে সর্ব্বসাধারণ নিয়ম,
আদেশ দিয়েছে বিশ্বব্যাপী নিরানন্দের জন্য,
জীবনকে পরিবর্ত্তিত করেছে কৃচ্ছ্রসাধ্য অনুষ্ঠান হিসাবে
আর আত্মনির্য্যাতন হয়েছে দৈনন্দিন পার্ব্বণ।
আইন করে সুখভোগকে দণ্ডনীয় করা হয়েছে ;
হাস্য আর লাস্য নির্ব্বাসিত হয়েছে নিদারুণ পাপ হিসাবে
প্রশ্নহীন মনকে সুবিজ্ঞ পরিতৃপ্তির স্থান দেওয়া হয়েছে,
আর বিমূঢ় হৃদয়ের নিঃসাড় নীরবতা হয়েছে শান্তি :
সুপ্তি নাই সেখানে, অসাড়তাই একমাত্র বিশ্রাম ;
মৃত্যু আসে কিন্তু আরাম দেয় না, দেয় না নিবৃত্তি।

অন্তঃপুরুষ বেঁচে থাকে আর আরো আরো দুঃখভোগ করে চলে।
সেই বেদনার রাজ্যে গভীর হতে আরও গভীরে
সে খুঁড়েই চলেছে,
চারিদিকে একটা ভীতিকর জগৎ বেড়ে চলেছে কেবল,
যেখানে যন্ত্রণার পর আসে তীব্রতর যন্ত্রণা
আর সেই ভীতির অন্তরে রয় এক বিপুল বিকৃত উল্লাস,
আপনার ও অপরের পরম বিপদে পরম আনন্দ।
মনের ও প্রাণের ধারা সেখানে সুদীর্ঘ দণ্ডভোগ এক
নিঃশ্বাস শুধু দুর্ভার, সকল আশা কশাঘাত,
শরীর নির্যাতনের ক্ষেত্র, একটা ঘনীভূত অস্বস্তি;
বিশ্রাম হল বেদনা হতে বেদনান্তরে অপেক্ষা করা।
বিশ্ববস্তুর এই যে বিধান তার পরিবর্ত্তন
স্বপ্নেও কেউ দেখেনি;
হৃদয় কঠিন ছায়াগ্রস্ত, মন কঠোর হাস্যহারা,
সুখ তারা বর্জ্জন করে যেন দুঃসহ বিষ্টতা;
প্রশান্তি কেবল বিরাগ উদাসা,
শুধু বেদনার ভিতর দিয়ে জীবন বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে,
তার প্রয়োজন বেদনার উগ্র কটুস্বাদ আর অশ্রুর তীব্র লবণস্বাদ।
বেঁচে না থাকাই হত যেন পরম মঙ্গল
আর না হয় রূঢ় ইন্দ্রিয়ানুভব সেয় যদি সামান্য উদ্দীপনা
ঈর্ষ্যার লেলিহান শিখা দহন করে যা বিকৃত হৃদয়কে,
মারণোদ্যত ঘৃণা আর ক্রোধ আর লালসার দংশন,
আর যে অস্ফুট যন্ত্রণা ভুলায়ে নিয়ে যায়
আঁধার গর্ত্তের অভিমুখে
আর কৃতঘ্নতার খড়্গাঘাত—
এরাই উজ্জ্বল বিন্দু এঁকে যায় ত্রিমিত আর্ত্ত নিমেষধারার উপরে।
সুখহারা নাটক দেখে চলা,
দেখে চলা নিয়তির নিপীড়নতলে জীবকুলের দুঃসহ যন্ত্রণা,
আর দুঃখের করুণ নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত রাত্রির গর্ভ অভিমুখে,
আর সেই বিতীষিকা ভীতির উত্তাল হৃদয়স্পন্দন—
এই সব হ'ল উপাদান মহাকাল মিশায়েছে তার আপূর্ণ ভৃঙ্গারে,
এরই মধ্যে তৃপ্তি তার, তিক্ত আস্বাদ ভোগে
এরাই করে সহায়তা।

জীবনের সুদীর্ঘ নরক গঠিত হয়েছে এইসব উগ্র পদার্থের ভারে
এই সব তন্তু দিয়ে গড়া জাল পেতেছে কৃষ্ণকায় উর্ণনাভ.
অন্তঃপুরুষ বাঁধা পড়েছে সেখানে অসহায় মল্লযুদ্ধ ;
এই হয়েছে ধর্ম, এই হয়েছে প্রকৃতির শাসন।
অনাচারের ক্রূর কোন এক গর্ভগৃহে,
শক্তির এক নির্মম কালো মূর্তির পূজা,
হাঁটু পেতে পায় হয়ে যেতে হবে হৃদয়হীন পাথরের প্রাঙ্গণ,
পাপ নিয়তির প্রসারে গাঁথা যেন উঠান।
প্রতিটি প্রস্তর সেখানে যেন নির্দয় বলাৎকারের শাণিত ধার,
জমাট সেখানে নির্যাতিত বক্ষের হিমশীতল রক্তধারা
শুষ্ক গ্রন্থিসার বৃক্ষেরা দাঁড়িয়ে মরণোন্মুখ মানুষ যেন
যন্ত্রণায় যেন স্তব্ধ মূর্তি :
প্রতি গবাক্ষ হতে উন্মুখ পাপের পুরোহিত
স্বস্তিমন্ত্র গায় বলিদানের অন্তিম শান্তিজল ছড়ায়ে যেন—
নগরের পর নগর উৎপাটিত, গৃহের পর গৃহ উৎসাদিত,
ভস্মীভূত কুণ্ডলিত দেহপুঞ্জ, অগ্নিশেলের মহামরণ
"আমাদের শত্রুকুল নিপতিত, নিপতিত", গায় তারা,
"আমাদের ইচ্ছার বিরোধী ছিল যারা সবাই তারা
এখন আহত নিহত
কত মহান আমরা এখন, কত করুণাময় তুমি, হে মহেশ্বর।"
এইভাবে চায় তারা ভগবানের অচঞ্চল সিংহাসনে পৌঁছিতে,
তাঁকেই শাসন করবে সর্বতোভাবে চিরকাল যাঁর বিরোধী তারা,
অতিকায় করে তোলে আপনাদের কৃতি
তাঁর আকাশ স্পর্শ করবে বলে,
তাদের পাপ কর্মে করবে তাঁকে সহযোগী।
করুণায় হৃদয় আর্দ্র হয়না কখনও এখানে,
নিষ্করুণ বলাৎকার আর লৌহসার মনোভাবের
পূর্ণ রাজত্ব এখানে,
অনাদি কাল একাধিপত্য করে বিভীষিকা আর অন্ধকার :
এই বস্তু গ্রহণ করেছে এক তামস ভগবানের মূর্তি,
একে পূজা করে নির্যাতিত যত দুঃস্থতা সে নিজে সৃষ্টি করেছে,
নিজেই সে দাসত্বে বেঁধে রেখেছে দুঃখী জগৎ এক
অসহায় হৃদয় সব চিরন্তন বেদনার যূপকাষ্ঠে নিবদ্ধ,

আরাধনা করে সেই পদযুগল কর্দ্দমতলে যে পিষে রাখে তাদের।
দুঃখের ঘৃণার জগতে দুঃখের একমাত্র আনন্দ ঘৃণায়,
আর অপরকে ঘৃণা করে দুঃখের মহাভোজ,
তিক্ত কাষ্ঠহাসা বেদনাক্লিষ্ট ওষ্ঠাধরে টেনে দিয়েছে কুটিল রেখা,
শোকাবহ নিষ্ঠুরতা পেয়েছে তার শঙ্কাবহ সুযোগ।
ঘৃণাই হ'ল সে জগতের ছায়াচ্ছন্ন অপদূত,
জ্বলে তার ঘোরবর্ণ মণি এক বক্ষের মাঝে—
অন্তঃপুরুষ দগ্ধ হয় তার অশুভ কিরণাবলীর স্পর্শে,
আপন শক্তির ক্রূর পাতালগর্ভে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে সে।
এই যত মন্দ আবেগ জড় পদার্থেরাও তাদের করে যেন বিকিরণ,—
কেননা মন তার প্লাবনধারায় প্রবেশ করেছে গিয়ে নিষ্প্রাণের মধ্যে,
আর নিষ্প্রাণেও দান করে দুর্ম্মতি, যে দুর্ম্মতি সে গ্রহণ করে নিয়েছে,
সে সব ব্যবহার করে তাদের বিরুদ্ধে যারা ব্যবহার করে
অশুভ শক্তিসব,
হস্তহীন হ'লেও আঘাত করে তারা,
অপ্রত্যাশিত আকস্মিকভাবে হানে মৃত্যু,
অদৃশ্য এক নিয়তির নির্ব্বাচিত যন্ত্র তারা।
অথবা তারা হয়ে দাঁড়ায় অন্তিম কারাগৃহ যেন
মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মানুষ যেখানে জেগে থাকে মন্থরগামী
প্রহরের শ্রেণী পার হয়ে,
নির্দ্দয় ঘন্টাধ্বনি একে একে গণনা করে যায় তাদের সংখ্যা।
পাপ পরিবেশ পাপী জীবকে আরও পাপী করে তোলে;
সব সেখানে সচেতন, সব সেখানে বিকৃত।

আত্রেয় ঋষিদের অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

পঞ্চম মণ্ডল—পঞ্চম সূক্ত

সুসমিদ্ধায় শোচিষে ঘৃতং তীব্রং জুহোতন।
অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥

সুসমিদ্ধায়—পূর্ণ প্রজ্বলন্ত (কে) অগ্নয়ে—অগ্নিকে
শোচিষে—উজ্জ্বল শিখাময় (কে) জাতবেদসে—জন্মজ্ঞানীকে
ঘৃতম্—ঘন দীপ্তি, তেজ তীব্রম্—তীব্র
জুহোতন—অর্পণ কর

সুসমিদ্ধ শুভ্র জ্যোতির্ময় জন্মজ্ঞানী অগ্নির জন্য তীব্র ঘনঘন স্বচ্ছতা আহুতি অর্পণ কর ॥১॥

নরাশংসঃ সুষূদতীমং যজ্ঞমদাভ্যঃ
কবিহি মধুহস্ত্যঃ ॥

নরাশংসঃ—দেবশক্তি-প্রকাশক, দেবতাদের মুখপাত্র কবিঃ—সত্যদ্রষ্টা
হি—কারণ
সু-সূদতি—বেগে প্রচালিত করে ইমম্—এই মধুহস্ত্যঃ—মধুহস্ত, সোমবাহক
যজ্ঞম্—যজ্ঞকে অদাভ্যঃ—অদম্য

দেবতাদের মুখপাত্র তিনি এই অদম্য যজ্ঞযাত্রাকে বেগে চালিয়ে দিয়েছেন, তিনি হলেন মধুহস্ত দ্রষ্টা কবি ॥২॥

ঈলিতো অগ্ন আ বহেন্দ্রং চিত্রমিহ প্রিয়ম্।
সুখৈ রথেভিরুতয়ে ॥

ঈলিতঃ—পূজিত, আরাধিত সুখৈঃ—সুখকর
অগ্নে—হে অগ্নি রথেভিঃ—রথে করে
আ বহ—বহন করে আন ইন্দ্রম্—ইন্দ্রকে উতয়ে—অভিবৃদ্ধির জন্য, বিজয় বা রক্ষণের জন্য
চিত্রম্—সুন্দর বৈচিত্র্যময়, শোভন
ইহ—এখানে প্রিয়ম্—প্রিয়

হে অগ্নি, তুমি আমাদের পূজিত ইষ্ট, এখানে তুমি আমাদের প্রিয় শোভনোজ্জ্বল ইন্দ্রকে তাঁর সুখকর রথে করে নিয়ে এস আমাদের অভিবৃদ্ধির জন্য ॥৩॥

ঊর্ণম্রদা বি প্রথস্বাভ্যর্কা অনূষত।
ভবা নঃ শুভ্র সাতয়ে ॥

ঊর্ণম্রদাঃ—ঊর্ণের মত মৃদু
বি প্রথস্ব—উদার প্রসারিত হও
অভি—তোমার দিকে
অর্কাঃ—আলোকরশ্মিরা, জ্যোতির্ময় বাক্
অনূষত—উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে
ভব—হও
নঃ—আমাদের
শুভ্র—হে শুভ্র
সাতয়ে—বিজয়ের জন্য

ঊর্ণের মত কোমল হয়ে প্রসারিত হও তুমি, তোমার অভিমুখে আমাদের জ্যোতির্ময় কণ্ঠ উদ্ভাসিত হয়েছে। আমাদের বিজয়ের জন্য, আমাদের মধ্যে তুমি হয়ে ওঠ শ্বেতশুভ্র ॥৪॥

দেবীর্দ্বারো বি শ্রয়ধ্বং সুপ্রায়ণা ন উতয়ে।
প্রপ্র যজ্ঞং পৃণীতন ॥

দেবীঃ—হে দৈব
দ্বারঃ—দুয়ার
বি শ্রয়ধ্বম্—উদার উন্মুক্ত হও
সুপ্র+অয়না—সুষ্ঠু অগ্রগতিশালী (তোমরা)
নঃ—আমাদের
উতয়ে—বিস্তৃতির জন্য
প্র+প্র—সম্মুখে সম্মুখে
যজ্ঞম্—যজ্ঞকে
পৃণীতন—পূর্ণ করে চল

হে দিব্যদ্বার, উদার প্রসারিত হও তোমরা, সুগম হও তোমরা আমাদের অভিবৃদ্ধির জন্য। পূর্ণতর, আরও পূর্ণতর কর আমাদের যজ্ঞকে ॥৫॥

সুপ্রতীকে বয়োধৃধা বহ্বী ঋতস্য মাতরা।
দোষাবুষাসমীমহে ॥

সুপ্রতীকে—সুষ্ঠু প্রতিমা (তোমরা)
বয়ঃ+ধৃধা—বিস্তৃত সত্তার বর্দ্ধক
বহ্বীঃ—মহতী, শক্তিমতী
ঋতস্য—সত্যের
মাতরা—মাতা
দোষাম্—রাত্রিকে
উষসম্—উষাকে
ঈমহে—কামনা করি

আমাদের সম্মুখে সুদর্শনা সত্যের শক্তিময়ী যুগল মাতা আমাদের সত্তার প্রসার বর্দ্ধন করেন যাঁরা, সেই দিবস-রাত্রিকে আমরা কামনা করি ॥৬॥

বাতস্য পন্থামীলিতা দৈব্যা হোতারা মনুষঃ।
ইমং নো যজ্ঞম্ গতম্ ॥

বাতস্য—(প্রাণ) বায়ুর
পন্থাম্—পথে, পথ ধরে
ঈলিতা—পূজিত দৈব্যা—দিব্য
হোতারা—হোতৃরা (সম্বোধন—দ্বিবচন)
মনুষঃ—মানুষের
ইমম্—এই
নঃ—আমাদের
যজ্ঞম্—যজ্ঞে
আ+গতম্—এসে উপস্থিত হও

পবনের পথ ধরে, হে পূজিত যুগল, মানুষের দিব্য হোতা, আমাদের এই যজ্ঞে এসে উপস্থিত হও ॥৭॥

ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ।
বহিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ ॥

ইলা—ইলা, সাক্ষাৎদৃষ্ট জ্ঞান
সরস্বতী—সরস্বতী, অনুপ্রেরণা-স্রোত
মহী—মহী, বৃহতী
তিস্রঃ—তিনজন দেবীঃ—দেবী
ময়ঃ+ভুবঃ—আনন্দ-জননিত্রী, সুখদাত্রী
বর্হিঃ—আসনে, যজ্ঞাসনে
সীদন্ত—উপবেশন করে যেন
অস্রিধঃ—অস্খলিত, যাদের স্খলন নাই

ইলা, সরস্বতী, মহী এই যে ত্রয়াদিনী দেবীত্রয়, অস্খলিতপদে তাঁরা যেন এই যজ্ঞাসনে স্থানগ্রহণ করেন ॥৮॥

শিবস্ত্বষ্টরিহা গহি বিভুঃ পোষ উত ত্বনা।
যজ্ঞে যজ্ঞে ন উদব ॥

শিবঃ—মঙ্গলময়
ত্বষ্টঃ—রূপকার দেবতা
ইহ—এখানে আ গহি—এস
বিভুঃ—সর্ব্বব্যাপী
পোষে—পোষণকর্ম্মে উত—এবং
ত্বনা—নিজেকে নিয়ে
যজ্ঞে যজ্ঞে—যজ্ঞের পর যজ্ঞে, সকল যজ্ঞে
নঃ—আমাদের
উৎ—ঊর্দ্ধগমনে
অব—রক্ষা কর, পোষণ কর

হে মঙ্গলময় রূপকর্ত্তা, এখানে এস তুমি, তোমার সর্ব্বব্যাপী পোষণকর রূপে আর তোমার আপন স্বরূপে যজ্ঞের পর যজ্ঞে আমাদের ঊর্দ্ধে নিয়ে চল তোমার রক্ষণা দিয়ে ঘিরে ॥৯॥

যত্র বেত্থ বনস্পতে দেবানাং গুহ্যা নামানি।
তত্র হব্যানি গাময় ॥

যত্র—যেখানে বেত্থ—তুমি জান তত্র—সেখানে
বনস্পতে—হে আনন্দের অধিপতি বা অধিষ্ঠা হব্যানি—(আমাদের) আহুতি
দেবানাম্—দেবতাদের গাময়—নিয়ে চল
গুহ্যা—গুপ্ত নামানি—নাম সব

হে আনন্দের অধিষ্ঠা, যেখানে তুমি জান রয়েছে দেবতাদের গুপ্তনাম সেখানে নিয়ে চল আমাদের নৈবেদ্য ॥১০॥

স্বাহাগ্নয়ে বরুণায় স্বাহেন্দ্রায় মরুদ্ভ্যঃ।
স্বাহা দেবেভ্যো হবিঃ ॥

স্বাহা—স্বাহা বলি স্বাহা—স্বাহা বলি
অগ্নয়ে—অগ্নিকে দেবেভ্যঃ—দেবতাদের উদ্দেশ্যে
বরুণায়—বরুণকে হবিঃ—(আমাদের) আহুতি
স্বাহা—স্বাহা বলি ইন্দ্রায়—ইন্দ্রকে
মরুদ্ভ্যঃ—মরুৎ সকলকে

স্বাহা বলে অগ্নিকে বরুণকে উৎসর্গ করি, স্বাহা বলি ইন্দ্রকে মরুৎগণকে উদ্দেশ্য করে, স্বাহা বলে দেবতাসকলকে আহুতি অর্পণ করি ॥১১॥

দুটি শিক্ষা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

জীবন হতে—এখন বলতে পারি আমার এই সুদীর্ঘ জীবন হতে—আমি দুটি শিক্ষা লাভ করেছি, সেই কথা আজ বলব। জীবনকে সুন্দর করে গড়তে হ'লে—ব্যক্তিগত জীবন এবং সমষ্টিগত জীবন উভয়তঃ—এই দুটিতে আমার মনে হয় এনে দেবে অবার্থ সাফল্য; কারণ এরাই হ'ল অপরিহার্য্য এবং অবিচল প্রতিষ্ঠা।

প্রথম, অপরের উপর দোষারোপ কখনও করবে না। সচরাচর—সচরাচর কেন সদাসর্বদাই কোথাও কিছু ভুল-ত্রুটি নজরে পড়লে আমরা তার হেতু আবিষ্কার করি বাহিরের অবস্থায় অথবা অপর কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু আসল হেতু যে আমি স্বয়ং, অন্ততঃ হেতুর হেতু, তা আমাদের জ্ঞানগোচরে পড়ে না অথচ তাই হ'ল অব্যভিচারী, অবিসংবাদী সত্য।

আমি যদি দুঃখী, তার কারণ আমি নিজে। এ'ত হ'ল আমাদের প্রাচীন পরিচিত কর্মবাদ। আমার জীবনে যা কিছু ঘটে তা আমার নিজের কর্মফল—সে কর্মের বা কর্ম-ফলের আর কোন ব্যক্তি বা বস্তু ভাগী নয়। আমাদের সকলের পরিচিত একটি গানের সেই মর্মস্পর্শী কথা ক'টি—

দোষ কারু নয় গো, শ্যামা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি, ও মা।

এ কেবল আবেগ-উচ্ছ্বাস নয়, কাব্যবিলাস নয়, এ হ'ল রূঢ় বাস্তব কথা, নিছক বৈজ্ঞানিক সত্য।

স্মরণে রাখতে হবে, যে কোন দোষ বা ত্রুটি আমি বাইরে দেখি না কেন, ঠিক সেই দোষ বা ত্রুটি রয়েছে আমার মধ্যে; তা আমি দেখি না, কারণ আমার দৃষ্টি স্বভাবতঃই বহির্মুখী। বিশ্বের গঠনই এই রকম—তাই বলা হয়, যা রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডে তাই রয়েছে ভাণ্ডে, যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। এই কথা অন্য ভাষায় বলা হয়—যা নাই ভারতে তা নাই ভূ-ভারতে, যা আছে ভূ-ভারতে তা সবই আছে ভারতে (অবশ্য গোড়ায় কথাটা বলা হয়েছিল মহাভারত সম্পর্কে)। পাশ্চাত্যের জ্ঞানে বিজ্ঞানে এই সত্যকেই বলা হয়েছিল তাদের microcosm (অণুজগৎ) আর macrocosm (বিশ্ব-জগৎ) এই দ্বৈত তত্ত্বের সহায়ে। এই আবিষ্কার চিত্ত-চমৎকারী। তুমি যখন কোন একটি দোষ বা ত্রুটি আবিষ্কার করেছ অপরের মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে, তখন যদি নিজের মধ্যে নিজের চেতনার অন্তরে দৃষ্টিপাত কর, একটু

লক্ষ্য করে দেখ অকপটে, সরলভাবে, তবে ধরা পড়বেই সেই একই দোষ বা ত্রুটি তোমার নিজের অন্তরে, ন্যূনাধিক মাত্রায় হ'তে পারে। মর্ত্যের কোন ব্যক্তিই মুক্ত নয়—যে দোষ ত্রুটি বিশ্বে ছেয়ে আছে, পৃথিবীর মাটির সঙ্গে মিশে আছে, তা থেকে। সুতরাং আমরা যখন অপরকে সংস্কার করতে উন্নত করতে যাই, জগৎকে উদ্ধার করতে উদগ্রীব হ'য়ে উঠি তখন আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে নিজেকে উদ্ধার করা—আত্মানম্ উদ্ধরেৎ। এই কাজটি তোমার প্রথম কাজ এবং সহজ কাজ কারণ তা হ'ল তোমার অধিকারের ক্ষেত্রে। এ কথা বলা অর্থ নয় বাইরের কাজ তুমি মুলতুবী রাখবে বা একেবারে বন্ধ করে দেবে যতদিন না এই আত্মশুদ্ধি ও আত্মসিদ্ধি অর্জন হয় তা নয়, দুটিই যুগপৎ চলবে। বরং বাইরের সংস্পর্শে এসে শুধু বাহিরের ভুল ত্রুটি তুমি আবিষ্কার করবে না, সেই সংঘাতে তোমার নিজের অন্তরের দোষ-ত্রুটিও আবিষ্কার হয়ে পড়বে এবং তোমার সুযোগ মিলবে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার। এ রকমে আমরা নিজের সম্বন্ধে যত সচেতন হয়ে উঠি, নিজেকে যতখানি পরিষ্কৃত ও সমুন্নত করে ধরতে পারি, আমাদের বাইরের কাজও ততখানি পরিষ্কৃত ও সমুন্নত হয়ে উঠবে। নিজের মধ্যে দোষ ত্রুটি দেখার ও স্বীকার করার কোন অপরাধ নাই, কোন লজ্জা নাই। কারণ সমস্ত বিশ্ব হ'ল প্রত্যেকেরই সকলে মিলে অখণ্ড অভিন্ন অভেদ ঐক্য, একটি বিন্দুকে স্পর্শ করলে তার অনুরূপ স্পন্দন সর্ব্বত্র চারিয়ে ছড়িয়ে যায়। তাই আমার মধ্যে যদি আমি কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারি তবে জগতের মধ্যেও সে পরিবর্তনের স্পন্দন আমি তুলে দিতে পারব; জগৎকে সাক্ষাৎভাবে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু আমার নিজেকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা আমার আছে। এই হ'ল মানুষী ব্যক্তিত্বের মহিমা, অন্য কথায় মানুষের মধ্যে মর্ত্যের মধ্যে দেবত্বের অধিষ্ঠান।

ঠিক এর পরের কথাটি হ'ল আমার দ্বিতীয় শিক্ষার কথা—মানুষের মধ্যে এই যে স্বেচ্ছাশক্তি, একে যতদূর সম্ভব ক্রমে উর্দ্ধে তুলে ধরতে হবে এবং তা করতে সে যতখানি সক্ষম হবে চেষ্টার ফল ও কর্ম্মের ফল তত সুষ্ঠু হয়ে চলবে। ইংরাজীতে কথায় বলে Hitch your wagon to the star—তোমার গাড়িখানা তুলে ধরে তারার সঙ্গে জুড়ে দাও। অর্থাৎ তোমার লক্ষ্য হবে গন্তব্য হবে উর্ধ্বতন, সুদূরতন। সমতলে পড়ে থাকা নয়—সেখানেই এগিয়ে চলা বা প্রসার করে নেওয়া নয়—পরিচিত সমতল ছেড়ে উঠে চলতে হবে—উন্নতির বাচ্যার্থই তাই। কেবল প্রগতিই নয়, কেবল এগিয়ে চলা নয়, তার সঙ্গে উঠে চলতে হবে, প্রগতির সঙ্গে উন্নতি।

মানুষের দুর্ভোগ এইজন্য যে তার চেতনা পড়ে আছে একান্ত নিম্নতন স্তরে— দেহের ও প্রাণের দাবী নিয়ে, সামান্য কিছু মনের ভরসা নিয়ে, মানুষের মধ্যে যারা জ্ঞানে

চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম তাঁরাও এই পরিধির মধ্যে আবদ্ধ। মানুষকে ছাড়িয়ে উঠতে হবে শুধু দেহ-প্রাণের নয়, মনেরও বেড় ছাড়িয়ে আরও একটু উচ্চস্তরে। সমাজের পক্ষে, সমষ্টি জীবনের পক্ষে এ মুহূর্তে এ কাজটি করবার ক্ষমতা হয়তো নেই, কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিবিশেষের সে ক্ষমতা আছে। সমাজে যাঁরা অগ্রণী, পুরোধা, দিশারী, লোকনেতা তাঁদের অন্তত: জানতে হবে, লাভ করতে হবে এই উর্দ্ধতর স্থিতি। কেমন করে? কি উপায়ে?

—তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। *

---

* ('বসুমতী' দীপাবলী সংখ্যা ১৩৭৮ থেকে পুনর্মুদ্রিত)

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(২৬)

সম্যক্ জ্ঞানযোগের প্রসঙ্গে এ পর্যন্ত বৈরাগ্য একাগ্রতা চিত্তশুদ্ধি নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করে দেখা গেল, এগুলি জ্ঞানযোগের অপরিহার্য সাধন। এর সবগুলিকে পূর্ণযোগে সুসমঞ্জস সাধনায় মিলিয়ে নিয়ে চলতে হবে, দৈনন্দিন ব্যবহারে প্রয়োগ করে সার্থক করে তুলতে হবে। জ্ঞানযোগের সাধনায় প্রথমেই ভাবনা মন ও বুদ্ধিকে গুছিয়ে নিতে হয়। না হলে জ্ঞান ও শক্তি সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত হয় না ; আবার সেই প্রকাশকে সুনিয়ন্ত্রিত করাকে বলতে পারি বিনিয়োগ।

কর্মযোগের প্রসঙ্গে ইচ্ছাশক্তি ও সঙ্কল্পশক্তি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এখন নিজেকে জগৎকে ও জগদতীতকে জানা নিয়ে যে জ্ঞানের সাধনা, তাই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য। এই জ্ঞানী হওয়া বা জ্ঞানের সাধনা যোগের সাধকমাত্রকেই করতে হয়। এবং কর্মযোগে কর্মযোগ বা যজ্ঞ সাধনার পূর্ণ তায় এই জ্ঞানলাভই লক্ষ্য, না হলে কর্মেরও পরিসমাপ্তি হয় না। জগৎকে জানা, উর্ধ্বতত্ত্বকে জানা ও সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে বা নিজেকে জানা এইভাবে জ্ঞানের ত্রিধারায় পূর্ণযোগের জ্ঞানী প্রতিনিয়তই অবগাহন করতে থাকেন, সেই ত্রিপথগার প্লাবনে তিনি আনন্দে মগ্ন লসিত ও শান্ত থাকেন। তাই যে আত্মজ্ঞানকে জ্ঞানযোগের লক্ষ্য বলা হয়, সেখানে বিষয়ের জ্ঞানরূপে যতক্ষণ জগতের বা বহির্বিশ্বের জ্ঞান ও বিষয়-নিষ্ঠ আত্মজ্ঞান হয়, ততক্ষণ ঠিক বোধে বোধ হয়, এ বলা চলে না। আত্মবোধশক্তি তখনও সক্রিয় হয় না। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ এই দুই-ই জ্ঞাতব্য। কাজেই অন্তর্মুখী হয়ে আত্মবোধ নিয়ে বিষয়কে যে জানছে সেই বিষয়ীকে জানতে পারলে আত্মজ্ঞান যথার্থ হয়। এই জানার শিক্ষা ও কৌশলকেই উপনিষৎ বলেছেন পরাবিদ্যা। জ্ঞান তখন অন্তর্মুখী হয়ে নিজের দিকেই নিবিষ্ট। এই যে আদর্শ "আত্মানং বিদ্ধি", এরও দুটি দিক আছে আত্মপুরুষকে জানা আর আত্মপ্রকৃতিকে জানা।

আমি স্বরূপত কি, তা জানতে গিয়ে দেখি যে আমি অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে আছি আর তাকেই "আমি" বলে জানছি। কিন্তু সে সবই দেখি বাহিরের বস্তু ; বাহির থেকে এসেছে, চৈতন্যে ভাসছে আর তার সংস্পর্শে এলে আমি কেবল তাতে চঞ্চলতা অনুভব করি, তাই সে সবে আমার আশ্রয় বা স্থিতি পাই না। তখনই বুঝতে পারি যে, আমার এ পরিচয় তো সুখের নয়, এ সব তো অপরা প্রকৃতির মধ্যেই পড়ে রয়েছে। সেখানে প্রকৃতির গুণের লীলা, গুণক্ষোভ সবকিছুকে সর্বদা এলোমেলো করে দিচ্ছে। আমার যথার্থ আমি কোথায়, এর মধ্যে তা খুঁজে পাই না। এই দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ সত্তার ওপারে যে

অবিকৃত সত্তা তাকে জানার আগ্রহ তখন প্রবল হয়। তাই প্রথম শিক্ষা হল সাংখ্য ভাবনা অনুযায়ী সাক্ষী চৈতন্যে অধিষ্ঠানরূপে দ্রষ্টা হয়ে অবস্থিত থাকা—শুধু যেন দেখে যাই, আমার আমি তাতে জড়িয়ে না পড়ে। পূর্ণযোগের সাধনায় প্রথম করণীয় এই নিম্নপ্রকৃতির অধীন না হওয়া, তাকে আমার বলে স্বীকার না করা। ভাবনা চিন্তাও যা আসে তারও সাক্ষী হয়ে থাকা, মনেরও দ্রষ্টা হওয়া একটা বড় সিদ্ধি। ভাবনা থেকে মনকে যখন ছাড়াতে পারি না, মনে চিন্তার জট পাকায়, তখন শান্ত হয়ে বসে দেখতে চেষ্টা করতে হয় যে, চিন্তাস্রোত কোথা থেকে কিভাবে কোথায় আসছে। ভাবনার উৎপত্তি কোথায়, দেখতে শিখলে দেখা যাবে তারা আসে আবার মিলিয়ে যায়। আকাশে যেমন পাখীগুলি বাতাসে ভেসে আসে, ভেসে উড়ে চলে দিগন্তে উধাও হয়ে যায়, তেমনি চিত্তাকাশের বিস্তৃত পটে শূন্যতার শান্তির ওপরেই এগুলিকে আসতে যেতে দিতে হয়। তাতে ভাবনা-চিন্তার 'পরে সংযম আসে আর আত্মপুরুষকে জানা যায়। আমার ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে যে মূল আমি, যার জন্যই আমার সব কিছু ভোগ, যাকে কেন্দ্র করে প্রকৃতির গুণলীলা, সেই কেন্দ্রস্থ আমি জগদাত্মারই একটি স্ফুলিঙ্গ। উপনিষৎ তাকেই বলেছেন প্রাজ্ঞাত্মা। তিনি আত্মদীপ হয়ে জ্বলছেন আমার অন্তরতম গুহায়। সেই অগ্নি প্রকাশিত হতে থাকলে, তার দীপ্তিও উজ্জ্বল সংহত ও ব্যাপ্ত হতে থাকে। এই প্রাজ্ঞাত্মাই বিশ্বব্যাপ্ত চৈতন্য হয়ে হন মহাত্মা, দীপশিখা হয়ে যায় সূর্যের মত ভাস্বর বৃহৎ সর্বব্যাপী চৈতন্য। স্থাবরজঙ্গম সবেরই তিনি আত্মা। আমরা মহাপুরুষদের মহাত্মা বলে থাকি, এই মহাত্মার জন্যই। মহান্ আত্মায় আত্মার মধ্যে সর্বভূতকে দেখা যায়, পাওয়া যায়। সববেদনায় সহানুভূতিতে সকলের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে সবের মধ্যে এক আত্মারই বহু রূপ বহু হওয়া যেমন দেখা ও বোঝা যায়, আবার তা ছাপিয়ে তা থেকে যেন পৃথক হয়েও সর্বব্যাপী জগদতীত শান্ত চৈতন্যরূপে সব কিছু ছেয়ে জেগে থাকাও যায়। এই তুরীয় চৈতন্যে পৌঁছে পুরুষ হন শান্ত আত্মা আর এখানেই আত্মার পূর্ণতা। এই তিনকে নিয়ে যে আত্মবিস্ফারণ, শাস্ত্র তাঁকেই বলেন ব্রহ্ম। শান্ত আত্মায় পৌঁছে তবেই তৃষ্ণার শান্তি ও সব কিছু জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে জগৎ ও তার পরিবেশের কথাও আসে। না হলে বহির্জগতের সঙ্গে জটিলতা ও বিরোধ, জগতে থেকে তার হাত হতে আমাদের রক্ষা নেই, আর এখানে তার কোনও সমাধানও নেই। আমরা গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে দেখেছি নানা দিক দিয়ে জীবনের স্রোত বয়ে চলেছে, শ্রীকৃষ্ণ সব কিছু গেঁথে নিয়েছেন তাঁর নিজের মধ্যে, অথচ সব ছাপিয়ে আছেন মহা শান্তিতে মহাসুখে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের মধ্যে কিছুই তো বাদ দেবার নয়। ঘোর যুদ্ধও চলছে কিন্তু সে সব কিছুই শান্ত আত্মায়, যেন তাঁর একটি অংশে মাত্র তা অবস্থিত—"একাংশেন স্থিতো জগৎ।" এই রকম মোক্ষধর্ম নিয়ে যদি কোন, চিন্তানায়ককে নেতারূপে আমরা পাই, তবেই সব কিছু বিরুদ্ধভাবের সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্রহ্ম ও ক্ষত্র উভয়কেই একসঙ্গে তিনি ধরে থাকবেন বৃষভের ভাব নিয়ে। অক্ষরে বিধৃত ক্ষরের লীলা দেখতে শিখলে সার্থক

লীলা দর্শন করতে পারব। ভারতের এই বিরাট আবিষ্কার—কর্মের নায়ক হবেন যোগী। যোগী-চিত্তেই সব কিছু সমস্যার সমাধান, ধর্ম কর্ম সবই পরিশুদ্ধ করে তিনি চলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত যোগীচিত্ত দেশে ও সমাজে অবহেলিত ও অনাদৃত। শিবহীন যজ্ঞ জাতির দেশের ও ধর্মের বিনাশকেই ডেকে আনে।

শ্রীঅরবিন্দ সচ্চিদানন্দের মূল ভাবরূপে যে জ্ঞান, তার পাঁচ লক্ষণ দিয়েছেন. সৎ চিৎ আনন্দকে জানতে হয় আনন্ত্য দিয়ে আর নির্বিশেষ লক্ষণে। সত্তার সত্য স্থিতির ফলে "ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" অচল অটল সুমেরুবৎ সেই দৃঢ়তা যদি সিদ্ধ হয়, তাতে এসে পড়ে চিৎসূর্যের আলো। তখন সেই চৈতন্যে সব রকম সমস্যার সমাধানও সহজ হয়ে যায়। সৎ চিৎ—এর সঙ্গে আনন্দ যুক্ত হবে চিত্ত প্রসন্ন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তার চেয়ে বড় সুখ আর কিছুতে আছে বলেও মনে হয় না। সে চিত্তে উত্তেজনার স্থান নেই, কিন্তু উদ্দীপ্ত সেই চিত্ত শান্ত ও সরল। তার সঙ্গে যোগ হবে আনন্ত্য—সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম। তাঁকেই আনন্দ ব্রহ্মভাবে বোধে পাওয়া যখন হয়, তখন দেখতে হয় মনের মুক্তি হয়েছে তো? এটি চাই, নয়তো সুখ বা আনন্দেরও বন্ধন আছে। ব্রহ্মজ্ঞান হলে পরে চিত্ত জ্ঞানের সংস্কার থেকেও মুক্ত হয়ে যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন জ্ঞান দিয়ে অজ্ঞানকে দূর করতে হয় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে ফেলার মত। তারপর জ্ঞান ও অজ্ঞান দুটি কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। সে এক নির্জ্ঞান অথচ পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থা...চারিদিকে মনের দেয়াল নেই, অসীম সমুদ্রের মাঝে ভরা ঘট যেমন. তেমন হয় আধারের বোধ। আধারে থেকেও পূর্ণ নিরাধার—সেই এক অনির্বচনীয় অবস্থা নির্বিশেষের বোধ। সম্যক্ জ্ঞানের সে সিদ্ধি লাভ করতে হলে চিত্তশুদ্ধি বা ব্যাপক অর্থে আধার শুদ্ধির সঙ্গে একাগ্রতা বৈরাগ্য এই সব সাধনা মিলিয়ে সংযমের প্রয়োজন। অহমিকা এসে পড়লেই অশুদ্ধির আড়াল এসে পড়ে। তাই কিছুতেই যেন চিত্তের স্বচ্ছতা ও পূর্ণতা ব্যাহত না হয়, এইভাবে সাধনায় জোর দিতে হবে।

শুদ্ধির প্রসঙ্গে প্রথমেই একাগ্রতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ আধার শুদ্ধির প্রসঙ্গে বিস্তৃতভাবে এবং আলাদা আলাদা করে সাধনাঙ্গগুলি অর্থাৎ দেহ প্রাণ মন ও অহংএর শুদ্ধির প্রসঙ্গ করেছেন। পতঞ্জলিও বলেছেন যে বিজ্ঞান ভূমিতে না গেলে একাগ্রতা হয় না। সর্বাধারব্যাপী আনন্তশীর্ষ এক আরামের স্বচ্ছ বোধে ধ্যান দেওয়া দরকার। তবেই একাগ্রতা নিটোল ও পূর্ণ হয়। শ্রীঅরবিন্দের এই ভৌম একাগ্রতার (pervasive concentration) নির্দেশ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি—এইখানে তাঁর পূর্ণযোগের সাধনার সঙ্কেত পাওয়া যায়। আমরা সাধারণত ধ্যানের আলম্বন হিসাবে একাগ্রতার অভ্যাস করি না, কোন বৃত্তিকে মনেরই সহায়ে একান্ত করে তুলি। কিন্তু তাকেও তো শেষ পর্যন্ত বৃহৎ চৈতন্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে লয় করে দিতে হয়, তবেই তা একাগ্র ভূমি লাভ করে। এর সহজ উপায় হল ওই আকাশের আলোয় পরিব্যাপ্ত বোধে একাগ্র ভূমিতে স্থিত হবার জন্য যত্ন করা। তখন সম্প্রসন্ন চিত্তে বৃত্তিগুলি সব যেন খেলা করছে দেখা যায়, আবার তাতেই ডুবে যায়। এই অবস্থা লাভ করতে হলেও আবার

বৈরাগ্যের সাধনা চাই, নিরাসক্ত হয়ে অকর্তার বোধে থাকার কথা যেমন বলা হয়েছে। কর্ম করতে হবে কিন্তু কর্মসন্ন্যাস চাই, কর্মে কর্তৃত্বের বোধ থাকবে না।' বাসনা নেই অথচ কর্ম করে চলেছি বা কর্ম হয়ে চলেছে। ফলের আশাও থাকবে বৈ কি! কিন্তু সে ফল নিষ্ফল, কাজেই ইচ্ছামত ফল হল না বলে নিরুৎসাহ হয়ে পড়লে চলবে না। "ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত" কর্ম যোগের কর্ম। তাই কর্মে রস লাগে, না করেও পারি না। কোন দায় নেই তবুও তাঁর লীলাসঙ্গী হয়ে তাঁরই কর্ম করা—এ আনন্দের কি তুলনা আছে। এই ভাব পরিপক্ক হলে প্রকৃতির অধীশ্বর হয়ে কর্ম করবার শক্তি লাভ হয়, গীতায় বলেছেন পুরুষ তখন "ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বর"। সে কর্ম ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলের কর্মেই রস জুগিয়ে চলে কিন্তু অন্তরাত্মা থাকে বৈরাগ্যের পরিমাণে বাধানো।

বৈরাগ্যসহ একাগ্রতার সাধনে এ ভাবে আধার শুদ্ধ করতে পারলে চিত্ত সত্যাকার অন্তর্মুখ হয়, তখন ভেতরে জোর পাওয়া যায়, বীর্যলাভ হয় ও শক্তি বাড়তে থাকে। বহির্মুখিনতা না থাকায় পরে চেতনা ক্রমে গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে, শিখর হতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করে ও ঊর্ধ্বচেতনায় স্থিতি লাভ করে। কিন্তু তখন আর এক দিকে সাবধান হতে হয় যে জগৎ ভুলে যাওয়া চলবে না। "সে বড় বিষম ঠাঁই"। সেখানে জগৎ শূন্যবৎ প্রতীতি হয়, সেই মায়া বা ভ্রান্তি সব ভুলিয়ে দিতে পারে। এটা অতি উচ্চস্তরের অবস্থা কিন্তু ঐ ঊর্ধ্বচেতনায় থেমে গেলেও চলবে না, পরিপূর্ণতা তখনও বাকি থাকে। শূন্য ও পূর্ণ দুইই যেখানে মিলে এক হয়ে আছে, চাই সেই অদ্বয় স্থিতি। পূর্ণযোগে উপলব্ধি এলে তবেই সমন্বয়ের সাধনা সত্য হবে। তাই পূর্ণযোগের জ্ঞানের সাধনায় "কাঁচা আমি" ও তার মিথ্যা জগৎ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি যেমন চাই, তেমনি শুদ্ধ আত্মা বা "পাকা আমি"কে পেয়ে অনুভব করা চাই সেই অখণ্ড আসল "আমিটি" কোথায় আছে। এখানে বসে দেখি "হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে"। তাই জ্ঞানযোগের মূল কথা এই যে সব জড়িয়ে আমার যে সত্তা, তার নানা ফ্যাঁকড়া চারিদিকে ছড়িয়ে যতদূর পর্যন্ত শিকড় গেড়ে বসেছে, সে সব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে হবে। মূলসমেত ঐ ফ্যাঁকড়াগুলি উবড়ে ফেলে মূল উৎস যে সত্য আত্মা, তাকে ফিরে পাওয়াই হল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা, ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা, ব্রহ্ম হয়ে যাওয়া।

আমরা প্রাকৃত জীবনে গুটিপোকার মত কোষে কোষে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি, তাই বৃহৎ হতে পারছি না। এই দেহপ্রাণমনের সঙ্গে শুদ্ধ আত্মাকে জড়িয়ে রেখেছি, তার স্বরূপ দেখতে ও বুঝতে পারি না। দেহ থেকে প্রাণে যদি বা একটু ছাড়া পাই, পরক্ষণে আবার তার ঘূর্ণাবর্তে অস্থির হয়ে মনে জটলা পাকাই। এই তিনের সঙ্গে আত্মাকে একাকার করে রেখেছি শুধু পাঞ্চভৌতিক দেহকেই যদি আত্মা বলে বিশ্বাস করি, তবে জড়জগতের যান্ত্রিকতা ও জড়শক্তিকেই (Physical Energy) সর্বস্ব বলে স্বীকৃতি দিতে হয়। উপনিষদে "অন্নব্রহ্ম" এই জ্ঞানে দেহাত্মবাদের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। একে চার্বাক মত বলা

233945

হয়ে থাকে। কিন্তু চার্বাক মতেও ধূর্ত ও বুদ্ধিমান শিক্ষিত এই দুটো ভাগ আছে। সুবুদ্ধি চার্বাক বৃহস্পতির শিষ্য। অপর পক্ষে, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" বা "eat drink and be merry"—এই মত পোষণ করে এর চেয়ে বেশী বুঝব না, এই নিয়েই গোঁ ধরে যারা বসে আছে, তাদের বোঝানোর সাধ্য কারও নেই। কথায় বলে "শিবের বাবারও সাধ্য নেই" তাদের বোঝাবে। কিন্তু দেহাত্মবাদ ধরে অগ্রসর হলেও এর পরের ধাপ প্রাণাত্মবাদ চেতনার উজানপথে স্বীকার করতে হয়। প্রবল প্রাণশক্তি দেহকে অভিভূত করে ফেলে দেখতে পাওয়া যায়। সুবুদ্ধি চার্বাকের মতেও প্রাণশক্তির উৎস এই সূর্যই। অর্থাৎ দেহ বা পিণ্ডগুলি একটা কেন্দ্র ধরে আবর্তিত হয়ে চলেছে, এটা না দেখলে চলবে না। তাই প্রাণলোককে বাদ দিয়ে দেহকে ধরে রাখা যায় না। এইভাবে প্রাণব্রহ্মের স্বীকৃতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু চেতনা এর পরে অর্থাৎ প্রাণের উর্ধ্বে আর উঠতে চায় না। তবে এতেও পরলোক পুনর্জন্ম এগুলি মানতেই হয়, সে বিষয়ে প্রশ্ন এসে পড়ে। প্রাণকে বৃহৎরূপে দেখতে পারলে চেতনা প্রসারিত হয়, ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্তি মেলে। তাই এই দ্বিতীয় স্তরে মহাপ্রাণের সন্ধান পেলে, তাতে যুক্ত হতে পারলে চেতনার প্রসার ও ঊর্ধ্বায়ন ঘটে। তখন দেখা যাবে এই স্তরকে ছাপিয়ে আছে মনোলোক, মনোময় পুরুষ তার অধীশ্বর। উপনিষৎ যাকে বলেছেন "মনোময় প্রাণশরীর নেতা"। তখন প্রবল প্রাণশক্তি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম হয়ে প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত হয়। দেহ প্রাণ পেরিয়ে মনে পৌঁছনোর অর্থ হল ভূঃ ও ভুবর্লোক পেরিয়ে পেরিয়ে স্বর্লোকে যাওয়া। সেখানে মনোময় চেতনার স্বীকৃতি পেলে প্রাণবাসনারও তর্পণ হয় এক অর্থে, কিন্তু তবু জিজ্ঞাসুর তৃপ্তি সেখানেও মেলে না। মনোবৃত্তিগুলির উৎস কোথায় স্বভাবের নিয়মেই এই প্রশ্ন ওঠে। বৃত্তির তর্পণ হবে কি করে, এই সব মরমী জিজ্ঞাসাও আগে, যেমন কিনা নচিকেতার অতীপ্সায় আমরা জেনেছি। এই কারণে মনোভূমি থেকেই অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা শুরু হয়, আত্মজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে। তখনই যোগ আরম্ভ হয় আর মনোভূমি ছাপিয়ে বিজ্ঞানলোকে পৌঁছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে জানা যায়। আবার তাও ছাপিয়ে নির্বিশেষ তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যা জানতে চেয়েছি তার বিশুদ্ধ আত্মিক (spiritual) রূপটি যদি ধরতে পারি দেখব এই দেহপ্রাণমন পর্যন্ত সব তা থেকেই এসেছে। ঐ নির্বিশেষ তত্ত্বই সব কিছুর উৎস।

এজন্য মনকে নিয়মন করার যে পদ্ধতি শ্রীঅরবিন্দযোগের বৈশিষ্ট্য, সেখানেও যথা-সম্ভব সহজ পথ ধরে চলার নির্দেশ রয়েছে। নেতি নেতি করে যে সাধনা তার প্রয়োজন অনস্বীকার্য হলেও সাধু সন্ন্যাসীদের এই "নেতি"র সাধনা করতে গিয়ে কঠোর তপস্যার ফলে অনেক সময় লক্ষ্যের চেয়ে উপায় বড় হয়ে তাঁদের যোগভ্রষ্ট হতে দেখা গেছে। কৃচ্ছ্র সাধনের ফলে ভ্রান্তিকেই চূড়ান্ত মনে করে সেখানেই থেকে গেলে চলে না। গীতায় এ নিয়ে সতর্ক করে দিয়ে "যুক্তাহারবিহার" হতে বলেছেন। পতঞ্জলিও বলেন দেহপ্রাণমন এ তিনের উর্ধ্বে না যেতে পারলে যোগ হয় না। বিজ্ঞানভূমিই সেখানে যোগভূমি, তাই একাগ্রতার সাধনায় ঐ ভূমি লাভ করে আনন্দ ভূমিকে অধিগত করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ

এই অর্থে মনকে ছাড়িয়ে যাবার কথা বলেন। মনের উৎস যেখানে, সেই no man's land-এ না গেলে, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে মনোলোককে ছাপিয়ে না গেলে ঠিক যোগী হওয়া চলে না। সেখানে অর্থাৎ ঐ বিশুদ্ধ আত্মবোধে স্থিত হয়ে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপলব্ধিতে নির্বিশেষ আত্মজ্ঞান লাভ করে যোগী শান্ত হন ও ক্ষান্ত হন। তার উপায়স্বরূপ নির্বাণাষ্টকে নেতিভাবনার সাধনা দেওয়া হয়েছে—দেহ নই প্রাণ নই মন নই বুদ্ধি নই, আমি বলে যাকে জানি তার কিছুই নই, আমি নিরাকার নির্বিকল্প। কিন্তু ঐ সঙ্গে অস্তিভাবনা যুক্ত হলে অনুভূত হয় "শিবোঽহম্"। সেই শিবই তো যথার্থ আমি। এ সাধনায় তপস্যার প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা নিয়ে অত্যধিক কৃচ্ছ্রসাধন করার ফলে শরীরগ্রাম অতিরিক্ত কর্ষিত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। সমতা রক্ষা করতে না পারলে তো যোগ হয় না। ভাবনাপ্রধান রাজযোগ সহায় হয় যেখানে প্রাণ ও মনের বৃত্তি অত্যন্ত প্রবল সেই ক্ষেত্রে। এ ছাড়া সাংখ্য ভাবনা অবলম্বন করে বেদান্তের যোগও আছে। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ প্রচলিত যোগসাধনার ঐ সবের ধরাবাঁধা নিয়মগুলি বিশ্লেষণ করে ও তা থেকে প্রয়োজন মত বর্জন করে ঔপনিষদ ভাবনা নিয়ে সনাতন বৈদিক সাধনার পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। এতে প্রচলিত যোগপথগুলির সারবস্তু ঠিকই থেকে যাচ্ছে। সাধককে সেগুলি বুঝে নিয়ে উপলব্ধি সহায়ে নিজের পথ কেটে নিজে চলতে হয়। এর মধ্যে প্রধান হল আকাশ-ভাবনা, যা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি। মনকে নীরব শান্ত করে আকাশে মিলিয়ে আকাশ হয়ে যেতে পারলে সাধনার সহজ পথ ধরা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে এই লুপ্ত ধারার কিছুটা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছেন। অন্তরলোকে চিদাকাশে শান্ত হয়ে মিলিয়ে যাওয়া যেমন আছে, আবার ঐ সঙ্গে চোখ মেলে বাহিরের ঐ অভ্রবর্তী আকাশ দেখছি, আর দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি যার সঙ্গে "আমিত্ব" লেগে আছে, নেতি নেতি বিচারে তারা মেঘের মত ভেসে সরে যাচ্ছে—এই তিনটি ভাবনা একসঙ্গে চলবে। কিন্তু এই তিনটিকে আমরা অসম্পূর্ণ করে রাখি এই কারণে যে একটা স্থিতিকে আমরা আঁকড়ে ধরতে চাই। আকাশভাবনায় স্থিত হলে তা থেকে আর নামতে চাই না। অন্তরে ডুব দিতে পারলে enigma of life-এ দুঃখ পেতে আর উঠে আসতে চাই না। কিন্তু একদিকে পূর্ণজ্ঞান লাভ হলেও জগৎজ্ঞান বাদ পড়লে সম্যক্‌জ্ঞান তাকে বলা যাবে না। ব্রাহ্মীস্থিতি আত্মস্থিতি বা আকাশস্থিতি যাকেই পাই, তা থেকে ফিরে আসতে না চাইলে একদেশদর্শন এসে পড়ে। তবুও স্বরূপস্থিতি তো চাই।

এ যোগবুদ্ধি এদেশে ছিল না, এমন নয়। বেদান্তীরা এ নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন, তা থেকেই জীবন্মুক্তিবাদ বিদেহমুক্তিবাদ এ সবের উৎপত্তি। পদ্মপাদ ছিলেন জীবন্মুক্তির সমর্থক আর বাচস্পতি মিশ্র বিদেহমুক্তির সমর্থক। বাচস্পতি মণ্ডনমিশ্রের উত্তরসূরী ছিলেন, প্রপঞ্চসার তন্ত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু বিদেহমুক্তি বা জীবন্মুক্তির একদিকে ঝোঁক না দিয়ে সবই নিতে হবে এবং সেটা কেমন করে হবে, সেই সমন্বয়ই পূর্ণযোগের সাধনা।

পূর্ণযোগের নির্দেশ হল স্বরূপস্থিতিলাভের পর ঐ দুয়ের সমন্বয় ঘটানো। তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ মন দিয়ে কিছুতেই সমন্বয় হওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ, তাঁকে পূর্ণরূপে না পেলে অর্থাৎ চারপো মিলিয়ে নিতে না পারলে পূর্ণ উপলব্ধি হল না, এটা সর্বদা মনে রাখতে হবে। মাণ্ডুক্যোপনিষদে চতুষ্পাৎ ব্রহ্ম নিয়ে বিশ্লেষণ আছে। শ্রীঅরবিন্দই তার প্রথম সার্থক ব্যাখ্যা ধরিয়ে দিয়েছেন এই ভাবে যে, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় এই ক্রমে উজানপথে একে একে যে উপলব্ধিগুলি আসে, ওই চারটিকেই একসঙ্গে একযোগে ধরে তবে ঐ "চারপো" পাওয়া সার্থক হবে। জাগ্রতে যাকে দেখছি বিরাট রূপে যিনি বিশ্বরূপ, স্বপ্নে তিনিই হিরণ্যগর্ভ আর তার মূলে যে শক্তি তিনিই ঈশ্বর, সুষুপ্তির অধিপতি। আবার এই তিনকে ছাপিয়ে উর্ধ্বে তাঁর তুরীয় স্থিতি, তিনি ব্রহ্ম। আত্ম-চেতনারও এই রকম চারটি বিভাব। জাগ্রৎস্থান পুরুষ হলেন বিরাট—দেহপ্রাণ সব অধিকার করে ব্রহ্ম বিরাট। সুপ্তিতে মন লয় হয়ে যায়, স্বপ্নস্থান পুরুষ তখন বিজ্ঞানভূমি অধিকার করেন। এ কিন্তু প্রাকৃত স্বপ্নের কথা নয়, দেবস্বপ্নের ভূমি। সুষুপ্তিস্থান পুরুষ হলেন আনন্দভুক, স্বপ্নের গভীরে তাঁর অবস্থান আনন্দলোকে। আর তাঁকেও ছাপিয়ে যে তুরীয় নির্বিশেষ চতুর্থ স্থান সেই তুরীয় ভূমির অবস্থিতিই আবার তৈলধারার মত নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে এই তিনটি পুরুষস্থানকে ডুবিয়ে রেখেছে, ভরে রেখেছে। শৈব দর্শনে এর উল্লেখ রয়েছে "ত্রিষু চতুর্থম্ তৈলবদাসীচ্যম্"। এগুলি শুধু জানা নয়, অনুভবে একাত্ম হয়ে উপলব্ধি (mystic experience) করার বস্তু এবং জীবনে তা মিলিয়ে নিয়ে চলতে হবে। এই সনাতন জ্ঞানধারাকে পুনরুজ্জীবিত করে তাকে মর্ত্যলোকে জাগ্রতে বয়ে আনতে হবে, এ-ই শ্রীঅরবিন্দের নব আবিষ্কার। পূর্ণযোগী জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি তুরীয় নিয়েই জেগে অবস্থান করেন—তাঁর স্বরূপস্থিতি হল এই জাগ্রত যোগভূমিতে। তিনি অবাধে সর্ব ভূমিতেই সেজন্য বিচরণ করতে পারেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এগুলি সব উপলব্ধিতে আনতে এক একটি চেতনার ভূমি কেমন করে মুক্ত হবে, কি ভাবে আত্মা স্বরাট হবে, চেতনার এই স্তরগুলি দেখিয়ে সাধনার ক্রমগুলিও এর পরে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। শ্রুতির যথার্থ ব্যাখ্যাও আমরা এইভাবে অধিগত করতে পারি।*

(ক্রমশ)

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা

পবিত্র

শনিবার, ১৬ অক্টোবর ১৯২৬

প্রশ্ন দুই রকমের শক্তির ক্রিয়া আমি অনুভব করতে পারি। তার মধ্যে একটি সরাসরি চৈত্য কেন্দ্রে ঢুকে অবস্থান করে। অপরটি উপর থেকে বাহ্য চেতনাতে এসে ঢোকে, প্রথমে মনেতে তারপর প্রাণসত্তাতে। প্রথমটি ভিতরমুখী, কিন্তু দ্বিতীয়টিকে সে সক্রিয় করে।

শ্রীঅরবিন্দ ওদুটি হলো সেই একই শক্তির দ্বিবিধ ক্রিয়া।

প্রশ্ন মনকে আমি আভ্যন্তর অনুভূতিতে নিবিষ্ট রাখতে পারিনা। ঐ সব ক্রিয়াকে যখন লক্ষ্য করতে যাই তখন চিন্তায় সতর্ক না থাকাতে তাতেই আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

উত্তর কিন্তু তাই করাই ঠিক। চিন্তাগুলো আসাযাওয়া করবে, সেদিকে নজর দিওনা। শুধু ভিতরের ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য থাকবে, বাইরের কিছুর দিকে নয়। প্রথম-টাতে দরকার ছিল মনকে কতকটা নীরব করার দিকেই লক্ষ্য রাখা, যাতে উচ্চশক্তি ভিতরে তার কাজ শুরু করতে পারে। এখন দরকার নিজেকে মন থেকে তফাৎ করে নেওয়া।

প্রশ্ন দুটি রাস্তা আছে না? এক হলো, চিন্তা এসে মনকে পার হয়ে যাচ্ছে তাই দেখে যাওয়া। আর দ্বিতীয় হলো ভিতরের ক্রিয়াতে নিবিষ্ট থেকে চেতনার লোপ, তাই না?

উত্তর এখন তুমি ঐ দ্বিতীয় রকম ক্রিয়াতে যেতে পারো। আর সব সময় এইটি মনে রাখবে যে তুমি নিজের থেকে কিছু করছনা। যা কিছু হবার তা তোমার দ্বারাতে করিয়ে নেওয়া হোক। এই ভাব নিয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি ফল পাবে।

প্রশ্ন তার মানে বোধ হয় ভিতরের শক্তির সঙ্গে যোগ রাখা।

উত্তর হাঁ, যতক্ষণ না সেই শক্তির সঙ্গে নিজে অভিন্ন হও। যা কিছু করানো হবার সমস্ত হোক সেখান থেকে। ভিতরের চেতনা থাকবে স্থির শান্ত হয়ে, যদিও কাজের সময় তা আবার বাইরের ক্রিয়াতে ফিরে আসবে।

প্রশ্ন: বোধ করি নিজত্ববোধটাও চলে যাবে, কারণ ওটা থাকাও বিরক্তিকর।

উত্তর হাঁ, ওটা যাবে।

প্রশ্ন কখনো কখনো বেশ একটা স্বচ্ছতা বোধ করি, যেন চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকি যে চিন্তাগুলো এমনি কেটে যাচ্ছে।

উত্তর দুটি উপায় আছে এক হলো নিজে করা, এটি বিলম্বিত ক্রিয়া ; দ্বিতীয় হলো সমস্তই করা হোক উচ্চশক্তির দ্বারা, এটি ত্বরিত ক্রিয়া।

মা তোমাকে তাঁদের ধ্যানে যোগ দিতে বলেছেন।

প্রশ্ন আমি ভুল বুঝেছি। ভেবেছিলাম তিনি বলেছেন আপনাদের এখানে যোগ দিতে।

উত্তর তা নয়, তাঁদের সঙ্গে।

প্রশ্ন মায়ের সঙ্গে আমার ধ্যানে বসে যা লাভ হয়েছে তা অমূল্য। আমি নিজে যতটা জেনেছি তার চেয়েও অনেক বেশি লাভ হয়েছে। বস্তুত কতখানি হয়েছে তার সামান্য মাত্রই জানি।

উত্তর কিন্তু মা বলেন যে তুমি যথেষ্ট নিতে পেরেছ।

প্রশ্ন তা নিশ্চয়। কিন্তু আমি এটুকু বুঝেছি যে কোনো জোরালো শক্তি আমার মধ্যে নেমেছে। তবে সে অস্থায়ী রকমের জানা।

উত্তর : যাই হোক, তুমি তাঁর অনুসরণ করতে পেরেছ। কতটা, তা কম লোকেই জানে।

প্রশ্ন ধ্যানে যোগ দিতে পারার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনি যেমন বলবেন তাই করব, যেমন আপনি ভালো মনে করেন।

শ্রীমতী ডব্লু বলছিলেন ব্রিটিশ কন্‌সালের ডিনারে আমার নিমন্ত্রণের সম্ভাবনার কথা, মাদ্রাজ থেকে কে একজন স্থপতি শিল্পী এসেছেন, তাই। কিন্তু আমার সে নিমন্ত্রণে যাবার কোনো হেতু নেই।

উত্তর : আমিও তাই বলি। মাকে বলে পরে জানাবো।

শনিবার ১৭ অক্টোবর ১৯২৬

মায়ের সঙ্গে :

আপনি যা বলতে চান তা বুঝেছি। গতকাল থেকে আমার ধ্যানের সব কিছু বদলেছি। নিজের থেকে জোর খাটাতে কোনো চেষ্টাই আর করিনা, তার বদলে কেবল নিজেকে খুলে দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকি। সারাদিনই ঐ শক্তির সঙ্গে একটা সংস্পর্শ রেখে তারই ক্রিয়ার দিকে নিজেকে খুলে ধরি।

মা আমি সারাদিন তোমাকে কাছাকাছি বোধ করেছি।

প্রশ্ন কিন্তু ঐভাবে থাকলে ঘুম এসে যায়।

মা তাতে কোনো ক্ষতি নেই। ঐরূপ ঘুমে অনেকের বেলাতেই কোনো প্রতিবন্ধক থাকে না। খুলে থাকার কাজ ঠিকই হতে থাকে। ঘুমের মতো এলে তাতে বাধা দিওনা।

প্রশ্ন ধ্যানের সম্পর্কে আপনি কি স্থির করলেন?

উত্তর তুমি প্রস্তুত থাকলে তো স্থির করাই আছে।

প্রশ্ন আমি মনে করি এই ধ্যান আমার পক্ষে অমূল্য, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি ধ্যানে বসতে যাবো।

উত্তর বাহ্য চেতনাতে যা কিছু এখানে দেখবে তাতে যেন আশ্চর্য হয়োনা। ওরা সকলে ঐ ধ্যানের ঘরটিকে মন্দির বলে ভাবে, কেবল কোনো দেবার মূর্তির বদলে সেখানে একজন মানুষ গিয়ে বসে। তাতেই ওদের অভিলাষ পূরণ হয়। তোমার তো অন্য ধরণের শিক্ষাদীক্ষা—

প্রশ্ন তাতে ভয়ের কিছু নেই। আমি ওদের মনোভাব বুঝি, ওতে আশ্চর্য বোধ করব না। আমি অবশ্য ওদের মতো করতে চাইব না, কারণ যেমন ভাবে আমি মানুষ হয়েছি তাতে বাহ্য অভিব্যক্তির দরকার হয়না। নিজে যেমন অনুভব করি সেই ভাবে চলি। আশ্চর্য হতে যাবো কেন?

মঙ্গলবার, ১৯ অক্টোবর ১৯২৬

মায়ের সঙ্গে ধ্যান, বেলা ১২টা ১৫ মি:

প্রশ্ন আমার গভীর অন্তরে কিছু একটা ঘটল তা অনুসরণ করে দেখলাম। যেন দুটি বিভিন্নরূপ শক্তি, একটি শান্ত ও প্রদীপ্ত, অন্যটি আরো সতেজ, আমার পেটে এইখানে (সোলার প্লেক্সাস্) প্রবেশ করল।

মা সে কি খুব সতেজ শক্তি?

প্রশ্ন হাঁ, তাই। আমার মন কিন্তু আজ বেশ শান্ত ছিল।

মা: তুমি প্রস্তুত হয়ে এসেছিলে। চৈত্যসত্তা তৈরি ছিল—একটা প্রতীকস্বরূপ—গোলাপের পাপড়ির সোনালি আধারের মতো, উপর থেকে যা আসবে তাকে গ্রহণ ক'রে নেবার জন্য। বেশ সুন্দর। যে শক্তি সেখানে নামল তা হল রূপান্তরকারী শক্তি। তা এখন কেন্দ্রের মধ্য থেকে কাজ করবে, চেতনভাবে। (খাতার পাতা এখানে খানিক ছেঁড়া)

মা ওকে নানারূপ পরীক্ষাই বলব। সবগুলি তুমি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছ, অর্থাৎ তোমার ঐকান্তিকতা আছে। এর পরে সব কিছুই সহজ হয়ে আসবে, তাতে সন্দেহ নেই। কাল ধ্যানের পরে ওর সঙ্গে তোমার দেখা হবে।

প্রশ্ন তাতে ধ্যান বাদ যাবেনা তো?

শনিবার, ২৩ অক্টোবর ১৯২৬

প্রশ্ন প্রথমে বলব শুধু আমার ধ্যানের কথা। সে সময়ে একটা শক্তির ক্রিয়া টের পাই হৃদয়ের পশ্চাতে। যেন জ্বলন্ত আগুনের মতো কিন্তু প্রচ্ছন্ন। আর মনের মধ্যে উপর থেকে যে শক্তি আসে তার পিছনে থাকে আলো, যদিও তা আমি দেখতে পাইনা। যেমন আজ হলো মায়ের সঙ্গে ধ্যানে বসে, তাই এবার বলি। প্রথমটায় আসে একটা প্রস্তুতির সময় যখন শক্তি মাথার উপর এসে সেখানে কিছুক্ষণ থাকে। তারপর তা নেমে ভিতরকে অধিকার করে কেন্দ্র সত্তাতে এবং সেখানেই থাকে। চেতনা একত্রে গুটিয়ে থাকে, কিন্তু এই নতুন ক্রিয়ার ফলে দেহটা তার পর উঠে দাঁড়াতে পারেনা, আর বুকে এবং গলাতে শ্বাসরোধের মতো বোধ হয়। মায়ের কাছে আমার মন থাকে প্রশান্ত, মনের কোনো ক্রিয়া আমাকে বিরক্ত করেনা। কিন্তু একা হলেই গণ্ডগোল ও বিভ্রান্তি এসে যায়।

শ্রীঅরবিন্দ তার ক্রিয়া কি রকম হয়?

প্রশ্ন আমার পুরানো জিনিস। কোনো একটা শব্দ হলেই মনের মধ্যে তার যত অনুষঙ্গের ভাব জেগে ওঠে এবং তাই নিয়ে গুঞ্জন করতে থাকে। বারে বারে চেষ্টার দ্বারা তার থেকে নিজেকে ফিরিয়ে আনতে হয়।

উত্তর সে ক্রিয়াগুলি কি তুমি দেখতে পাও? তা কি মনেরই, বা নিচের দিক থেকে আসে?

প্রশ্ন: নিচের থেকেই আসে, নতুন কিছু নয়। কিন্তু ও ছাড়া মনেরও একটা ক্রিয়া হয়। প্রায়ই দেখি আমি ভাবছি মায়ের কিংবা আপনার সম্বন্ধে, ভাবি যে কাল যখন দেখা হবে তখন কি কি কথা বলব, অথবা দেখি যেন মাকে ফুল নিবেদন করছি...

উত্তর: তাই কি দেখতেই থাকো?

প্রশ্ন: ঠিক দেখা তা নয়, কল্পনা করা। সাধারণ মনের ক্রিয়াতে তাই বোধ করি। কিন্তু আগে যা বোধির মধ্যে এসেছিল তার আলো পেয়ে যখন উপরের দিকে জেগে উঠি তখন মন চলে আসে আপনার দিকে। হয়তো সেটা খাঁটি জিনিস, কিন্তু মন তখনই তার মামুলী কাজ শুরু করে। সে সম্বন্ধে কি করা যেতে পারে?

উত্তর কিছুই করতে হবেনা। ও দুই রকম ক্রিয়া একই শক্তির। বক্ষকেন্দ্রে এসে এইভাবে সত্তাকে জাগিয়ে তাকে উপরের সত্যের দিকে তুলে ধরে। উপরের সঙ্গে যোগাযোগের ঐটাই মানবিক প্রণালী, সোজা অতিমানস সত্যের দিকে। ঐ শক্তি যখন সেখানে স্থায়ী হবে আর কেন্দ্রস্থ সত্তা বেরিয়ে এসে বাহ্য সত্তাকেও অধিকার করবে তখনই হবে রূপান্তর। সে শক্তি তখন নেমে সর্বত্র পরিবর্তন ঘটাবে।

প্রশ্ন কিন্তু ঐরূপ মনের তরফের ক্রিয়াতে আমি ক্লিষ্ট হচ্ছি।

উত্তর কিন্তু ওরূপ ক্রিয়ার কোনো গুরুত্ব নেই। ওগুলি হলো আগেকার দিনের পুরানো অভ্যস্ত ক্রিয়া, ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে যাবে।

প্রশ্ন আমি একটা আমূল পরিবর্তন প্রত্যাশা করি। আজও পর্যন্ত চেতনার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, যদিও আলো পেয়েছি যথেষ্ট। তবু এখনও রয়ে গেছি সেই আগেকার মতোই।

উত্তর তুমি কিসের প্রত্যাশা করো?

প্রশ্ন অনেক কিছুরই। যেমন, আমার নিম্ন সত্তাকে দেখতে পাবো, অপরদের বেলা যেমন দেখি। আমার দেহবন্ধনে আর আবদ্ধ থাকব না...

উত্তর অবশ্য এমন সময় আসবে যখন নিজের প্রকৃতির ক্রিয়াগুলিকে তুমি দেখতে পাবে যেমন অন্যেদের বেলাতে দেখ। কিন্তু ঐরকম সব প্রত্যাশা করা, এটা কি তোমার মনের তরফের দাবি করা হচ্ছেনা? ঐভাবে কোনোরূপ দাবি করা ঠিক নয়, কারণ তাতে সত্যের সম্বন্ধে ভুলবোঝা এসে পড়ে। তুমি চাইছ সত্যকে, সুতরাং সেখানে তুমি আগের থেকে বাৎলাতে পারোনা যে সেই সত্য এমন হোক বা তেমন হোক। মন যা বলতে চায় তা যতই ভালো হোক তথাপি তা অপূর্ণ জিনিস হয়, তাতে অনেক বাধা ও ত্রুটি এসে পড়ে। কেবল তোমার অনুভূতিগুলিকেই জানবে তোমার নিজের অংশস্বরূপ।

প্রশ্ন তাহলে পরিবর্তন চাওয়া কি অন্যায়? আমি যা চাই তার জন্য আশা করা কি ভুল?

উত্তর না, তা নয়, কিন্তু কেমন পরিবর্তন আসবে তা আগের থেকে বলাই ভুল।

প্রশ্ন ধ্যানের সময় আমি নিজেকে খুলে দিয়ে উচ্চশক্তিকে তার কাজ করতে দিই। তখন মনের ক্রিয়া কিছু করিনা; তাই সময় সময় একটা অস্থিরতা আসে। গত শনিবার ধ্যানের সময় কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। তখন একটা উপলব্ধি এলো, সারাদিন সেটা ছিল। কিন্তু তার পর থেকে সে সম্বন্ধে আর চেতন থাকিনি। সেই শক্তি কখনো মনের

উপর কাজ করে, কখনো কেন্দ্রসত্তার উপর। এখন তাহলে কি করব? আমি নিজের থেকে জোর করতে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

(শ্রীঅরবিন্দ হাসলেন)

আমি কি সব কিছু ক্রিয়াকে অনুসরণ ক'রে যাবো?

উত্তর নিজেকে খুলে রেখে নিশ্চেষ্ট ভাব নিয়ে চলবে। এটাই করা দরকার। তাহলে উচ্চশক্তি তার আপন পদ্ধতিতে রূপান্তর এনে দেবে। মনের দ্বারা কিছু করতে গেলেই তাতে অপূর্ণ ও বিলম্বিত ক্রিয়া হয়, যদিও মন ভাবতে থাকে যে আমি খুব একটা কিছু করলাম। সেটা কিন্তু ভুল। মন তার আপন অবস্থা বোঝেনা, কোনো সদুপায় জানেনা। কিন্তু ঐ শক্তি এমনভাবে কাজ করে যা মনের পক্ষে অসাধ্য। তুমি সেই শক্তিরই কাজের পক্ষে গ্রহিষ্ণু হয়ে থাকো। বাধাবিঘ্ন আসতে পারে দেহে প্রাণে কিংবা মনে, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসেনা। সবকিছুই শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু নিজে তুমি কিছু করতে যেও না।

প্রশ্ন শান্তি ও স্বস্তির খুবই দরকার বোধ করছি। বাইরে যেটুকু কাজ করি তাতেও বিরক্তি আসে। তাও ছেড়ে দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তবুও সেটা বজায় রেখে চলতে হয়।

উত্তর হাঁ, কাজ বজায় রাখবে। এমন একটা সময় আসবে যখন বাইরের দিক দিয়েই কাজ ক'রে যাবে, তাতে কোনো বিরক্তি আসবে না।

প্রশ্ন তা বটে, কিন্তু আপাতত বেশ কষ্টকর হচ্ছে। বোধ করি এটা মধ্যবর্তী অবস্থা।

উত্তর : হাঁ, এ মধ্যবর্তী অবস্থা।

(এখানে পাতা ছেঁড়া)

শনিবার, ৩০ অক্টোবর ১৯২৬

প্রশ্ন : জানাবার মতো কিছু নেই। ধ্যান আরো গভীর ও দীপ্তিদায়ক হচ্ছে। চেতনা যেন আলোকস্নান করছে। নিজেকে বাহ্যচেতনা থেকে স্বতন্ত্র বোধ করি। কাল সন্ধ্যার ধ্যানে ভিতরের দিকে আরো গুটিয়ে যাওয়াতে দেহচেতনা লোপ পেয়েছিল। সাহায্যের জন্য মাকে ডাকলাম, তাতে কিন্তু দেহচেতনাই ফিরে এলো। তাই বোধ হলো, মাকে কিছু বলিনি।

সব সময়ে সহজ হয় না। কোনোদিন বেশ ভালো, কোনোদিন তেমন নয়। তা ছাড়া আর কোনো মুশকিল নেই। মুখের সামনে কাজ করে উচ্চশক্তি, তাতে প্রাণ-সত্তাকে শান্ত ও বিশুদ্ধীকৃত করে। শুভ্র ও উজ্জ্বল হয়ে সে শক্তি মনের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু

সমগ্র সত্তাতে নয়। দেহটা যেন ওতে ব্যথা পেয়ে কষ্ট বোধ করে। আজ পিঠে একটা ব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙল। জানিনা যোগের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কিনা, কিংবা হয়তো ঠাণ্ডা লেগেছে। চৈত্যের সঙ্গে হয়তো যোগ আছে। কিন্তু প্রাণসত্তা কেন শোলেনা ?

উত্তর খুলছে বৈ কি। তোমার সাধারণ চেতনাতে যতটা বোধ করতে পারো তার চেয়ে অনেক বেশি কাজ হচ্ছে। যা আমাকে বলেন তোমার ধ্যানের মধ্যে কি কি হয়। খুব ভালোই কাজ হচ্ছে। দুই চেতনায় যোগ হচ্ছে। যখন সেটা হয়ে যাবে তখন খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ধ্যানের সময় আমি পুরোপুরি নিশ্চেষ্ট থাকিনা, শক্তি কেমন কাজ করছে সেটা দেখি। যাকে সে কথা বলেছিলাম, মা বললেন যে প্রথমটায় নিশ্চেষ্ট থাকতে হয়. তারপর শক্তি কাজ শুরু করলে তখন তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে হয়।

উত্তর হাঁ, তার ক্রিয়া অনুসরণ করে দেখা যে শক্তি কি করছে, এ তো হবেই। একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা মানে নিশ্চেতন হয়ে যাওয়া।

প্রশ্ন : একেবারে নিশ্চেতন হলে তখন ঘুম এসে যায়। মাথার মধ্যে একটা কেন্দ্রকে অনুভব করি যার সঙ্গে দুটি স্থানের যোগ আছে। এ ছাড়া আর বেশি কিছু বুঝি না।

রবিবার, ৩১ অক্টোবর ১৯২৬

মায়ের সঙ্গে :

প্রশ্ন : আমার ধ্যান খুব শান্ত ও গভীর হলো। বৃহৎ এক শক্তি নামলো কিন্তু তা খুব দীপ্তিপূর্ণ নয়। কাল ছিল কিছু ঘোলাটে। পরশু ধ্যানে দেহচেতনা লুপ্ত হয়েছিল। আপনাকে ডাকলাম সাহায্যের জন্য, তাতে কিন্তু দেহচেতনাতেই ফিরে এলাম।

মা হাঁ, আপন চেতনাকে ছেড়ে অন্য চেতনায় যাওয়া ঠিক নয়। তাতে কিছু অভিজ্ঞতা নেলে কিন্তু এখনকার কাজ আলাদা। এখন চাই দুই চেতনার সংযোগ, উপরের চেতনা দেহেতে আনা। স্বাভাবিক চেতনার সবই থাকবে, কাজেই দেহে গিন্নতে হবে। তোমার জন্য কিছু একটা তৈরি হচ্ছে। কাল তা বলেছি। ভগবৎ ইচ্ছা যেন পথ দেখিয়ে বলছে "তোমাকে এমন হতে হবে"। লক্ষ্য কি তা জানি, কিন্তু তা আমাদের দুজনের জন্য। তোমার জন্য ঐ রাস্তা, বাহ্য ধারণা থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। কেমন ক'রে বোঝাই, তুমি বুঝবে না। কিন্তু তোমার আভ্যন্তর সত্তা জানে বলেছে সে আমাকে। ওটি ক্রমে চেতনায় আসবে। একটা কিছু ঘটবে। যা তুমি আশা করো তার চেয়ে অন্যরকম কিংবা তীব্র কিছু হলে যেন অবাক হয়ো না। সেই রকমই ভাগবৎ ইচ্ছা।

...(?)...

আজ দেখলাম একটা যেন ছায়া পড়ে আসছে, কিন্তু এখন তা আর নেই। এমনি কিছু একটা হলেই তখন বাধাগুলো জোরদার হয়। সত্তার মধ্যে যেগুলো দমন করা হয়নি সেগুলো তখন চাড়া দিয়ে ওঠে। তারপর সেই অন্ধকারে কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা, কারণ তখন কিছুই দেখা যায় না। হয়তো তোমার কালকের বাধাগুলির তাই ছিল কারণ। এখন কেবল শান্ত হয়ে একাগ্র হয়ে থাকো।

(অনেকগুলি পাতা এর পরে ছেঁড়া)

(ক্রমশ)

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী
Thoughts and Aphorisms

(বাংলার ব্যাখ্যা সহ)

২০৮—মানুষের জন্য ভগবানের লক্ষ্য হলো পরমানন্দ ; আগে নিজের মধ্যে এই পরম জিনিসটি অর্জন করো, যাতে পরে তা সকলের মধ্যে বিতরণ করতে পারো।

২০৯—যে শুধুই নিজের জন্য অর্জন করে, তাতে তার অবস্থা হয় অস্বাস্থ্যকর, যতই কেন সেটাকে সে স্বর্গ বা পুণ্য বলে মনে করুক।

মানুষ আনন্দ লাভের জন্যই সৃষ্ট, ওতে তার অধিকার আছে। কিন্তু অহংযুক্ত যা কিছু ক্রিয়া সমস্তই তার বিপরীত। কেবল নিজের জন্য আনন্দ চাইলে তাতে বিপরীত ক্রিয়া হয়। কিছু প্রতিদান না চেয়ে আত্মদান ও আত্মত্যাগ, আনন্দের মধ্যে ডুবে তাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, এতেই মেলে চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তি। ২৯-১১-১৯৬৯

মা, আত্মদান ও আত্মত্যাগের মধ্যে তফাৎ কি ?

মা আত্মত্যাগ মানে তাতে হয় অহংশূন্য একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা। আর আত্মদান যদি ভগবানের কাছে হয় তাহলে সেটা পুরোদমের সক্রিয়তা, তার মধ্যে থাকে উৎকৃষ্ট রকমের বিশুদ্ধ প্রেম। ভগবানে আত্মদান হলো অস্তিত্বের চূড়ান্ত হেতু।

২১০—অজ্ঞানে আমি ভাবলাম যে ক্রোধ খুবই একটা বড়ো জিনিস এবং প্রতিহিংসাও মহৎ হতে পারে ; কিন্তু যখন একিলিস্‌কে দেখলাম তার দুর্দান্ত ক্রোধে তখন কৌতুকের সঙ্গে দেখি যে ছোট খোকাটি তুচ্ছ রাগ দেখিয়ে খুব তড়পাচ্ছে।

২১১—শক্তি মহৎ হয় যখন সে ক্রোধকে ছাপিয়ে যায় ধ্বংসও মহৎ হতে পারে, কিন্তু প্রতিহিংসার বশ হলে মহত্ব ঘুচে যায়। নিচু মানবীয়তা হিসাবে তা পরিত্যাজ্য।

রাগ ও প্রতিহিংসা হলো নিচু মানুষের জিনিস, ওরূপ মানবচরিত্র ছিল গতকালের, ওগুলি আগামী কালের নয়। ১-১২-১৯৬৯

২১২—মৃত্যু ও দুঃখব্যথা নিয়ে কবিরা বিস্তর কিছু লেখে, কিন্তু আসল ট্রাজেডি হলো আত্মার পতন, আর যা আসল এপিক তা হলো মানুষের ভগবত্তার দিকে গৌরবান্বিত উন্নয়ন।

মানব চেতনার সংকীর্ণতাই ট্রাজেডীর সৃষ্টি করে কিন্তু ভগবৎ-চেতনার কাছে তা বিবর্তনের ক্রিয়া মাত্র। কিন্তু কান্না দেখে যারা অজ্ঞানতাহেতু ব্যথাতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে তাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি রাখবে। ৪-১২-১৯৬৯

২১৪—প্রতিভাবান ব্যক্তিরা সর্বদাই কিছু অস্বাভাবিক ও বেহিসেবী হয়। তা না হবে কেন? প্রতিভা হলো মানুষের সাধারণ কেন্দ্রের বাইরে এক অসাধারণ জন্ম।

২১৫—প্রতিভা হলো প্রকৃতির প্রথম প্রয়াস, মানুষের ছাঁচের ভিতর থেকে দেবতাকে বের করে আনার জন্য। তাই ছাঁচেতে অনেক ভাঙাচোরা ঘটে। তবু যে তার মধ্যে এত কম ফাটল ও ব্যতিক্রম থাকে এটাই আশ্চর্য।

মানুষ যেদিন ভগবানকে জেনে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়, সেদিন সাধারণের চোখে সে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, কারণ সাধারণ মানুষের দুর্বলতাগুলো কিছুই তার থাকেনা। তবে তাগিদ তার আভ্যন্তর উপলব্ধি তার মধ্যে সাধারণ মানুষের মতো বাহ্য আস্ফালন করাকে ঘুচিয়ে দেয়, তাই কেউ আর তার বিরুদ্ধে কোনো আক্রোশ রাখে না। ৪-১২-১৯৬৯

২১৬—প্রকৃতি তার আপন বাধাগুলির প্রতি নিরূপ হয়ে দিব্যভাব প্রকাশ করতে গিয়ে মস্তিষ্কের হানি করে, তাতে মস্তিষ্কের ভারসাম্য নষ্ট হয়। সুতরাং মস্তিষ্ক-বিকারের দিকে লক্ষ্য না রেখে তার দিব্য জিনিসটিকে গ্রহণ করবে।

প্রশান্ত হাসির সঙ্গে সব কিছুকে দেখা ভালো। কারণ মানুষ তার বর্তমান চেতনাতে যে ভগবানের কি উদ্দেশ্য তা বুঝে নেবে, এর কোনো উপায় নেই। ৭-১২-১৯৬৯

২১৭—সত্তার মধ্যে কে সয়ে নিতে পারে কালীর প্রচণ্ড তেজ ও প্রবলত্ব দেবত্ব? কেবল সেই তা পারে যে নিজের অন্তরে কৃষ্ণকে ধরে রেখেছে।

চমৎকার ভাবে এখানে বলা হলো যে ভিতরে আগের থেকে ভগবৎ উপস্থিতি থাকলে তখন সকল রকমের প্রচণ্ডতা সহ্য করা যায়। ৮-১২-১৯৬৯

২১৮—আক্রমণকারীকে ঘৃণা কোরোনা; কারণ সে যদি বলবান হয় তাহলে ঘৃণাতে তার বিরোধিতা আরো বেড়ে যাবে; আর সে দুর্বল হলে ঘৃণার কোনো প্রয়োজনই নেই।

২১৯—ঘৃণা একটা ধারালো খড়্গের মতো বটে, কিন্তু তার দুই দিকই ধারালো। ওর কাছ সেই আগেকার মন্ত্রজানা গুণীদের মতো, তার শিকারকে যদি সে ঘায়েল করতে না পারে তাহলে তা ফিরে এসে স্বয়ং গুণীকেই খায়।

২২০—তোমার শত্রুর মধ্যেও ভগবানকে জেনে ভালোবাসবে, যখন তাকে আঘাত করবে তখনও; তাহলে কাউকে আর নরকে যেতে হবে না।

২২১—মানুষ বলে তার শত্রু থাকার কথা, কিন্তু শত্রু কোথায়? আমি তো দেখি বিশ্বের আখড়াতে কেবল দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বীর যুযুৎসু লড়াই।

এগুলি সবই লেখা হয়েছে মানুষের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ জাগাতে। ঐক্যের চেতনা পেয়ে যখন তোমরা সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখবে, তখন শ্রীঅরবিন্দ না বলেছেন তার মর্ম বোঝা সহজ হবে। ৯-১২-১৯৬৯

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৩

প্রশ্ন মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"প্রকৃত আর্ট হলো একটা অখণ্ডের অন্তর্গত জিনিস, জীবনের সঙ্গে একীভূত ক'রে নেওয়া। এই সামগ্রিক ভাবটা তুমি দেখবে প্রাচীন গ্রীস ও মিশরের আর্টে। চিত্র ভাস্কর্য প্রভৃতি সব কিছুই সেখানে রচিত হয়েছে কোনো বিরাট মন্দিরসৌধের স্থাপত্যের অন্তর্গত হিসাবে, সমগ্র জিনিসটার আংশিক ব্যঞ্জনা স্বরূপ। জাপানেও তাই, অন্ততপক্ষে এখনকার বাস্তবধর্মী আধুনিকতা আসার আগে তাই ছিল। এক একটি জাপানী গৃহ চমৎকার এক একটি সামগ্রিক আর্টের নিদর্শন। সেটি যথাস্থানে সাজানো, সাজানোর ভুল ত্রুটি কোনোখানে নেই, বাহুল্য কোথাও নেই, অল্পতাও নেই। যেখানে যেমন দরকার ঠিক ঠিক রাখা আছে, সমগ্র গৃহ পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য-যুক্ত। ভারতেও তাই। এখানকার চিত্রণ ভাস্কর্য স্থাপত্য সব নিয়ে এক পূর্ণ সৌন্দর্য বিকাশ করে, ভগবৎ প্রেমের অখণ্ড অভিব্যক্তিস্বরূপ।"

মা, আপনি যে বলেছেন "প্রকৃত আর্ট জীবনের সঙ্গে একীভূত করা সামগ্রিক জিনিস," তার মানেটা ঠিক বুঝলাম না।

উত্তর কী বলেছি আমি? বলেছি যে প্রকৃত আর্ট বাস্তবের জগতে সামগ্রিক সুন্দরের বিকাশ জগৎ যখন আধ্যাত্মিক ভাবে পরিবর্তিত হয়ে ভগবানকে বাস্তবে অভি-ব্যক্ত করবে তখন আর্ট হবে সেই দিব্য সৌন্দর্যের প্রস্ফুটক ও নির্দেশক; যিনি আর্টিস্ট তিনি ভগবৎ সাযুজ্য থেকে প্রেরণা পেয়ে জড়ের মধ্যে দিব্যের সৌন্দর্য ফোটাতে রূপদান করবেন। তা যখন হবে তখন আর্ট হবে সুন্দরকে উপলব্ধির মাধ্যম, শিখিয়ে দেবে যে সুন্দর কেমন হওয়া চাই; অর্থাৎ আর্ট ছেলে বুড়ো সকলকে রুচিপ্রায়ক শিক্ষা দেবে, যে সৌন্দর্য দিব্যসত্যের ব্যঞ্জনা তা শেখাবে। এই হবে আর্টের মূল উদ্দেশ্য। এখন যা করা হয় তা ঐ আদর্শ থেকে অনেক তফাৎ, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল তাই। আমার কথাটা বুঝতে পারলে কি? একটু মাত্রও!

প্রশ্ন এখনকার চিত্রশিল্পীরা আগের দিনের লিওনার্দো দা ভিঞ্চির মতো তেমন ভালো নয় কেন?

উত্তর: তার কারণ বিবর্তনের গতি, যা পাঁচ দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে। সেটা আগেও বুঝিয়েছিলাম। সেইজন্য শতাব্দীর গোড়া থেকে মধ্য পর্যন্ত আর্ট হয়ে গেল ভুল পথে চলা তামসিক ও অর্থকরী জিনিস। আর্টের প্রকৃত লক্ষ্য ভুলে গিয়ে তা হয়ে দাঁড়াল

ব্যবসাদারী আর্ট। কাজেই তাতে আর্টের প্রকৃত গুণ কিছু হইল না : রূপ হলো বিকৃত, তবু চেষ্টা হইল বিকৃত রুচিকে নিবারণ করতে। এর ফলে মানুষের প্রকৃতি অনুসারে এক দল গেল একদিকে, অন্য দল গেল তার সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। এরা শুরু করলে জীবনকে নকল করতে, শুধু তাই নয়, তা হয়ে দাঁড়াল ফটোগ্রাফের ছবির মতো কিন্তু এখন আর তাও চলে না, কারণ যান্ত্রিক ফটোগ্রাফিই এখন এতটা উন্নতি করেছে যে তাকে আর হুবহু নকল বলা যায় না, নয় কি? ফটোগ্রাফিও এখন আর্ট হয়ে উঠেছে, তার ছবিকে নিতান্ত ফটো বলে তুচ্ছ করা যায় না। আর তাকে এখন বাস্তবধর্মী বলাও চলে না, কারণ জড়-বস্তুর কপি অমন হয় না—যা কৃত্রিম ও প্রাণহীন—সুতরাং এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আর্টের মধ্যে এলো আরো উলটো রকমের উদ্ভট জিনিস, আর্ট তার ফলে আর বাস্তব জীবনের রূপায়ণ নয়, তা হলো নিছক মানসিক ও প্রাণিক জীবনের চিত্রণ। ওতে দেখা দিল কিউবিষ্ট প্রভৃতি নানারকমের চিত্রপদ্ধতি, সবগুলি নিজেদের মাথা থেকে আবিষ্কৃত। কিন্তু আর্ট তো মাথার জিনিস নয়, তা হলো সুন্দরকে অনুভূতির জিনিস। কিন্তু ওরা গড়ে-তুললে যত হাস্যকর ও বিচিত্র উদ্ভট রকমের আর্ট। এখন তা আরো বেশি বিগড়েছে, সেটা হয়েছে যুদ্ধের দরুন—যতবার জগতে যুদ্ধ বেধেছে ততবার এসেছে বিকৃতি ও ধোঁয়া। অবশ্য কেউ কেউ তারই মধ্যে সৌন্দর্য দেখতে পেয়ে তার প্রশংসাও করেছে। আমি জানি ওরা কি করতে চায়, কিন্তু যা চাইছে তেমন করতে পারছে না। যদিও ওরা চেষ্টা করছে। কিন্তু তবু সেই যাগেকার নিচুদরের ফিলিষ্টাইন যুগের, সেই ভিক্টোরিয় যুগ ও ফ্রান্সের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের যুগের চেয়ে এখন কিছুটা ভালো।

তবেই দেখো, শুরু হয়েছিল সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যের যুগ থেকে, সেখান থেকে বাঁক ঘুরে চলে এলো অসামঞ্জস্য ও অন্ধকারের আমলে। এর পর আবার যেমনি বাঁক ঘুরে উঠবে অমনি আবার আর্টের প্রকৃত উপলব্ধিতে ফিরে আসবে, আর্টের সত্যকে তখন জানবে, তাতে আরো চেতনা পেয়ে আরো কিছু ফোটাতে পারবে। কিন্তু একটা বৃত্ত আঁকতে গিয়ে এরা ভুলে যায় যে তার আকৃতি যত বড় হবে ততই অনুভূতি ও ভাবের বিকাশ ভালো ফুটবে। বর্তমানে তাই তোমরা দেখতে পাবে (আমাদের ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে অনেক আধুনিক আর্টিষ্টের ছবির নকল রয়েছে) তাতে দেখবে যে যদিও তারা যা প্রকাশ করতে চেয়েছে তা অপূর্ণ ভাবে করেছে, তথাপি তা বিবর্তনের ঘোরানো পথে উপর দিকে যাচ্ছে; এগুলি যেন নবীন আর্টের পূর্বস্বরূপ; পরে তা দাঁড়াবে সুন্দরকে প্রকাশের আর্টে, তাতে কেবল স্থূল জীবনের নয় কিন্তু আত্মারও চিত্রণ হবে। অবশ্য এখনও আমরা সে অবস্থায় পৌঁছইনি, তবে আশা করা যাক যে শীঘ্রই হয়তো পৌঁছে যাব। এই হল কথা।

প্রশ্ন : বিবর্তনের গতি সোজা পথে না হয়ে এমন ঘুরপাক খেয়ে যায় কেন?

উত্তর ঐ রকমই ওর অগ্রগতির ধারা। কেবল একটা সোজা লাইন ধরে চললে তাতে কেবল একটা দিক নিয়েই কাজ হতো, কারণ জগৎ যে মণ্ডলাকার, সরলরেখা নয়।

প্রশ্ন যদি গোল চোঙার মতো হতো!

উত্তর তা হলেও একটা লাইন ধরে চললে একটা দিকেরই কাজ হতো, অপরদিক-গুলো বাদ পড়ে যেতো। এইরকম ঘোরা পথে বিবর্তন চলে বলে সবদিকগুলোই ওর পথে পড়ে, একদিক এগোলো আর অন্য দিক পিছিয়ে রইল এমন হয় না। কেন্দ্রের দিক থেকে দেখলে বোঝা যায় যে একটা ছেড়ে অন্যটাতে গেল। শেষে যখন চেতন বিবর্তন আসে তখন কোনোটাকে ছেড়ে যাওনা। বর্তমানে সেই ভুল করাটাই দোষের হচ্ছে; একদিকে উপলব্ধি আনতে গিয়ে অন্যদিকেগুলো পিছনে পড়ে থাকছে, সুতরাং কোনো জোর থাকছে না। এই হচ্ছে মানুষের দুর্বলতা, এর সংশোধন দরকার।

প্রশ্ন সকলেরই বিবর্তন কি এমনি ঘোরা পথে, আর তা একত্রে বা স্বতন্ত্রভাবে?

উত্তর ঠিক যে সামঞ্জস্য রেখে হয় তা নয়, কারণ জগৎটাই যে এমন বেয়াড়া রকমের ধাপছাড়া। শৃঙ্খলার সঙ্গে এগিয়ে চললে তাই হতো, সকলে জানতো যে কোথায় চলেছি, কতটা চলেছি দেখে বোঝা যেতো যে এবার কি আসছে। কিন্তু আপাতত তা কেবল বোঝদারেই বোঝে। সাধারণের পক্ষে যা কিছু হয় তা সঙ্গতির সঙ্গে একযোগে হয় না। কতক বা দ্রুত কতক বিলম্বিত। ঐ একটুকু পার্থক্যেই অনেকখানি তফাৎ হয়ে যায়।

এই ঘুরপাক গতির রাস্তা রয়েছে বহু সংখ্যাতে, মনে হয় যেন পরস্পরবিরোধী। কিন্তু ওর গতিধারাকে এক ক'রে দেখলে দেখবে যে প্যাঁচের রাস্তার সঙ্গে প্যাঁচের রাস্তার কাটাকাটি হচ্ছে, তাই বোঝা যাচ্ছে না যে এগোচ্ছি না পিছোচ্ছি। কারণ এতে কতক-গুলো জিনিস উঁচুতে উঠছে আর কতক অন্ধকারে নেমে যাচ্ছে, অথচ পরস্পরে সংযোগ রয়েছে। তবে ঐভাবে কল্পনা না করে আমরা মণ্ডলাকারে ঘোরাপ্যাঁচের চলার কল্পনা করতে পারি। তার বর্ণনা করতে পারলে দেখা যাবে যে সব মিলে একটা বিরাট বৃত্ত। আর যেখানে কাটাকাটি সেখানেই উন্নতি। কিন্তু সে উন্নতি স্থায়ী হতে হলে জীবনের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি আসা চাই, প্রকৃতির তরফ হতে স্বতন্ত্র পরিকল্পনা অনুযায়ী। কারণ প্রকৃতির পরিকল্পনা হলো একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে, তার রাস্তা অদ্ভুত রকমের, মিনিটে মিনিটে তার স্বতন্ত্র বেগ—পরীক্ষা, অবরোধ, বিরুদ্ধতা, আগের জিনিসকে চূর্ণ ক'রে দিয়ে কিছুটা উন্নতি,—এমন সব গণ্ডগোলের ব্যাপার যে কিছু বোঝা যায় না। প্রকৃতি যেন কাজ করে আপন ঝোঁকে, একটা ঝোঁককে বাতিল ক'রে আবার অন্য ঝোঁক নেয়, এই ভাবেই চলছে। গড়ছে, ভাঙছে মেশাচ্ছে, ফেলে দিচ্ছে, সব একই সঙ্গে এমন ভাবে যে খুবই নিশ্চয় তার একটা কিছু মতলব আছে, একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য যা মানব চেতনার কাছে ধোঁয়াটে।...বুঝতে চেষ্টা করলে কৌতূহলজনক। বিভিন্ন রঙের প্যাঁচ একত্রে নিয়ে একটা বৃহৎ বৃত্ত, সেই প্যাঁচের প্রত্যেকটিতে প্রকৃতির সৃষ্টির এক এক দিক, আর সব মিলিয়ে একটা সমগ্র সম্পূর্ণতা—অথচ পরস্পরে সহযোগিতা না হয়ে চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, একটাকে ভেঙে অন্যটার গঠন, যার ফলে হয় প্রচুর অপচয় ও

বিশৃঙ্খলা। কিন্তু সব মিলিয়ে দেখ তো সেটা চমকপ্রদ। দেখবে যে কত কিছু কাটাকাটির ভিতর দিয়ে প্যাঁচ খেয়ে খেয়ে উপরে ওঠাই হচ্ছে।

এখন তোমার প্রশ্নের আরো একটা জবাব আছে। আর্টের বেলাতেও একই কথা, তাও চলেছে বিবর্তনের রীতিতে। কখনো লক্ষ্য ছেড়ে বিপথে চলে যাচ্ছে, আবার কখনো বা আগের থেকে উপরের দিকে উঠছে। আরো একটা কথা বলা যায়, সামাজিক দিক দিয়ে যেমন, চতুর্দশ লুইর রাজত্বকালে তখনকার আর্টের একরকম প্রগতি হয়েছিল; কিন্তু তার পরে এলো অন্যরকমের ভাব ও অন্য রকমের আবশ্যকীয়তা, তাই সম্পূর্ণ শতাব্দীটা চলল কেনাবেচার আর্ট, সেখানে ব্যবসাবুদ্ধিই হলো প্রতিবন্ধক, যা অসাধারণ হবার কথা তা হলো অতি সাধারণ স্থূল ধরনের জিনিস, যা সমঝদারের তারিফ করার জিনিস তা হলো স্থূল প্রাকৃতজনের জন্য। বর্তমানে আমরা রয়েছি যন্ত্রবুদ্ধি ও ব্যবসাবুদ্ধির আমলে, এখন কোনো উঁচুদরের আর্টের আবির্ভাব সম্ভব নয়। আর্ট তাই নিজের সার্থকতার রাস্তা না পেয়ে অন্যরূপ রাস্তা দিয়ে প্রাণ মনের অভিব্যক্তির দিকে ঝুঁকেছে। এই হলো কারণ। এসব জিনিস ঝেড়ে ফেলে যখন সুন্দরের দিকে চোখ ফুটবে তখন হবে আবার সঙ্গতিপূর্ণ বৃহত্তর চেতনার আর্টের পুনর্জন্ম।

প্রশ্ন আত্মাভিমান থাকা কি আর্টের প্রতিবন্ধক?

উত্তর হাঁ, বুদ্ধিরও তা প্রতিবন্ধক। আত্মদম্ভ হলো মানুষের প্রকৃতির সনাতন প্রধান দোষ নিজের কাজের উপর বিশ্বাস, আপন কাজকে সার্থক করবার চেষ্টা, আপন সৃষ্টির সাফল্যের সম্ভাবনার পরে আস্থা—এগুলি আলাদা, আর নিছক আত্মম্ভরিতা হলো একেবারে আলাদা জিনিস। আমি যদি আপন সময়, শক্তি, ইচ্ছা, বিশ্বাস এবং ঐকান্তিকতাকে প্রয়োগ করি তাহলে কিছুই আমার পক্ষে অসম্ভব নয় এমন বিশ্বাসটি থাকা খুবই দরকার, কিন্তু সব কিছুতে একটা দানবড়া ভাব থাকা খুবই দোষের। ওতে উপলব্ধির অন্তরায় হয় আর তোমাকে হাস্যাস্পদ হতে হয়। ওরূপ ভাব রাখা প্রকৃতির ইচ্ছারও বিরুদ্ধ, প্রকৃতি ওতে হেসে ওঠে, তুমি উপহাসের পাত্র হয়ে যাও। কারণ মানুষ নিজের থেকে নিজে কেউই কিছুই নয়। সে কেবল ভগবৎসৃষ্ট একটা সম্ভাবনা মাত্র, সে সম্ভাবনা কেবল ভগবানের দ্বারাই সার্থক হবে, ভগবানের দ্বারা এবং ভগবানের জন্যই তার অস্তিত্ব। সুতরাং এতে আত্মাভিমানের কোনো স্থানই নেই; আমরা যখন কেউই কিছু নই, কেবল ভগবান যাকে যা করেছেন সে তাই হয়েছে, তখন অভিমান করে কোনো লাভ নেই। কেবল অনর্থক আপন অক্ষমতাই প্রকাশ পায়। কিন্তু এর আবার একটা উল্টো পিঠ আছে, যখন সেই একই রকমের অভিমানের মনস্তত্ত্ব নিয়ে বলা হয়, "আমি অতি অকর্মণ্য, নেহাৎ অপদার্থ, কোনো কিছুই করতে পারিনা,"—এ হলো একই জিনিসের উল্টো পিঠ যখন বলা হয়, "আমি মস্ত একজন, সব কিছুই করতে পারি, যথেষ্ট ক্ষমতা রাখি।" একই ব্যাপার, কেবল একটা আলোয়, অন্যটা ছায়ায়, কোনোটাই ভালো নয়। আমি যদি জানি

যে আমি নিজে কোনো কিছুই নই, তাহলে আমি যে কতটা কি তাই নিয়ে আর ভাবতেই যাবোনা। নিজের জীবনের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে তোমাদের আমি বলছি, কাউকে যখন আপন দম্ভে ভরপুর দেখি তখন তার চেয়ে কিম্ভূত ও হাস্যকর আর কিছুই হয় না। তেমন লোকও আছে ; কেউ কেউ শ্রীঅরবিন্দের কাছে এসে বলেছিল তারা কত কি কাজ করেছে, কত কিছুই করতে পারে, কত কিছু জানে ; শ্রীঅরবিন্দ তাদের দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, "ও। তাহলে তো সবই তোমার জানা। তবে আর এখানে তুমি এলে কেন, এখান থেকে সরে পড়াই ভালো।"

প্রশ্ন : মায়ের "কথাবার্তা" থেকে—"সঙ্গীত মূলতঃ এক আধ্যাত্মিক আর্ট, যার বরাবরই যোগ ছিল আগেকার ধর্মজীবন ও আভ্যন্তর জীবনের সঙ্গে। কিন্তু তাকেও আমরা স্বয়ংপ্রধান ক'রে ছত্রাক ধরনের আর্টে দাঁড় করিয়েছি, যেমন ধরো অপেরা সঙ্গীত। আজকাল বেশির ভাগ সঙ্গীতই ঐ জাতীয়, শুধু টেক্‌নিকের দিক দিয়ে তার যা কিছু মূল্য। অপেরা সঙ্গীতও সে উচুদরের আর্টের বিকাশ করতে পারে না সে কথা আমি বলছিনা, কারণ ওর দ্বারাও গভীর জিনিস ব্যক্ত হতে পারে। যেমন ভাবে তার প্রয়োগ তেমনি তার ফল হবে। এমন কিছু নেই যাকে দিব্যকর্মে লাগানো যায়না—তেমনি আবার ছত্রাকের ধরনের এমন কিছু নেই যা ভগবানের নকল হতে পারেনা।"

"ছত্রাক ধরনের" মানে আপনি কি বলতে চাইছেন?

উত্তর : ছত্রাক কাকে বলে জানোনা? ছাতা ধরার মতো যত্র তত্র সবখানে ছড়ায়, উৎপাদনের ধার ধারে না। যার মূল নেই, শিকড় নেই, আপনাআপনি গজায়। যেন সৃষ্টিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়, সৃষ্টির বাইরের জিনিস। ছত্রাকের বদলে পরগাছাও বলা যেতো। বড়ো বড়ো গাছের গায়ে যে সব পরগাছা জন্মায়, যেমন বিস্‌লুটো। এখানেও কোনো কোনো গাছে দেখেছি ; এদের নিজস্ব স্বতন্ত্র জীবন বলে কিছু নেই, কেবল সেই বড়ো গাছের জীবনকে আশ্রয় করেই বাঁচে, মাটি থেকে কোনো খাদ্য নেয়না, অন্যের খাদ্যের উপর ভাগ বসায়। অন্যেরা যে খাদ্য সংগ্রহ করে তাতেই তাদের পুষ্টি হয়। এমন পরগাছা জাতীয় জীব পশুদের মধ্যেও আছে।

জানিনা, অনেক কথাই ওখানে বলা হয়েছে, কিন্তু যারা বোঝে তাদের জন্যে।... আগেকার যুগে গ্রীসে ও ইটালিতেও (বেশির ভাগ গ্রীসে ও মিশরে) বড়ো বড়ো অট্টালিকা নির্মিত হতো সাধারণের জন্য। মন্দির রচিত হতো দেবতাদের জন্য। সেগুলি পুরো-পুরির আদর্শে গড়া হতো, স্থাপত্যের সঙ্গে তাতে ভাস্কর্য থাকতো, যাতে একটা সামগ্রিক সঙ্গতি ও ভাবের বিকাশ থাকে, সেই ভাবে চিত্রণও করা হতো, সকল কিছুকে নিয়ে একটা গোটা সৌন্দর্যসৃষ্টি হয়ে দাঁড়াতো। ভাস্কর্য ও চিত্রকলা ছিল তারই অন্তর্গত, আলাদা জিনিস কিছু নয়, একই পরিকল্পনার সহযোগী। মন্দির যখন গড়া হতো তখন তার মধ্যে সকল রকম আর্টের সংযোগ ঘটিয়ে একটা পরিপূর্ণ সুন্দর জিনিস তৈরি হতো মন্দিরস্থ দেবতার

উপযুক্ত আভরণ হিসাবে। এই ছিল তখনকার সুন্দর আর্টের যুগ। কিন্তু তার পরে এই যুগে, অর্থাৎ গত শতাব্দীর শেষের দিকে ব্যবসাবুদ্ধি ঢুকে আর্ট হয়ে পড়ল অর্থোপার্জনের একটা পেশা, ছবি আঁকা হতো বিক্রির জন্য। ক্যানভাসের উপর ছবি এঁকে তাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে এখানে ওখানে টাঙিয়ে রাখা, আর ভাস্করের দ্বারা মূর্তি গড়েও যত্র তত্র স্থাপিত হতে থাকল, যে বাড়িতে রইল তার সঙ্গে মূর্তির কোনো একটা যোগ নেই। সুন্দর দেখাতে পারে কিন্তু তার কোনো অর্থ নেই। কোনো কিছুর সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, কোনো সার্থক বিকাশ নেই। কেবল বাহাদুরি দেখানো, কারিগরি ও চাতুর্যের বিকাশ। তেমনি হলো স্থাপত্য, তারও বাঞ্জনা অর্থহীন। যে বাড়িটা গড়ে উঠল তার মধ্যে কোনো বিশেষ শক্তির পরিচয় নেই, তার থেকে কোনো আত্মহার লক্ষণ বা আত্মার আনন্দ জাগেনা, কিংবা দেবমন্দিরে দেবতার মহত্বের ইঙ্গিতও মেলেনা। ঐ ছত্রাকেরই মতো বাড়িগুলি ইতস্তত ছড়ানো চিত্র ভাস্কর্য প্রভৃতির বেলাতেও সেই একই কথা। কোনো বড়ো অট্টালিকার মধ্যে ঢুকলেই দেখবে এখানে কতকগুলো মূর্তি ওখানে কতকগুলো ছবি, আলমারিতে জড়ো করা নানারূপ উদ্ভট জিনিসের ভিড়, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার সঙ্গতি নেই। যেন প্রদর্শনী খোলা হয়েছে যেখানে আর্ট বা সৌন্দর্যের লক্ষণই নেই। সে যে কত বিসদৃশ দেখায় তা বুঝতে হলে আর্ট সম্বন্ধে গভীর বোধ থাকা দরকার। নতুবা ওতেই অভ্যস্ত হয়ে সকলের সবই মনে হয়েছে যে তাই স্বাভাবিক,—কিন্তু তা আদৌ স্বাভাবিক নয়। সবই হলো সম্পদ দেখানোর বিকৃতি।

কেবল একটা দিক দিয়ে ওর ন্যায্যতা থাকে যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য মিউজিয়মের মতো ঐতিহাসিক পর্যায়ে তা সাজিয়ে রাখা হয়। ওতে ইতিহাস শেখানো চলে। কিন্তু তা সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি হয়না, আর্টিস্টের পক্ষে তা দুর্বহ। শিক্ষার জন্য এক স্থানে সব রকমের নমুনা জড়ো ক'রে রাখা ভালো, তাতে বিদ্যাদান হয়। কিন্তু সুন্দর কিছু হয়না।

তাই ওর পরবর্তী যুগে (বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতে) চেষ্টা হয়েছিল ফুটিয়ে তুলতে "অলঙ্করণের আর্ট"। তার একটা মানে হয় কোনো গৃহকে সাজাতে এমন সামগ্রিক আর্টের অবতারণা যার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকে, বিনা বিচারে নয়, যেখানে যেমন মানায় তেমনি ভাবে যথাস্থানে সাজানো। এই সামগ্রিক প্রচেষ্টাতে কিছু ফল হলো। অন্তত তার জন্য চেষ্টা করা হলো।

ভারতের বেলা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। এখানে সর্বত্র প্রাচীন আর্টের ঐতিহ্যে পরিপূর্ণ সর্বত্র এখানকার এক সময়ের আর্টের ইতিহাস মুখর হয়ে আছে, তার মধ্যেই আমরা বাস করছি। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যা কিছু ঘটে গেছে তার কোনো চিহ্ন এখানে নেই। তবে যে সকল স্থান বিদেশী ভাবাপন্ন হয়েছে সেখানে এই সৌন্দর্যবোধ নষ্ট হয়েছে। বোম্বাইতে যে সব আর্ট দেখা দিয়েছে তা বিকৃত রুচিসম্পন্ন। কলকাতাতে সম্প্রতি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু তাও সামান্য মাত্র। আর্ট দেখতে চাইলে তোমাকে চোখ ফেরাতে হবে প্রাচীন জিনিসগুলির দিকে, প্রাচীন যত ভাস্কর্য ও

চিত্রগুলি। সেগুলির একরূপ শ্রদ্ধামূল্য আছে। সেগুলি সমস্তই করা হয়েছিল সামগ্রিক ভাবে, বিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খল ভাবে নয়।

ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে আর্টের যে ক্রমিক গতি হয়েছিল সে কথা তোমরা সামান্যই বুঝবে কারণ এখানে তার কোনোই ছাপ পড়েনি—হয়তো তা সামান্য মাত্র। আর এখানে যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল, তার সকল সৌন্দর্য বিকাশের মধ্যে কিন্তু কোনোখানেই কারো নামসই রাখা নেই। যত গুহার মধ্যে যত চিত্রকলা, যত মন্দিরের মধ্যে যত ভাস্কর্য, সব কিছুই দেখবে নামসই বিহীন। কোনটা যে কোন ব্যক্তির রচনা তা কেউই জানেনা। এখনকার দিনের মত নাম জাহিরের কোনো চেষ্টা তার মধ্যে নেই। কেউ হয়তো বড়ো স্থপতি, বড়ো ভাস্কর, বড়ো চিত্রকর ছিল, কিন্তু তার কাজটাই যথেষ্ট, যাতে কেউ তাদের না ভোলে সেজন্য কোনো পত্রপত্রিকার মধ্যে তাদের নাম প্রচার করা হয়নি। যে গুণী সে তার গুণ প্রকাশ করেছে কিন্তু ভবিষ্যতে তার নাম বজায় রাখার জন্য নয়। সে তার আপন আশ্পৃহাতে উচ্চতর সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটিয়েছে, বিশেষত আপন আপন দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে। ইউরোপে মধ্যযুগের ক্যাথিড্রালগুলিও তাই, সেখানে কোনো আর্টিষ্টের নাম নেই। দৈবাৎ যদি কোথাও থাকে তবে কেউ সেটা বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু আজকাল সামান্য একটা ছবি আঁকলেও তার নিচে সই করা থাকবে যে অমুকজন এটি বানিয়েছেন।

প্রশ্ন শোনা যায় যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য আর্টের সংশ্লেষণ ঘটবে?
উত্তর হাঁ, উচ্চ স্তরে উঠলে সব কিছুরই সংশ্লেষণ হতে পারে।

প্রশ্ন তার ফল কি দাঁড়াবে? তাই হবে কি?

উত্তর যখন তার দরকার হবে তখন হয়ে যাবে। এখন চলছে তার প্রস্তুতি মাত্র। বর্তমান কালের সর্বব্যাপক বাণিজ্যিক যুগে সব কিছুরই সংমিশ্রণ ঘটছে, পূর্বের জিনিস পশ্চিমে আর পশ্চিমের জিনিস পূর্বে গিয়ে পড়ছে, পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করছে। এর ফলে একটা ঘাঁটাঘাঁটি গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু ওরই ভিতর থেকে নতুন একটা কিছু তৈরি হবে—তার খুব বেশি দেরী নেই। মানুষদের সংমিশ্রণ হচ্ছেনা, যদিও যাওয়া-আসা যথেষ্ট হচ্ছে। পাশ্চাত্ত্যের যে সব জাতি জগতের নানা দেশ জয় করেছে সেখানে তারা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু আগেকার কালে রোম গ্রীসদেশ জয় ক'রে গ্রীসেরই প্রভাব গ্রহণ করেছিল। আর আমেরিকানরা এখন জাপানের জিনিসই গ্রহণ করছে যদিও নিজেরা তা জানে না। ওরা যখন জাপান অধিকার করেছিল তখন দেখা গেল ওদের পত্রপত্রিকাগুলো জাপানী জিনিসে ভরপুর। আমেরিকার তৈরি কোনো কোনো জিনিসেও জাপানের প্রভাব দেখা যায়। এমন ব্যাপার আপনা থেকেই হয়। আশ্চর্য কথা এই ভাবেই একটা ভারসাম্য ঘটে, যারা বিজেতা তারা ভাবের ক্ষেত্রে বিজিতদের

যারা পরাজিত হয়। বাস্তবের দিক দিয়ে ক্ষয়ক্ষতি ক'রে তারা ভাবের দিক দিয়ে পরাজিতের দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ে।

আর বিশ্রণের কথা...প্রকৃতির ক্রিয়া সেখানে বিলম্বিত, জটিল। একটা কোনো কিছু সম্পন্ন করতে দীর্ঘকাল সময় নেয়, যদিও তা শীঘ্রই হতে পারতো। ওর ফলে জগতে প্রচুর অপচয় ঘটছে। কিন্তু প্রকৃতি ধীরে সুস্থে তার বিশ্রণের কাজ করে চলেছে।

প্রশ্ন সেটা কি ইচ্ছাকৃত?

উত্তর মানুষদের অর্থে "ইচ্ছাকৃত" নয়। কিন্তু ওর মধ্যে একটা মতলব একটা লক্ষ্য আছে। সবই নির্ভর করে চেতনার মাত্রার উপর। মানুষ দেখছে কাজগুলো অব্যবস্থিত ভাবে হচ্ছে, অনর্থক সময় নষ্ট, কারণ মানুষের সময়ের ধারণা সীমায়িত, তাদের নিজেদের জীবনের কালসীমা অনুসারে। কিন্তু প্রকৃতির কাছে কাল অনন্ত অফুরন্ত। অপচয়ে তার কিছু যায় আসেনা, কারণ তার ব্যঞ্জনকটাহ অতি বিরাট, সেই কটাহের মধ্যে সব কিছুকে, ফেলে দিয়ে সে দেখায়, সাফল্য না হলে সমস্তই আবার ঢেলে ফেলে, আবার নতুন ক'রে নিয়ে দেখাতে থাকে। কোনো কিছুই তার নষ্ট হয়না, তার এ কাজ বরাবরই চলতে থাকে। তার জিনিসগুলিকে নিয়ে সে নিত্যই ভাঙছে, গড়ছে, ওলটাচ্ছে-পালটাচ্ছে, লক্ষ কোটি বার তাই করতে থাকলে তাতে তার ক্ষতি কি আছে! ঐ কর্মটুকু ছাড়া কিছুই তার নষ্ট হয়না, আর এই কর্মেই তার আনন্দ। কাজ ছাড়া সে থাকতেই পারেনা।

প্রশ্ন প্রকৃতিরই তাতে আনন্দ, কিন্তু মানুষের তো নয়!

উত্তর না, সেটা ঠিক কথা। তার কাছে ওটা কিছু নিষ্ঠুর রকমের আনন্দ। বাস্।

—শ্রীমা

পথের কথা

১৭ জুলাই, ১৯৭১

এটা আমি বুঝেছি যে ভগবৎ চেতনা যদি এক মিনিটের জন্যও মানবের চেতনার মতো হতো তাহলে সমগ্র জগৎ ধ্বংস হয়ে যেত...আমরা চাই সকল কিছুতে, খারাপ কিংবা মিথ্যা কিছু দেখলে, বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখলেই, আপনা হতেই সে জিনিসকে ধ্বংস ক'রে ফেলতে। কিন্তু কোনো কিছু বদলানো আর ধ্বংস করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য।

ভক্ত হ্যাঁ, ঠিক কথা।

মা আপনা হতেই ইচ্ছা জাগে—মিথ্যাকে নষ্ট ক'রে ফেল। কিন্তু যখন ইচ্ছা ভগবান যদি এক সেকেণ্ডের জন্যও করতেন তাহলে এই দুনিয়াই থাকত না।...এই দেহটা বুঝেছে সে কথা। অদ্ভুত ব্যাপার...আমরা কী? মানুষ কী? মানুষের বিশ্বাস, হায় ভগবান, (মা দেহ ফুলিয়ে দেখালেন), তাদের এই বিশ্বাস...ওঃ! কিন্তু যদি একটুও বুঝে নিয়ে পূর্ণ তালাভের চেষ্টা করতো,—কিন্তু তারা ভাবে যে কেবল তারাই রয়েছে, তারাই খুব অসাধারণ। (মাথা ধরে মা হাসতে থাকলেন)

শ্রীঅরবিন্দ কোথায় যেন বলেছেন, দিব্যচেতনার সংস্পর্শ পাওয়া মাত্র তোমার এই বোধ আসবে যে—দম্ভে দেমাকে এ জগৎ কতই হাস্যকর! মানুষের যা দম্ভ, এমন কি পশুদের মধ্যেও (দেখেছি আমি) ও জিনিস এসে গেছে। কেবলই দম্ভ, দেমাক ভ্যানিটি...

(নীরব থেকে)

তুমি দেখবে যে প্রবঞ্চনাকে বলা হয় ভালোমানুষটি। আর যারা পরকে না ঠকিয়ে নিজেদেরই ঠকায় তারা তো অসাধারণ ব্যক্তি। অবিশ্যি নয়, এ আমি দেখেছি প্রায়ই এখানে ওখানে দেখা যায়—কিন্তু আমি সমগ্র জগতে, সমস্ত পৃথিবীতে, সকল মানুষের মধ্যে তাই দেখি। প্রবঞ্চনার মধ্যেই বসবাস করি—কি ভয়ানক!...অপরকে ঠকানোর চেয়ে নিজেদেরই ঠকায় খুব বেশি।

(নীরব থেকে)

অর্থাৎ যা প্রকৃত তা আমরা দেখিনা।

(নীরব থেকে)

ওর থেকে কেবল একটিমাত্র বাঁচোয়া আছে—ভগবানকে আঁকড়ে ধরা, এমনি ক'রে (হাত আঁকড়ালেন) যাকে ভগবান বলে ভাবছি তাকে নয়, যাকে ভগবান আন্দাজ করছি তাকে নয়...যাকে ঐকান্তিক আস্পৃহা নিয়ে আকড়ানো যায়।

(নীরব থেকে)

দেখ, তোমাকে আগেই বলেছি যে দেহচেতনা এখন আগের থেকে ঢের পেরে যায়

যা এবার কি কি হবে, তার কাছে কে কি বলতে আসছে। কিন্তু সেটা (কি বলব ?) বাস্তবের দিক দিয়ে নয়, ভাবের দিক দিয়ে যা যা হচ্ছে ও হবে—কি আশ্চর্য...এটা নিত্যই হয়। আমি নিশ্চল হয়ে বসে থাকি ভগবানে সমর্পিত হয়ে—আর সব কিছু এই ভাবে ঘটতে থাকে (পর্দার উপর ছবি দেখানোর মতো)—ঘটনাবলী হয়, লোকজন আসে, কথা বলে...আগে মনে করতাম যে আমার স্থূল চেতনা চুপ ক'রে থাকতে না পেরে এই সব করছে, তার পর দেখলাম যে বাইরের জিনিসই এসে আমার কাছে বাস্তবের আকার নিচ্ছে। তাই আগের থেকে আমি মনের মধ্যে সব দেখতে পাই, কি হতে চলেছে তা বলে দিতে পারি।

...সাধারণ মানুষ একে বলবে ভবিষ্যদ্বাণী, কিন্তু মন তা করতে যায়না, সে চুপ করেই থাকে...কেবল কেউ যদি আমায় কিছু শোনায়—দেহ তাতে আশ্চর্য হয়না, সে আগেই জানতো যে ও কি বলবে। আশ্চর্য। একটা বিস্ময়ের ভাব।

২১ জুলাই ১৯৭১

দেহটা ক্রমে আরো সচেতন হচ্ছে, কিন্তু এক অদ্ভুত উপায়ে।

ভক্ত : যথা ?

মা সে কথা তাহলে মনের দ্বারা বলা চাই, কিন্তু আমি যে তা পারিনা।

(নীরব থেকে)

কখন যে কি হবে, কে কি বলবে তা জানতে পারছি...কিন্তু কেমন ক'রে বোঝাই ?...আমি যেন তাই হয়ে দাঁড়াই, সেই সব ঘটনা, মানুষ, তাদের সব কথা...

দেহ উত্তরোত্তর চেতন হচ্ছে বটে কিন্তু মনের মধ্যে নয়...সব কিছুতে যেন স্বয়ং হয়ে ওঠার মতো। এ কথা বুঝিয়ে বলা কঠিন...কেবল অনুভবের ব্যাপার (কেমন করে বলব ?)...আমি দেখতে থাকি যে মানবচেতনা কেমন ক'রে ভগবৎ কর্মকে বিগড়ে দিচ্ছে (ইঙ্গিত), তার আসল গড়নকে খারাপ ক'রে দিচ্ছে। আমরা ছোটো হয়ে, বিকৃত হয়ে, সব কিছুকে তুচ্ছ করি। জানি সব, জ্ঞান আমাদের চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে, কিন্তু তবু নিজেদেরকে বিকৃত ক'রে জটিল ক'রে তুলেছি। আমি সুনিশ্চিত বোধ করি যে ভিতরের সব কিছুকে ভিতরকার ভগবান ঠিকই গড়ছেন, কিন্তু বাইরে তা বেরিয়ে আসছে বিকৃত হয়ে। এমনভাবে বলতে গেলে কথাটা অর্থহীন শোনাবে কিন্তু এটাই সত্যের সব চেয়ে কাছাকাছি বলা। যেটা অতি সহজ ও অতি আশ্চর্য তাকে এমনি অর্থহীন ভাবেই বলতে হয়, আমরা এমনই বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছি...যা খুবই বিকৃত জিনিস তাকেই আমরা বেছে নিই।

জানিনা আমার এই কথাগুলিও নিজেদেরকে বিকৃত করছে কিনা,...কিন্তু ও ব্যাপার বস্তুত এতই সহজ ও প্রদীপ্ত, বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ। কিন্তু তাকে আমরা বাইরের থেকে যেমন দেখব তাই করে ফেলব, জীবন এমনই দুর্বোধ্য ও জটিল।

(নীরব থেকে)

আর আমি কিন্তু রয়েছি ঐ সবের মধ্যে, ঐ সব ঘটনাবলী আর জটিলতা আর লোকজন প্রভৃতি সকল কিছুর মধ্যে . আর পিছনে রয়েছে কেবল শক্তি নয়, তা হলো চিৎশক্তি—একটা জাগ্রত চেতনা, একটা স্মিতহাস্যের মত, যে হাসি সমস্ত কিছুই জানছে। হাঁ, তাই। তার পর আমি যখন স্থির হয়ে খোলা রইলাম (হাত খুলে দেখিয়ে) তখন যেন সবই চমৎকার, পরমাশ্চর্য, অন্যরকম কোথাও কিছু নেই। তার পর যেমনি লোকে কথা বলতে শুরু করলে কিংবা যেমনি তাদের আসতে দেখলাম অমনি সব কিছু জটিল হয়ে গোলমাল হয়ে গেল।

আমি জানি, এ জীবন থেকে ঐ জীবনে যাওয়া...যখন অপর দিকে চলে যাওয়া হবে—ওঃ। তখন সমস্ত অনুমান ও আলোচনা থেমে যাবে, বোঝাতে যাওয়া, সাব্যস্ত করা, গুছিয়ে বলবার ইচ্ছা করা ঘুচে যাবে...কিন্তু যদি স্বয়ং তাই হয়ে উঠতে পারি, কিছু না বলি বা না ভাবি বা সাব্যস্ত না করি, তাহলে জীবনের বাইরে রয়ে গেলাম... এ নীরবতা কিন্তু তেমন নয়। এ না-বলা বাণীর নীরবতা নয়, এ ধ্যানের নীরবতা...তা প্রাণদীপ্ত। প্রাণপূর্ণ ধ্যানের নীরবতা।

নতুন রকম জীবন নিশ্চয় তৈরি হচ্ছে, পুরানো রকম জীবনকে সরে যেতে হবে।

বলতে পারি যে কেউই কিছু জানেনা, কোনোখানে নয়, কিন্তু যারা আস্পৃহা করছে (কি বলি ?) অর্থাৎ যাদের ইচ্ছার জোর আছে, টান আছে, জানবার দিকে বেগ আছে, যারা বাস্তবিকই হতে চায় এবং জানতে চায়, তারা,—আর যারা এ সব জিনিসকে ধোঁড়াই কেয়ার করে, নিজেদের ছোটো কিংবা বড়ো অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখে—তারা রাজাই হোক বা ঝাড়ুদারই হোক তাতে যায় আসেনা, সব কিছুই তাদের সমান, তাদের স্পন্দন গুলো সব একই।

২৮ অগষ্ট, ১৯৭১

নতুন কথা কিছু আছে ?

ভক্ত : না, একই রকম কথা।

মা : কি সে কথা ?

ভক্ত : আমি কেবল অপেক্ষা করছি।

মা ও। অপেক্ষা করছ—আমিও তাই করছি (হাসা)

(নীরব থেকে)

জগৎ দর্শনের প্রণালী যেন পেরিয়ে গেছে—বিশ্রী দেখা আর চমৎকার দেখা—এমনি, আর এমনি, আর তেমনি (বিচিত্রদৃক্ ক্যালিডোস্কোপের মতো ভঙ্গী করলেন) যেন সকলে বলছে যে এদিক থেকে দেখলে এই, ওদিক থেকে দেখলে ওই, সেদিক থেকে দেখলে তাই...কিন্তু সত্যটি কোথায়...সত্য যা তা কী ? কতই কিছু তো হয়ে গেল (পূর্ববৎ ভঙ্গী) কিন্তু "আসল"টিকে, কেউ তা জানেনা।

আমি ঠিকই জানি যে ঐরকম দেখা এবং ভাবা পুরোপুরি মানবীয়, যা পরিবর্তনের পথে। পরিবর্তন-সময়টা আমাদের কাছে খুব দীর্ঘ বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তা হ্রস্ব।

আমাদের চেতনা সেই মূল এবং আসল এবং সত্যচেতনারই রকমফের, কিন্তু সে হলো অন্য জিনিস। তাই আমার দেহটা শেষ পর্যন্ত চাইছে (যতদূর বলতে পারি) সেই মূল ভগবানের মধ্যে লেপ্‌টে থাকতে। কোনোরূপ বোঝবার চেষ্টা নয়, জানবার চেষ্টা নয়, কেবল তাই হয়ে পড়ার চেষ্টা...আর তাতেই লেগে থাকা। তাই নিয়েই আমার সময় কাটে।

কেবল "চেষ্টা" মাত্রই নয় একটা মিনিট এদিক থেকে সরে দাঁড়ালেই তখন আর সময়ের প্রশ্ন নিয়ে কিছু যায় আসে না। আশ্চর্য, জীবনের ছোটোখাটো ক্রিয়াগুলোকে দেখে নিয়ে যখন ঐভাবে লেপ্‌টে যাই, সকল চিন্তা ছেড়ে দিয়ে কেবল চেতনার গভীরে প্রবেশ করি (ভিতরের দিকে ইঙ্গিত), অমনি সকল কিছুই যায় ঘুচে। সময় বলে কিছু আর থাকে না। আর যখন বাহ্য চেতনাতে থাকি (তার মানে বাইরের সৃষ্টির দিকে চোখ মেলাই) তখন মনোযোগ অনুযায়ী তাতে কমবেশি সময় লেগে যায়। তখন আর কোনো কিছুই যেন (কি বলব)—যেন পুরোপুরি বাস্তব নয় অর্থাৎ নিরেট বাস্তব নয়, কেবল থাকে দেহের একটা অস্বাচ্ছন্দ্য, তাতেই বুঝতে পারি ওর অপূর্ণতা। অপূর্ণ বলেই অমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নতুবা হতো এই (ভিতরে ভগবানে অনুপ্রবিষ্ট থাকার ইঙ্গিত)। "এই ভাবটি" থাকলে তখন তার শক্তি অতি বিরাট...যেমন, তাতে লোকের রোগ সেরে যাবে (বাহ্যভাবে আমি কিছু না করলেও এমন কি আমার কিছু না বলাতেও রোগ ছেড়ে গেছে)। আর যে ছেড়ে চলে যাবে...এখনকার শেষ ক'রে অপরদিকে যাওয়া, সেই দিকটাই হবে চেনা... যা একেবারে ছিল অজ্ঞাত।

একটা সময় ছিল যখন পূর্বজন্মের কথা, রাত্রের ঘটনাসমূহের কথা, অদৃশ্য জগতের কথা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পেতাম...এখন সব স্বপ্ন, বাস্তবকে আড়াল ক'রে রাখা স্বপ্ন... যে বাস্তব অজ্ঞাত কিন্তু ইন্দ্রিয়গোচর। কিন্তু আমি কি আবোলতাবোল বকছি।

ভক্ত : না, না।

মা কারণ এ সকল কথা যে বলতে পারাই যায় না।

সেদিন তুমি জানতে চাইলে (প্রশ্নটা মনে আছে) যে : আমি যখন এ ভাবে নীরব নিস্পন্দ হয়ে থাকি তখন কি কি হয়? তখন কোনো প্রচেষ্টা নয় (আর আস্পৃহাও নয়, প্রয়াসও নয়, যাকে বলে প্রবেগ হওয়া) কোনো জানবার কিংবা বোঝবার কিছু নয়, সে রকম কোনো প্রশ্নই নয় কেবল তাই হওয়া, হওয়া, হয়ে যাওয়া (মিষ্ট হাসি)

(নীরব থেকে)

বোঝের উপর তা খুবই আশ্চর্য, দুটোই একসঙ্গে, একটার উপর অন্যটা নয়, আগে পরে নয়, দুইই একত্রে (আঙুলে আঙুলে জড়িয়ে বললেন), একত্রেই অত্যাশ্চর্য এবং

অতি-ভয়ংকর...সাধারণ চেতনাতে যেমন হয়...এমনি ভয়াবহ যে এক মিনিটও মানুষ তাতে বাঁচে না, আবার সেই সঙ্গেই জীবন, এমন আশ্চর্য, আলো আর চেতনা আর শক্তি নিয়ে তা পরমাশ্চর্য। ও! সেই শক্তি! শক্তি! নিজের এই ব্যক্তিশক্তি নয় (নিজের গা চিমটে ধরে দেখালেন), তা অন্য কিছু, যা সব কিছুই, অথচ বলে বোঝানো যায় না।

সব চেয়ে বড়ো কথা অবশ্য তাই, তাকেই খুঁজে পাওয়া। তাই আমার যখন কোনো কাজ নেই তখন...(ভিতরে প্রবেশের ইঙ্গিত)।

(নীরব থেকে)

কেবল তুমি, তুমি—

সকল সৃষ্টির সেখানেই পরিণতি, নিগূঢ়তম আনন্দের সঙ্গে সেই তোমাকে অনুভব।

(মা হেসে চুপ করলেন)

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

দেহকে শেখানো হচ্ছে ভগবানের 'পরে ভগবানের মধ্যে বাঁচতে—সকল কিছুর, সমস্ত কিছুরই জন্যে। কেবল এর চেতনা যখন ভগবৎ চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে তখনই এর পুরো অস্তিত্ব অনুভব হয়। তার তীব্রতা অতি অসাধারণ। স্থূল দেহ যখন তাতেই পরিণত হবে তখন তাই হবে নিরেট জিনিস, অবিচল এবং সম্পূর্ণ। সেই নিরেট ভাব...ভগবানের মধ্যে এবং ভগবানেরই কর্তৃক বেঁচে থাকার চেতনা, আর ঐ মানব চেতনার মধ্যে থাকা, এই দুই রকমের মধ্যে এতখানি তফাৎ যেন একটা হলো মৃত্যু, আর অন্যটা জীবন, পুরো নিরেট দেহ উপলব্ধি নিয়ে।

এখন শুরু হয়েছে শক্তির কেন্দ্রীকরণ,—না, এখনও তা পুরোপুরি হয়নি, সবে তার প্রস্তুতির সূচনা। হাঁ, তাই-ই অতি আশ্চর্য। এমন প্রবল সে শক্তি আর এমন বাস্তব সে চেতনা যা অন্য কিছুতে হতে পারে না—মন প্রাণ দেহের যা কিছু তার তুলনাতে অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। সে একেবারে পাকা নিরেট (মুষ্টিবদ্ধ ক'রে দেখালেন) আর তেমনি কঠিন ও মজবুত।

এখনও অনেক সমস্যার সমাধান বাকী, কিন্তু বাক্য বা চিন্তার দ্বারা নয়। আর সব কিছু আসছে বিকাশ হতে—কেবল ব্যক্তিগত জিনিসই নয়, কিন্তু সর্বলোক, সকল ঘটনা, সব কিছুর দ্বারাই দেহ শিক্ষা পাচ্ছে সত্য চেতনার। এটাই···পরম আশ্চর্য।

(মা তন্ময় হয়ে রইলেন)

সমস্যা ছিল এমন দেহের যাতে বিকাশোন্মুখ শক্তিকে সে ধারণ করতে পারে। সাধারণ রকমের দেহ সেই বিরাট শক্তির পক্ষে খুবই হাল্কা ও ভঙ্গুর। তাই দেহ নিজেকে ক'রে নিচ্ছে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত।...হঠাৎ দেহটা এক আশ্চর্য দিগন্তের সম্মুখীন হলো। তারপর সে যতটা পারে এগিয়ে চলুক; তার নিজেকে সামঞ্জস্য ক'রে নিতে হবে। এখন চলছে পুরোপুরি মধ্যবর্তী অবস্থা।

জানিনা ততখানি নমনীয় হতে পারবে কিনা। এখন নমনীয়তার প্রশ্ন। সেই শক্তিকে ধারণ ক'রে তাকে বাইরে প্রয়োগ করতে পারা (ছড়িয়ে দেওয়ার ইঙ্গিত) যাতে সে তার অভিব্যক্তি হবার পক্ষে কোনোরূপ বাধা না পায়। বাহ্য আকৃতিটা হলো ভবিষ্যৎ পরিণতির ব্যাপার, সকলের শেষে তা বদলাবে।

(তন্ময় হলেন)

এমনই অফুরন্ত চলতে পারে...কিন্তু একটা স্পর্শ পেয়ে (বেরিয়ে আসার ইঙ্গিত)

তুমি কি অনুভব করেছ?

ভক্ত অমুক মহিলাটি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আপনার কাছে এসে আমি যেমন অনুভব করি। সে বললে "আপনার কাছে এলেই আমার দেহ যেন প্রার্থনাপূর্ণ হয়ে যায়।" ঠিক তাই। আমার মধ্যে একটা শক্তি জাগে যা দেহের সকল অংশকে আপ্লুত করে, আর হয়তো এক তীব্র আশ্লেষে সব কিছু কানায় কানায় ভরে ওঠে।

মা ও, কিন্তু আমার দেহও ঐরূপ অনুভব করে।

ভক্ত হাঁ, দেহ হয়ে ওঠে প্রার্থনাময় আর এমন এক শক্তি জাগে...বলতে পারি না, তবে যেন এক উদ্ভাসিত স্বর্ণজ্যোতি সব কিছুকে উপরের দিকে উঠিয়ে দিচ্ছে।

মা হাঁ, ও রকম তো সব সময়েই হচ্ছে।

(নীরব থেকে)

যেন...অবিরল তার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে (ইঙ্গিত)

ভক্ত হয়তো জড়ের মধ্যে ভগবৎ প্রেম ঐরকমই হয় (মা খুব হাসলেন)

যত তীব্র তত উদ্ভাসিত...যেন জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে। এমন তীব্র যে তাকে "প্রেম" বলা কঠিন, কারণ প্রেম বলতে যেমন হওয়া উচিত তেমন মোটেই নয়।

মা হাঁ, তাই তো বলি...এমন হয়ে পড়ি (কপালে হাত দিয়ে) সব শূন্য, শূন্য, এখানে কিছু নেই, কিছু নেই, সবই উপরে (ইঙ্গিত), হাঁ উপরেই বিরাট স্বর্ণজ্যোতি।

ভক্ত হাঁ, তাই।

(নীরব থেকে)

মা এমন বোধ হয় যেন...গাছের গায়ের বল্কল, কচ্ছপের কঠিন খোলস সবই গলে যাচ্ছে, দেহটা এখন আর নেই, (ইঙ্গিত করলেন)। মানুষের বেলাতে যা কঠিন জড় তা যেন খসে পড়বে, কারণ তা গ্রহিষ্ণু নয়। আর এই দেহ (গায়ে হাত দিয়ে) চেষ্টা করছে, খুব চেষ্টা করছে (পূর্ববৎ ইঙ্গিত)। এ এক অতি আশ্চর্য অনুভূতি। যদি গলে যাওয়া পর্যন্ত টিঁকে থাকতে পারে তাহলে তখন তার আসল অস্তিত্বের প্রকৃত সূচনা হতে পারবে।* —শ্রীমা

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

গল্প শোনো মণিমালা

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

( )

গল্প শোনো মণিমালা ! ভরা থাক তোমার নিমেষ
গল্পে গল্পে ভরা এ ভাঁড়ার !
রাজায় রাজায় যুদ্ধ কালস্রোতে হয়ে আসে শেষ
ভিন্ যুদ্ধে সৃষ্টি তোলপাড়।

উত্তর মেরুর কথা, হিমগিরি শীর্ষ অভিযান
ডুবে যায় ; চাঁদে সে উধাও
দুর্গম পথের গল্প—বীরের দুর্লভ আত্মদান
মানুষের ঠিকানা কি পাও ?

এতো গল্প আছে তবু তবু দেখো নিজের ঠিকানা
খোঁজা কই হলনা তো শেষ
কোনো মানচিত্রে যার কোনোদিন ধরে নি সীমানা
এখনো গোপন সেই মহাদেশ।

সব কথা সব গল্প শেষ হয় যদি
তবু সে অতন্দ্র জাগে বুকে নিরবধি।

(২)

এক-ই মণিমালা। ইতিহাস পাতা
ঘনেছিল রোম, ঘনে কলকাতা
ভ্রষ্টনীতিরে আছো ভেবে ত্রাতা
দাসখত লিখে যাও !

গোড়ায় গলদ কখনো ঘোচে না
মাটি ছাড়া মূল বৃক্ষ শোভে না
পত্র-পুষ্প ভ'রে সে তোলে না
বাহির ভিতরটাও।

দারিদ্র্য আনি আছে দেশজোড়া
হীন দুর্বল আধমরা ঘোড়া
রক্তে-আগুনে বিত্তের ভাঙ্গাপোড়া
হলে বিপ্লব খাঁটি ?

রক্ত-ঝরানো অযুত সবর
সার্থকতার আনে কি খবর ?
প্রেম ও দেবতা যদি না দোসর
সব ইতিহাস মাটি।

(৩)

গল্প শোনো, মণিমালা !
অপার সূর্যের থালা
যবনিকা তোলে সে যখন

আশ্চর্য প্রভাত আসে
অপরূপ আলোর উল্লাসে
ভ'রে ওঠে সৃষ্টির ভুবন।

মগ্ন হলে ঘুমঘোরে
এমন সোনার ভোরে
দেখো বুকে চাকা

একটি আলোর নদী
প্রসারিত নিরবধি
সূর্যে জেগে থাকা।

উঠে চল

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

অগ্নি সেখানে আলো দেয়, কিন্তু দহন করে না...
দহন করে সে তখনই যখন সে নেমে আসে
এখানে এই নিম্ন-ভূমে
যার পৃথিবীর কঠিন খোলসে ঘরে পড়ে বন্দী :
তখন জিহ্বা যত তার জ্বলে ওঠে—
রুদ্র রোষে রক্তিম দাবদাহ নিয়ে,
নিঃশেষে জ্বালিয়ে দেয় সেই সব বাধা
যারা সঙ্কীর্ণ করে বেঁধে রাখে,
জ্বালিয়ে দেয় গহ্বর-কন্দরের
অন্ধকার যত।

কাজ যখন তার সারা হয়ে যায়,
ফিরে পায় সে তার আপন
সহজ সমুজ্জ্বল স্বরূপ
সেই তীব্র প্রশান্ত আনন্দময় সত্তা
যা সে আপনি নিজে,
সেই সূর্য্যের দীপ্তি যার সঙ্গে মিশে রয়েছে
সোমদেবতার আত্মার সংহত আনন্দ।

অগ্নি দহন করে—
অগ্নি দহন করে যা কিছু মলিন,
নিষাদ সোনাকে সে উজ্জ্বলতর করে তোলে ;
তা দীর্ণ করে, পীড়ন করে
যা কিছু অনমা আর অনিচ্ছুক,
কিন্তু যা অনুগত আর আগ্রহী
তাকে সে দান করে সুসঙ্গতি আর সুসামর্থ্য।
অগ্নি হ'ল মহান দেবতাদের বিশুদ্ধ শক্তিবেগ,
সে সেই স্বচ্ছ জ্ঞান যা আনন্দকে
তনুময় করে ধরে।

কিন্তু অনাজিত জড়ত্ব
আর অজ্ঞানের স্বেচ্ছাবৃত্তি—
তাদের কাছে সে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্করী
সর্বগ্রাসী বহ্নিশিখা।*

---

* To the Heights থেকে অনূদিত—অনিলা

প্রণামের পর

সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

করপুটে ভাগ্য রাখি' অঞ্জলির দৃঢ়সংগঠনে
জননী প্রণাম করি। হাতে দেন আরক্ত গোলাপ।
বর্ণে তার, গন্ধে তার, স্পর্শে তার অদৃষ্টের নদী।

পণ্ডিচেরী সিন্ধুতটে রাত্রি এলো দুরন্ত-রমনী
আহত সাপের মত, নক্ষত্রের জটিল গণিত
দুর্বোধ্য মুখের মত ভাসিল আকাশে।

নিবেদিত বন্ধুটির হিরণ্ময় মৌন অতিক্রমি'
উদ্ভাসিল দৃঢ়শান্তি স্তব্ধের শরীর।
প্রার্থনার পরিব্যাপ্ত মানচিত্র ভ্রমি'।

পৃথিবীর অন্তঃপুরে যুথবদ্ধ কবন্ধবাহিনী
চৈতন্যের ইতিহাস উপদ্রুত বিলম্বিত করে।
সে ব্যর্থ কাহিনী হানি' এসেছে জননী।

উত্তীর্ণ সে জড়তনু প্রতিভাত জ্যোতির প্রতিমা
হৃদয়মন্দিরে নামে সন্ধি ও সংকটে।
প্রদোষে, বিষাদে আর প্রক্ষালিত আলোকের তটে।

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন ভদ্রলোকের নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন আর ইতস্তত: না করিয়া সোজা ভদ্রলোকের সম্মুখে হাজির হইয়া তাঁহাকে আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাই সমীচীন বোধে সেই দিকে আগাইয়া গেলাম। আশ্চর্য্য, তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়াও তিনি মোটেই বিচলিত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না। পরন্তু ভদ্রলোকও কিছুটা আগাইয়া আমার দিকে আসিলেন, এবং হিন্দী-উর্দু-ইংরাজী মিশ্রিত ভাষায় প্রশ্ন করিলেন, "আপনি কি সমংগুী বিমানক্ষেত্রে নূতন আসিয়াছেন? আপনার চলাফেরা ও হাবভাব দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে আপনি এখানে একেবারে আনকোরা নূতন লোক। এখানে অর্থাৎ পাঠান এলাকায় কেমন করিয়া নিরাপদ থাকা যায় সে বিষয়ে আপনার কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া মনে হয় না।"

ভদ্রলোকের নিকট বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া কিছুটা হতভম্ব হইয়া গেলাম। মনে মনে ভাবিয়াছিলাম দস্যু-প্রকৃতির লোকটার একেবারে সামনা-সামনি আসিয়া তাহাকে চার্জ করিলে সেই হতভম্ব হইয়া পলাইয়া যাইবে—তখন বিশেষ সাহসের কাজ করিয়াছি বিবেচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিব। এ যে একেবারে উল্টা হইল। ভদ্রলোক দস্যু অর্থাৎ পাঠান-দস্যু কিছুতেই হইতে পারেন না। এবার ভাল করিয়া পোষাকের দিকে নজর করিয়া দেখিলাম। পোশাক ছাই রংয়ের ব্যালেসিয়া কাপড় দিয়া তৈয়ারী। এবার আর ভুল না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপ কেয়া টোচি স্কাউট হ্যায়?" তারপর বন্ধুত্ব পাতাইতে, বিশেষত: পাঠানের সাথে বন্ধুত্ব পাতাইতে, আর মোটেই বিলম্ব হইল না এবং বন্ধুত্বের প্রথম পুরস্কার আমাকেই গ্রহণ করিতে হইল। ভদ্রলোক তাঁহার থ্রিচক্রযানের সামনে বসাইয়া সেই গভীর রাত্রে আমাকে সমংগুী বিমান ক্ষেত্রের ছাউনিতে পৌঁছাইলেন।

থ্রিচক্রযানের সামনে আমাকে বসাইয়া সমংগুী বিমান বন্দরের ছাউনির দিকে যাওয়ার পথে পাঠান ভদ্রলোক অনেক গল্প বলিলেন। পথে কোথায়, কবে, কেমন করিয়া অতি-সাহসী কোন বৈমানিক তাহার হাতের আংটি, কব্জির ঘড়ি, পকেটের অর্থ এবং গায়ের ওভার কোটের বিনিময়ে আপন জান বাঁচাইয়া বিমান-বন্দরের ছাউনিতে ফিরিয়া আসিয়াছিল এবং পরের দিন অথবা দুই-চারি দিনের মধ্যেই তাহার হারান-বস্তুগুলি সবই ফিরত পাইয়াছিল—শুধু পকেটের অর্থ ছাড়া—সেই গল্পগুলি বেশ রসাল করিয়া বলিলেন। দ্রব্যগুলি টোচি স্কাউটরাই ফেরত আনিয়া দিয়াছিল কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জানাইলেন, যে টোচি-স্কাউটরাই দ্রব্যগুলি পাঠানদের নিকট হইতে ফেরত আনিয়া দেয় কিন্তু

ফেরত দিবার পূর্বে ঐ দ্রব্যগুলি সাবধান করিয়া রাখিবার দরুণ পাঠানকে কিছু পুরস্কার দেওয়ার রেওয়াজ আছে। রাইফেল অথবা অর্থ এই দুই বস্তুই পাঠান পছন্দ করে। সেইজন্য হারান দ্রব্যগুলির বিনিময়ে অর্থ এবং রাইফেল বন্দুকই দেওয়ার রেওয়াজ ছিল।

চৌচি-স্কাউট ভদ্রলোক তাঁহার গল্প বলিতেছিলেন এক নূতন ভাষায়—সে ভাষায় ছিল পুস্ত শব্দ, উর্দু শব্দ, হিন্দুস্থানী শব্দ আর ইংরাজী শব্দ। তাঁহার প্রায় সব কথাই পরিষ্কার বুঝিতে পারা গেল, কিছুটা বুঝা গেল তাঁহার ভাষার বিচিত্রতাতে। আর যে কথা ভাষায় তিনি বুঝাইতে সক্ষম হইলেন না, সে কথা তিনি বেশি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইলেন তাঁহার অঙ্গভঙ্গি এবং গলার স্বর ব্যতিক্রম করিয়া।

গল্প করিতে করিতে আসায়, বিশেষতঃ গল্পের কাহিনীগুলি এবং বলিবার ভঙ্গি এত রসাল ছিল যে, পথের দূরত্ব বোধেই আসিল না।

ছাউনিতে পৌঁছাইবার পর নূতন বন্ধুত্বকে কায়েমী করার উদ্দেশ্যে পাঠানকে সামান্য কিছু আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলাম। কাল তখন ভোর রাত্রির দিকে। ক্যান্টিন এবং মেস-বাড়ী দুইই বন্ধ। নিজের কামরায় লইয়া গেলাম এবং কিছু বিস্কুট ও নরম পানীয়ের সহযোগে বন্ধু অপ্যায়ন সমাপ্ত করিললাম।

সব স্থানেই ফৌজীরা নিজের নিজের কামরায় কিছু পানীয় রাখার ব্যবস্থা করে। পানীয় নরম বা গরম দুই প্রকারই হইতে পারে। নরম কমলানেবুর রস—আর গরম ত কত প্রকার। আমার কামরায় কমলানেবুর রস দিয়া প্রস্তুত নরম পানীয় সব সময় মজুত থাকিত। সেই নরম রসের পানীয় দিয়াই সেই দিন বন্ধু পাঠান-চৌচি-স্কাউট তাঁহার "ত্রেশ" অর্থাৎ তৃষ্ণা মিটাইলেন। এবং "ত্রেশ" মিটাইবার পর পুনরায় বার চৌদ্দ মাইল পথ আপন দ্বিচক্রযানে পাড়ি দিয়া কোয়েটায় আপন নিবাসে ফিরিয়া গেলেন।

এই ঘটনার পর যতবার কোয়েটা সহরে আনন্দ করার জন্য গিয়াছি ততবারই প্রথমে বন্ধুর খবর লইয়াছি এবং আরও কয়েকবার তাঁহার সাথে সাক্ষাৎ ও আলাপও হইয়াছে। প্রত্যেক বারই তাঁহার হৃদ্যতায় পাঠান হৃদয়ের একটা মধুর দিকের আস্বাদ পাইয়াছি। কখন, কখন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতাম এই পাঠানই কেমন আঘাতে তাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত মধুরতা বন্ধুত্ব মুছাইয়া ফেলে—এবং 'বদলা' লওয়ার জন্য দুশমন বা তার আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করে? খুব সম্ভব মনের অন্তরালে এই প্রশ্ন ছিল বলিয়াই বন্ধু পাঠান চৌচি-স্কাউটের একটা অনুরোধ রক্ষা করার চেষ্টা করিয়াও করিতে পারি নাই। এই ঘটনার পূর্বেও পাঠান বন্ধু বন্ধুত্বের জোরে রাইফেল বন্দুক উপহার চাহিয়াছিল কিন্তু সমস্ত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও তাহাকে রাইফেল বন্দুক উপহার দিতে পারি নাই, এবং এবারও দিতে পারিলাম না। তিনি বারে বারে অনুরোধ করিয়াছিলেন একটা নূতন সাভিস্ রাইফেল তাঁহাকে উপহার দেওয়ার জন্য। এমন কি, রাইফেলের বিনিময়ে অর্থ দেওয়ার কথাও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও সে কথা নিজে মুখ ফুটিয়া বলিতে সক্ষম হয়েন নাই কেননা বন্ধুত্বের মধ্যে অর্থের বিনিময় হইলেই বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। অস্ত্রাগারের

তালা চাবি দিয়া খুলিয়া রাইফেল বন্দুক বাহির করিয়া আনার পর আবার সেই অস্ত্র অস্ত্রাগারে রাখিয়া দিয়াছি। বাহির করিয়া আনার পর 'বলনা'—ন্যায়-অন্যায়ের সংস্কার মনের মধ্যে এমন ঘোঁট পাকাইয়া দিয়াছিল যে গুলিহীন রাইফেল পুনরায় অস্ত্রাগারের মধ্যে রাখিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছি। পাঠান বন্ধুকে নিজের সংস্কারের দাবিতে অকৃত হওয়ার ও কথা লঙ্ঘনায় জানাইতে পারি নাই। পাঠান বন্ধুর নিশ্চয় বিশ্বাস ছিল যে সুবিধা পাইলেই তাঁহাকে একটা নূতন রাইফেল উপহার দিব। এবং টোচি-স্কাউটদের একজন হইয়াও তাঁহার মনে কোন সংশয় ছিলনা যে ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার হইতে একটা নূতন রাইফেল বন্দুক বাহির করিয়া আত্মসাৎ করিলে কোন দোষ হয়না।

প্রতি মুহূর্তে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া বাঁচিবার প্রচেষ্টায়, ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া মাপিবার জন্য সংস্কারের যে মাপকাঠি পাঠানের মনে প্রাণে গড়িয়া উঠিয়াছে, তার সাথে আমাদের সংস্কারের মাপকাঠিতে অনেক পার্থক্য—এই দুই বিভিন্ন প্রকারে ও অবস্থায় অর্জিত সংস্কার কিছুতেই এক হইতে পারে না। আমাদের বেলায় সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে কিছুটা পিতা মাতা বা অন্যান্য নিকট আত্মীয় স্বজনের নিকট প্রাপ্ত জুজুর ভয় আর কিছুটা হয়ত আমাদের নিজস্ব অর্জিত। প্রতিবেশীর স্বার্থ যদি আমার স্বার্থের প্রতিকূল না হয়, তাহা হইলে তাহার স্বার্থ ব্যাহত করিবার কোন প্রয়োজন আমার নাই। যদি তাহার স্বার্থ আমার স্বার্থের প্রতিকূল হইল তখন, আমি তাহাকে বাধা দিতে পারি কিন্তু প্রাণ হরণ করিবার অধিকার আসে না। কিন্তু পাঠানের বেলায় প্রতিবেশী যদি তাহার বন্ধু না হইল, আর তার স্বার্থ ব্যাহত হওয়ায় যদি আমার সামান্য কিছু লাভ হওয়ার আশা থাকে—তবেই যথেষ্ট, তাহার স্বার্থ ব্যাহত করিতে গিয়া যদি তার প্রাণ হরণ করিতেও হয় তাহা হইলেও সেই কার্যে কোন অসঙ্গতি নাই, সেই কার্যে কোন অন্যায় বর্তে না।

স্টেশন কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন লীডার একদিন বনভোজনে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং বনভোজন কোথায় হইবে সেই স্থানও নির্দেশ করিয়া দিলেন।

সমংগুীর ছাউনিতে তখন যে বিশ পঁচিশ জন বৈমানিক ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন মাত্রই ছিলেন এ দেশের। কাজে কাজেই বনভোজনে আনন্দ করিতে গেলে তাঁহাকে সাথে লইতেই হইবে—নতুবা গ্রুপ্-হেড কোয়ার্টারে নানা প্রকার প্রশ্ন উঠিবার সম্ভাবনা। সম্পূর্ণ বিমান-বন্দর এবং সমংগুীর ছাউনি রক্ষা করার ভার দুই তিন জন বিলাতী রাজকীয় বিমান বাহিনীর বৈমানিকদের হাতে অর্পণ করিয়া স্টেশন-কমাণ্ডার আমাদেকে লইয়া বনভোজনে রওনা হইলেন। বনভোজনে (Picnic) যাওয়ার জন্য তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল—কেননা সারাদিন শুইয়া বসিয়া কোন প্রকার কাজ না করিতে করিতে তাঁহার শরীরে এত অবসাদ জমিয়া উঠিয়াছিল যে তিনি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। বনভোজনের ব্যবস্থা না হইলে হয়ত তাঁহার সুস্থ মস্তিষ্কে ব্যাধির সৃষ্টি হইত।

অতি প্রত্যুষে রওনা হইয়া দ্বিপ্রহরের পূর্বেই আমরা এক অতি মনোরম স্থানে আসিয়া পৌঁছাইলাম। পথের শেষে একখানি সুন্দর ছোট বাংলো বাড়ী—আর বাংলোর ওপারেই এক বিরাট পাহাড় সোজা উপরের দিকে উঠিয়া গিয়াছে চারিদিকে বড় বড় গাছের ঘন বন। বাংলো বাড়ীর চতুর্দিকে তার-কাঁটার বেড়া আর সম্মুখের দিকে বেশ প্রশস্ত একটি লৌহ-নির্মিত সদর দরওয়াজা। সদর দরওয়াজা, বাংলো বাড়ি, ঘন বন এবং পশ্চাতের বিরাট খাড়াই পাহাড় সমস্ত মিলিয়া একটা অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি।

খাড়াই পাহাড়ের অপর পার্শ্বে একটা পার্বত্য হ্রদ। বাংলো বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক পাঠানের নিকট সেই হ্রদের গল্প শোনা গেল। তাহার গল্প অনুযায়ী হ্রদ সৃষ্টি হইয়াছিল বহুদিন পূর্বে—পাহাড়ের এক অংশ ধ্বসিয়া যাওয়ার ফলে। হ্রদের তিন দিকেই পাহাড়। এক দিকের পাহাড়ের উপরের অংশ সমতল। সেখানে নানা ধরণের সুন্দর সুন্দর গাছ লাগাইয়া আরোও মনোরম করা হইয়াছে। সেখানেই বনভোজনের আনন্দ করা হয়। হ্রদে ট্রাউট মৎস্যের বীজ প্রথম একজন কমিশনার সাহেব বহুদিন পূর্বে কোথা হইতে আনাইয়া ছাড়িয়াছিলেন, তখন হইতেই ট্রাউট মৎস শিকারের জন্য ঐ হ্রদের প্রসিদ্ধি। উচ্চ পদের কোন গোরা আধিকারিক ঐ অঞ্চলে আসিলে, ঐ হ্রদে মৎস্য-শিকার খেলা হইত তাহার প্রধান কর্ত্তব্যের একটি। মৎস্য-শিকার খেলিতে না গেলে, আধিকারী সমাজের মানদণ্ডে পদ মর্য্যাদা ক্ষুণ্ন হইত।

বাংলো বাড়ীতে পাহারা দেওয়ার জন্য একজন পাঠান চৌকিদার মোতায়েন ছিল। সে-ই অতিথি অভ্যাগত কেহ আসিলে তাহাদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিত। আমাদের বেলাতেও, প্রথা অনুযায়ী, তাহাকে বাসস্থান ও আহারের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করা হইল। ইংরাজী ভাষাটা বেশ—অনুরোধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করার সময় দয়া করিয়া কথাটা ব্যবহার করা হয়—কিন্তু যাহাকে বলা হয় তিনি বেশ বুঝিতে পারেন "দয়া করিয়া" কথাটার আসল তাৎপর্য হইল হুকুম করা।

আমাদের সাথে প্রচুর রুটি পনির ও টিনে বন্ধ নানা প্রকার খাদ্য ছিল। দুই তিন প্রকার পানীয়ও ছিল। পাহাড়ে উঠিয়া হ্রদের জলে মৎস্য শিকার করার পর নিশ্চয়ই আমরা খুব পরিশ্রান্ত হইব। তখন "ক্লেশ" নিবারণের জন্য প্রচুর পানীয় প্রয়োজন। কিন্তু মজা হইল পাহাড়ের উপর যাওয়ার পর। মৎস্য-শিকার করিবার সাজ সরঞ্জাম কিছুই সাথে করিয়া আনা হয় নাই। মৎস্য-শিকারের কথায় আমরা সবাই নাচিয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু হ্রদের জলে মৎস্য-শিকার, বিশেষত ট্রাউট মৎস্য-শিকার, করিতে হইলে যে বিশেষ সরঞ্জাম প্রয়োজন হয় সে কথা কাহারও মনে হঁস ছিলনা। আমাদের অভ্যর্থনায় রত বাংলো বাড়ীর পাঠান চৌকিদার এবার তাহার দিল খুলিয়া খুব হাঁসিল এবং চক্ষু—একটি মাত্র—ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে প্রতিশ্রুতি দিয়া পাহাড়ের উপর হইতে তরতর করিয়া নামিয়া পড়িল। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই একজোড়া মৎস্য-শিকারের সরঞ্জাম লইয়া সে উপস্থিত হইল। সেই সরঞ্জাম ছিল ছিপ, সুতা, বঁড়শি এমনকি লাল-নীল

ফিতায় বাঁধা তার-কাঁটার তৈয়ারী ফড়িং টোপ। ফড়িং টোপ ছাড়া ট্রাউট মৎস্য ধরা যায় না। টোপ ফেলারও বিশেষ কৌশল আছে। জলের মধ্যে ফেলিয়া না ডুবাইয়া দিলে ট্রাউট মৎস্য টোপের আশে-পাশে দিয়া সফর করিয়া যান—কিন্তু নজর দেন না। কিন্তু ঐ টোপ যদি জলের সামান্য কিছু উপরে রাখিয়া ছিপের খেলায় এমন দেখান যায় যে জলের উপর দিয়া ফড়িং উড়িয়া চলিয়াছে তাহা হইলে আর চিন্তা নাই, ট্রাউট মৎস্য জলের মধ্য হইতে ঝপাং করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া কৃত্রিম ফড়িংটিকে গ্রাস করিয়া জলের মধ্যে দ্রুত সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিবেন। তখন আর সরিয়া পড়িবার উপায় নাই। কৃত্রিম ফড়িংয়ের সাথে বঁড়শি ছিল, ট্রাউট মহাশয় বঁড়শি-বিদ্ধ হইয়া ছটফট করিবেন এবং যদি পাকা খেলোয়াড় মৎস্য-শিকারীর হাতে পড়েন তাহা হইলে নিস্তার না পাওয়া অনিবার্য। কিন্তু যদি মৎস্য-শিকারী পাকা খেলোয়াড় না হন, তাহা হইলে ছিপের সুতা ছিন্ন করিয়া বড়শি-বিদ্ধ অবস্থায় ট্রাউট মৎস মৎস্য-শিকারীর আওতা হইতে নিস্তার পায়। নিস্তার পাওয়া ট্রাউট মৎস্য ঘর-পোড়া গরু যেমন রাঙ্গা-মেঘ দেখিলে পলাইয়া যায়। তেমনি জলের উপর বিচরণরত আসল ফড়িং দেখিয়াও আর গ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে লম্ফ দেয় না। প্রায় প্রত্যেক হ্রদের জলেই এমন দুই চারিটা ট্রাউট মৎস্য বাস করে। শিকারীরা লোলুপ দৃষ্টিতে সেইগুলির দিকে দৃষ্টি দেয় আর আফসোস করে কিন্তু কিছুই করিতে পারে না। মৎস্যগুলি কিন্তু দিনদিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া বিরাট আকার ধারণ করে। অনেক হ্রদের জলে এমনও দুই-চারিটা ট্রাউট মৎস্য বাস করে যাহারা অনেক শিকারীর পরিচিত এবং তাহারা ঐ বিরাট মৎস্যগুলির প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণও করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের ষ্টেশন-কমাণ্ডার স্কোয়াড্রন-লীডার ও অপর আর একজন গোরা, সেইদিন অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চেষ্টা করিয়া একটি ট্রাউট-মৎস্যও ডাঙ্গায় উঠাইতে সক্ষম হইলেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেইদিন নৈশ-ভোজনে আমরা ট্রাউটমৎস্যের আস্বাদন ভাল করিয়াই পাইলাম। আমাদের পাঠান তত্ত্বাবধায়ক সেই দিন পূর্বাহ্ণেই হ্রদের জল হইতে ট্রাউট মৎস্য সংগ্রহ করিয়াছিল—সেই মৎস্যগুলির সদ্ব্যবহার করিলাম।

আমাদের এতগুলি বৈমানিকদের জন্য বাংলো বাড়ী অনেক ক্ষুদ্র হইলেও রাত্রি যাপন বেশ আনন্দ সহকারেই হইল। খাদ্য ত প্রচুর ছিলই, সেই সাথে খাদ্য মুখ-গহ্বর হইতে পাকস্থলী পর্য্যন্ত নামাইবার জন্য পানীয়ও ছিল অঢেল। কাজেই রাত্র কাটাইবার জন্য কোন চিন্তা ছিল না। যে যেখানে পারিল সেখানেই সুখনিদ্রা দিল।

পরদিন আমরা সকলেই একবার করিয়া মৎস্য-শিকারের প্রচেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলাম। পাঠান তত্ত্বাবধায়ক তাঁহার কৌশল তখন প্রদর্শন করিলেন; অল্প সময়ের মধ্যেই গোটা তিনেক মৎস্য ধরিবার পর আমরা কয়েকজন পাহাড়ে শোভা দর্শনের জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। দুই পাহাড়ের সংযোগ স্থলের মধ্য দিয়া হ্রদের জল এক অতি শীর্ণকায়া জলধারা হইয়া বাহির হইয়াছে। বর্ষা কালে এবং শীতের শেষে যখন প্রচুর

পরিমাণ তুষার গলিয়া শীতল জলে পরিণত হয়, তখন খরশান শীর্ণকায়া জলধারা নদীর আকারে বাহিয়া যায়। নদীপথের দুইধারে অপরূপ দৃশ্য। যেখানে সামান্য জলস্পর্শে ভূমি সামান্য আর্দ্র হইয়াছে সেখানেই প্রচুর পরিমাণ পুদিনা-শাক উৎপন্ন হইয়াছে। কোন কোন স্থান পুদিনা-শাকে বহুদূর পর্য্যন্ত ছাইয়া গিয়াছে। আর সব স্থানই পুদিনা-শাকের মিষ্ট গন্ধে ভরিয়া রহিয়াছে। সামান্য কিছুদূর যাইতে না যাইতেই প্রায় পাঁচ-ছয় প্রকার পুদিনা শাক পাওয়া গেল। তখন পর্য্যন্ত জানিতাম পুদিনা এক প্রকারই হয়। কিন্তু পরে জানিয়াছি আমাদের দেশেই বহুপ্রকার পুদিনা-শাকের চাষ হয়, এবং পুদিনা-শাক হইতে অন্ততঃ এক প্রকার বিশেষ সুগন্ধি তৈলও নিষ্কাশণ করা হয়। মাটি যেখানেই সামান্য আর্দ্র সেখানেই পুদিনা-শাকের বিস্তার আর যেখান দিয়া জল বহিয়া চলিয়াছে সেখানে কিনারা ঘেঁষিয়া নারসিসাস ফুলের ঝাড়। পাহাড়ের গায়ে নৌরি তুলুন এখানে সেখানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। আপনা হইতেই ঋতুভেদের সহযোগে তার জন্ম বৃদ্ধি পচনের আবর্তন লীলা চলিয়াছে। ঐ অঞ্চলের মাটি ও আবহাওয়া এই জাতীয় গুল্ম ও ঝাড় গাছের জন্য নিতান্তই সহায়ক। কোন বাগানের আবশ্যক নাই, নাই কোন মালীর প্রয়োজন। পুদিনা, নৌরি ও নারসিসাস ছাড়া কোথাও কোথাও গোলাপের গাছও আছে। গাছগুলি সবই ক্ষীণকায়। হয়ত একটা দুইটাই শাখা, আর শাখায় একটি কি দুইটি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ফুলগুলিও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিন্তু সুগন্ধে ভরপুর। যত্ন করিবার জন্য কেহ নাই। সুগন্ধ বা সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য বাগানের মালিকও কেহ নাই। আপনার আনন্দেই আপনি ফুটিয়া পাহাড়ী নরুভূমিতে আপন সৌরভ ছড়াইতেছে।

পাহাড়ের চালু হইতে অতি যত্নে গোলাপগাছ তুলিয়া আনিয়া আমাদের ছাউনিতে লাগাইয়াছিলাম। প্রত্যহ জল দেওয়া হইত আর আদর যত্নের ত্রুটি ছিল না। আমাদের ছাউনির বৈমানিকরা সকলেই গভীর যত্নে সেই গাছের পরিচর্য্যা করিত। কিন্তু অযত্নের গাছ যত্নের মূল্য বুঝিল না—না অতি যত্নের ধকল সহিতে পারিল না বলিতে পারিব না, অল্প দিনের মধ্যেই তাহার পরমায়ু ফুরাইয়া গেল।

এদিকে আমাদের স্কোয়াড্রন কবে আসিবে কি আসিবে না তার কোন সংবাদই নাই। প্রত্যহ দিব্য খাওয়া-দাওয়া-বেড়ানো আর নিদ্রা। এত উত্তম ব্যবস্থাও আর ভাল লাগিতেছিল না।

আমাদের ছাউনি হইতে পাঁচ সাত মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র টিলার উপর স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের যক্ষা-রোগ নিবারণের জন্য আরোগ্য-নিকেতন ছিল। একদিন দেখিতে গেলাম। আরোগ্য-নিকেতনের পশ্চাৎ দিকে খুব উঁচু পাহাড়। আর একটু আগাইয়া গেলে অপ্রশস্ত গিরিপথ। গিরিদ্বার দিয়া প্রবেশ করা মাত্র স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। চতুর্দিকে উঁচু পাহাড় বেষ্টিত এক গোলাকৃতি স্থান। দেড়শত বা দুইশত গজ হইতে বেশি ব্যাস হইবে না। কিন্তু সমস্ত এলাকাই সমতল। চতুর্দিকের পাহাড় সামান্য চালু হইয়া উঠিয়াছে আর চালুর উপর ঘাস কাটা রহিয়াছে। বৃষ্টির জল, বায়ুর প্রতাপ ও সূর্য্যদেবের প্রকোপে

ধাপের কিনারাগুলি নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এ যেন এক বিরাট রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিলাম। উন্মুক্ত আকাশের তলে এইবার খেলা শুরু হইলেই হয়। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে আরও বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। মাঝে মাঝে ধাপের নিচে, কিন্তু গোপন-ভাবে, গিরি কাটিয়া গুহার আকারে গহ্বর রহিয়াছে। আর এই সুবৃহৎ আঙ্গিনার উপর ছড়ান রহিয়াছে স্ফটিকের নানা আকারের টুকরা। এত স্ফটিকই বা আসিল কোথা হইতে? ঐ এলাকায় আর কোথাও ত স্ফটিক দেখি নাই। আর এই বৃহৎ রঙ্গালয়ের নির্মাতাই-বা কে? কবেই বা এই রঙ্গালয়ের নির্মাণ হইয়াছে? রঙ্গালয়ে খেলোয়াড়রাই বা কাহারা ছিল। নানা প্রশ্ন মনে আসিল—স্থানীয় পাঠানদের জিজ্ঞাসা করিয়াও কোন সদুত্তর পাই নাই। সব দেখিয়া মনে হইত এ যেন কোন গ্রীক রঙ্গালয়। কোন গুহার মধ্যে লুক্কায়িত আছে হিংস্র শ্বাপদ, আর অন্য গুহায় মৃত্যুর সাথে লড়াই করার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে ক্রীতদাস গ্ল্যাডিয়েটর।

দিনগুলি বেশ আনন্দেই অতিবাহিত হইতেছিল। কোন কাজকর্ম নাই। কর্তব্য বলিতে কিছুই নাই। শ্রান্ত বৈমানিকদের শ্রান্তি দূর করার জন্য এত দূরে উচ্চ পাহাড়ের মধ্যে ছাউনি করা হইয়াছে। তাহারা আসিবে, দুইদিন আনন্দ-আরামে বিশ্রাম করিবে তারপর 'তাজা' হইয়া আবার কোন রণাঙ্গনে ফিরিবে। তবে আর ঝামেলা কেন? এমন কি শরীর চর্চা, পি, টি, প্যারেড (Physical training) পর্যন্তও নাই।

একদিন সংবাদ আসিল যে বিমান অবতরণপথের উত্তর-পশ্চিম কোণ ধ্বসিয়া মাটির মধ্যে গহ্বর হইয়া গিয়াছে। আমরা কয়েকজন দেখিতে গেলাম। যেন খুবই মজার ব্যাপার দেখিতে চলিয়াছি। গিয়া দেখা গেল যে এক বৃহৎ এলাকা মাটির মধ্যে ধ্বসিয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বেই কোয়েটায় প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল। নিকটস্থ গ্রামের পাঠানরা অনেকেই গহ্বর দেখিতে আসিল এবং ধ্বসিয়া যাওয়া এলাকা দেখার পর তাহাদের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছাপ দেখা গেল। কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় অন্য স্থান হইতে মাটি পাথর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া গহ্বর ভরিয়া ফেলা হইল। কয়েকদিন পরেই আবার দেখা গেল যে মাটি ঐ স্থানে পুনরায় ধ্বসিয়া নিচে প্রবেশ করিয়াছে। দুই তিনবার নূতন মাটি পাথর ফেলার পরও যখন দেখা গেল প্রত্যেক বারই ঐস্থান কেবল ধ্বসিয়া নিচে প্রবেশ করিতেছে তখন ঐ স্থানে মাটি ফেলা বন্ধ করিয়া ঐ এলাকার বিমান ঘাঁটিগুলিতে সংবাদ জানান হইল।

আপনার সঞ্চয়

—তা যত অল্প
বা বেশি হোক না কেন
তার থেকে
আপনার আয়

আরও বাড়িয়ে তুলুন

কয়েকটি
পরিকল্পনা

৭½%
সুদ পেতে হ'লে
৫ বছরের অধিক মেয়াদী
ফিক্সড্
ডিপোজিটে
লগ্নী করুন।

প্রতি মাসে ১০৲
সঞ্চয় ক'রে ৭ বছর
পর ১০৯৫৲
রেকারিং ডিপোজিট
এ্যাকাউন্ট
খুলে পেতে পারেন।

১০০৲ টাকার
ক্যাশ সার্টিফিকেট
কিনলে
২০ বছর পরে
৪২৫৲ টাকা
পাবেন।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা-১৩
টেলিফোন : ২৩-১৭৮৪ (৩ লাইন)

Progressive/UIB-11/70

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

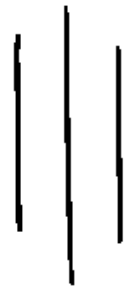

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

34-2665 Gram :

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে
শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স

১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

Planning a new project ?

IT PAYS TO AVAIL OF INDIAN CONSULTANCY SERVICES

What should be the best process for the plant? Will the plant be economically viable? Does the market justify the plant capacity? Is the site selected ideal for the plant? Is the production cost realistic? How and where to obtain the best possible plant and equipment? All this and many other project problems may confront you. Why not leave these to competent Indian Consulting Engineers? Indian Consultants have no interest other than yours. It is they who know the Indian conditions best.

RANGE OF SERVICES

FEASIBILITY AND PROJECT REPORTS ☐ MARKET STUDY AND ECONOMIC INVESTIGATION ☐ SITE SELECTION AND SURVEY ☐ BASIC AND PROCESS ENGINEERING ☐ TENDER EVALUATION AND APPRAISAL ☐ DETAIL DESIGN ENGINEERING ☐ CONSTRUCTION SUPERVISION AND MANAGEMENT ☐ COMPLETE PLANT ERECTION ☐ START-UP AND COMMISSIONING ☐ INITIAL OPERATION ☐ TRAINING OF PERSONNEL ☐ POST-OPERATION CONSULTATION

Indian consultancy helps the nation attain self-sufficiency in technical know-how

*

Issued in the interest of consultancy services by

THE KULJIAN CORPORATION (INDIA) PVT LTD.

24-B, Park Street, Calcutta-16

COMPLETE WORKS
OF
SRI AUROBINDO

Centenary Volumes

De Luxe *1000.00*
Popular *750.00*

SRI AUROBINDO ASHRAM PRESS

PHONE : 47-2869

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্তিকা

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বর্ত্তিকা

(২৪শে এপ্রিল, ১৯৭২)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাবিত্রী	...
আত্রেয় ঋষিদের অগ্নিমন্ত্র	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শয়তানের ডাক	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু
শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা	পবিত্র
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী	
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
পথের কথা	শ্রীমা
কঠিন ডানার ওড়া	বীরবাহু

বার্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: **Nolini Kanta Gupta**
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry—2

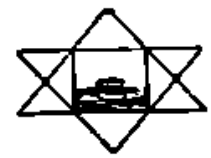

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭২

অদৃশ্য আসেন তিনি আমাদের তামস অঙ্গের মধ্যে,
অন্ধকারের আবডালে কাজ করে চলেন তাঁর,
সূক্ষ্ম সর্ব্বজ্ঞ অতিথি দিশারী তিনি
যতদিন না সকলেই অনুভব করে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন
আর আকূতি।
একটা ঊর্দ্ধ্বতর বিধান মেনে চলা শিখতে হবে প্রত্যেককে,
আমাদের দেহের প্রতি কোষাটি ধারণ করবে
অমরের অগ্নিশিখা।

সাবিত্রী—প্রথম পর্ব্ব, তৃতীয় সর্গ

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব্ব—অষ্টম সর্গ

মিথ্যার জগৎ—অশুভের জননী ও তমিস্রার পুত্রগণ

(৪)

এই নরকরাজ্যে দুঃসাহসে এগিয়ে চলল সে
তার গভীরতম গহ্বরে অন্ধতম কন্দরে অবধি,
তার তমিস্রার প্রতিষ্ঠাকে আলোড়িত করল,
তার প্রাচীন অনন্য অধিকার ও একচ্ছত্র শক্তিকে
দ্বন্দ্বে আহ্বান করল পরম দুঃসাহসে
রাত্রিগর্ভে ডুবে গেল সে রাত্রির করাল হৃদয়কে জানবার জন্য,
নরকের অন্তরে খোঁজে সে নরকের আদিমূল আদিহেতু।
তার আপনার হৃদয়েরই মধ্যে খুলে গেল নরকের
বেদনাপ্লুত গহ্বরসব
শুনল সে পুঞ্জীভূত তার ক্লেশের আর্তকণ্ঠ,
তার অন্তিম নিঃসঙ্গতা, তার ঘন হৃৎস্পন্দ।
ঊর্দ্ধে রাজে হিমশীতল বধির চিরন্তনী।
অন্তিম নিয়তির ভীতিসঙ্কুল অস্ফুট ছায়াপথে
শুনল সে প্রেতকণ্ঠ ডেকে যায়, নিয়ে চলে বলিদান তরে,
অপদেবতার মায়াবী-চক্রচিহ্নের সম্মুখে দাঁড়ায় সে,
পার হয়ে যায় অরাতি-অজগরের অতর্কিত মায়াজাল।
ভীতিকর প্রান্তরে যন্ত্রণাপীড়িত নির্জন প্রসারে
নিঃসঙ্গ সে ঘুরে চলে রিক্ত পথ বেয়ে
লাল নেকড়ে যেখানে ওৎ পেতে রয় ভাঙ্গালতাজা নদীর ধারে,
মৃত্যুর দূত কালো শকুনেরা চিৎকার করে ডেকে যায়
খাড়া পাহাড়চূড়ার দিকে চেয়ে,
দেখে সে বন্যা কুকুরের দল শিকার করে চলে মানুষের হৃৎপিণ্ড,
তাদের ঘোর কণ্ঠরবে ছেয়ে যায় নিয়তির তেপান্তর,
অতনের পদচিহ্নহীন রণক্ষেত্রে
যুদ্ধ করে চলে সে ছায়াকার সংঘর্ষে,

সেই বাক্‌হারা দৃষ্টিহারা গভীর গহনে,
সহ্য করে চলে সে নরকের আক্রমণ, আর দানবের আঘাত,
সহ্য করে চলে অন্তরের দুরারোগ্য নিষ্ঠুর ক্ষত যত।
উদ্যতফণা সম্মোহনী শক্তি বন্দী করে রাখে তারে,
নিখ্যার মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হয়ে চলে সে,
দুঃখের গ্রন্থি কণ্ঠরোধ করে তার কখনও বা,
অথবা নিক্ষিপ্ত সে বুভুক্ষু সংশয়ের নির্মম চোরাবালুগর্ভে
অথবা ভ্রান্তির হতাশার অন্ধকূপে অবরুদ্ধ সে,
পান করে বিষপাত্র শেষবিন্দু অবধি।
এ জগতে আশার আনন্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ,
পাপের নিরঙ্কুশ রাজত্বে অগ্নিপরীক্ষায় পীড়িত সে
তবু কিন্তু অন্তরে অক্ষত রাখে সত্যের দীপ্তি ।
গতিহীন শক্তিহীন সে—
জড়ের এই নাস্তিক শূন্যতায় কয়েদী অন্ধ সে,
গাঁথা রয়েছে আমাদের প্রতিষ্ঠায় তামস তমিস্রার সঙ্গে
তবু করতলে ঢেকে রাখে তার কম্পমান অন্তর-প্রদীপ।
নির্ভয়ে চলে সত্তা তার মানসবিহীন শূন্যের অন্তরে,
বিষেষভরা গহ্বর—নাই যেখানে চিন্তাবৃত্তি, নাই ইন্দ্রিয়বোধ,
চিন্তা রুদ্ধ, ইন্দ্রিয় ব্যর্থ তবু আত্মা তার
দেখে চলে, জেনে চলে।
অসীম যেখানে পরিণত পরমাণুচূর্ণে,
আত্মা যেখানে আপনাকে হারিয়েছে তার মূক আদিপর্বে,
সেখানে অনুভবে জাগে তার জড় বস্তুরাজির সৃষ্টি হ'ল
শুধু এক বিচিত্র ব্যর্থতা
অথবা অচেতনার রিক্ত ছায়াবাঝে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে
সে নেমে যায় অন্ধকার অতল রহস্যে,
বিপুল অর্থহীন গভীরতাগর্ভে,
প্রাণের প্রয়াস সদ্য ফুটে ওঠে যেখানে মৃত্যুকবলিত বিশ্বের মাঝে।
মন সেখানে হারিয়েছে তার একান্ত স্বরূপ,
তবু তার অনুভবে আসে বোধহীন জগতের নিরুদ্ধ বোধ এক,
আর এক বাক্‌হারা জ্ঞান সেই জ্ঞানহারা রাত্রিগর্ভে।
অতলের গোপনে উপনীত হ'ল সে,
অন্ধকার ধূসর রিক্ত মিটি মিটি চেয়ে দেখে সেখানে তার শয্যা থেকে ;

এসে দাঁড়াল সে অবচেতনার অবরুদ্ধ সর্বশেষ তলদেশে
সত্তাপুরুষ যেখানে সুপ্তিমগ্ন, চিন্তা হয় নি সচেতন ;
গড়ে তোলে জগৎকে, জানে না কি সে গড়ে।
অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ রয় সেখানে তার সময়ের অপেক্ষায়,
সেখানে লিখিত রয়েছে বিলুপ্ত তারকারাজির ইতিহাস।
সেখানে বিশ্ব-এষণার সেই সুপ্তিগর্ভে
দেখিল সে প্রকৃতির পরিবর্তনের গুপ্ত রহস্য।
সঙ্গে তার রয়েছে জ্যোতি এক, অদৃশ্য অঙ্গুলি এক
স্পর্শ করে গিয়ে যেখানে ভ্রান্তি, যেখানে বেদনা,
পরিণত করে তারে পরমানন্দের শিহরণে,
মধুর এক গাঢ় আলিঙ্গনের পুলকে।
রাত্রির অন্ধকারে দেখে সে শাশ্বতের ছায়াময় অবগুণ্ঠন,
মৃত্যুকে দেখে যেন জীবনের গূঢ়ে ভূগর্ভ কুঠুরি এক,
ধ্বংস যেন সৃষ্টির ত্বরিত গতিবেগ,
ক্ষতি হ'ল মূল্য যেন স্বর্গীয় লাভের
আর নরক হ'ল স্বর্গের দুয়ারে পৌঁছিবার হ্রস্বতম পথ।
মায়াময় নেপথ্য কারখানায়,
অবচেতনার যাদুমুদ্রালয়ে,
ছিন্নবিচ্ছিন্ন আদিম রজনীর পত্রপৃষ্ঠা যত,
চূর্ণবিচূর্ণ অজ্ঞানের অক্ষরাবলী।
জীবন্ত হয়ে, অন্তরাত্মা হ'তে গভীর নিঃশ্বাস ফেলে,
প্রকৃতি মুছে দেয় তার অনড় অচল যান্ত্রিক সূত্রমালা,
মুছে দেয় বদ্ধ অন্তরাত্মার আদান প্রদান বিধি যত,
সত্যকে ফিরিয়ে দেয় মিথ্যা তার ক্লিষ্ট কুটিল আকার,
খণ্ডিত হয়ে যায় বেদনার অনুশাসন যত,
স্থান তাদের গ্রহণ করে জ্যোতির্ময় বর্ণমালা,
সুনিপুণ শিল্পীর অদৃশ্য হস্ত লিখে যায়
ক্ষিপ্রবেগে জ্ঞানদৃষ্টির সুষম হস্তলিপি :
পার্থিব রূপাবলী হয়ে ওঠে তার দিব্য শাস্ত্রমালা,
জ্ঞানে রূপগ্রহণ করে মন যাকে ব্যক্ত করে না,
অচেতনা দূর হয়ে যায় জগতের শূন্যকণ্ঠ অন্তর হতে,
রূপান্তর লভে বিচারবুদ্ধির জমাট পরিকল্পনা যত।
জড়বস্তুর মধ্যে জাগাল সে চেতনা,

তামস অণুকণা আর মূক পিণ্ডের উপর এঁকে দিল সে
চিরন্তনীর হীরকবর্ণমালা,
অধঃপতিত বস্তুরাজির অস্ফুট হৃদয়ের উপরে লিখে দিল
অবাধ অনন্তের বিজয়-বৈজয়ন্তী,
আর সেই মহানাম, পাশ্বতের প্রতিষ্ঠা :
লিখে দিল জাগ্রত হর্ষোচ্ছল দেহকোষাবলীর উপর
অনির্ব্বচনীয়ের আন্তর অক্ষরমালা দিয়ে
সেই প্রেমগীতি, কালের ধারায় নিত্য অপেক্ষার রয় যে,
আর সেই রহস্যাপ্লুত আনন্দময় পর্ব্বের,
আর উত্তর-চেতন বহ্নির মহাবাণী।
প্রাণ স্পন্দিত তখন তার বিশুদ্ধ সত্তায় এই দেহের আধারে :
অধঃস্তরের দ্যুতি নিভে যায়, হানে না মৃত্যু আর।
নরকের বিপুল সম্মুখ গোপুর ভেঙে পড়ে,
যাদু-প্রাসাদ হয়ে যায় ধূলিসাৎ—
রাত্রি শীর্ণ হ'ল, মিশে গেল স্বপ্নছায়া যেন।
সত্তার গহ্বরে খুঁড়ে তোলা হয়েছিল যেখানে রিক্ত আকাশ,
আপনাকে দিয়ে ভরে দিয়েছিল অন্তর্হিত দেবতার স্থান
সেখানে প্লাবন নামে অন্তরঙ্গ আনন্দময় উষার ধারার,
নিরাময় হয়ে যায় যা কিছু কালের ছিন্ন হৃদয় গড়ে তুলেছিল,
দুঃখ জীয়ে না আর প্রকৃতির বক্ষে,
বিভেদ হ'ল শেষ, ভগবান সেখানে এখন
অন্তরাত্মা জেলে দিল সচেতন দেহকে তার কিরণ দিয়ে,
জড় যার আত্মা মিলে গেল, মিশে গেল, অভিন্ন এখন তারা।

আত্রেয় ঋষিদের অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৫ম মণ্ডল—ষষ্ঠ সূক্ত

অগ্নিং তং মন্যে যো বসুরস্তং যং যন্তি ধেনবঃ।
অস্তমর্বন্ত আশবোঽস্তং নিত্যাসো বাজিন ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥

অগ্নিম্—অগ্নিকে তম্—সেই
মন্যে—মনন করি, ধ্যান করি
যঃ—যে
বসুঃ—সম্বন্ত, জ্যোতির্ময়
অস্তম্—নিবাসে, গৃহে
যন্তি—যায়
ধেনবঃ—গাভীরা
অস্তম্—নিবাসে, গৃহে
আশবঃ—ক্ষিপ্র, বেগবান
অস্তম্—নিবাসে, গৃহে
নিত্যাসঃ—নিত্য, শাশ্বত
বাজিনঃ—অশ্বেরা
স্তোতৃভ্যঃ—স্তোতাদের কাছে
আ ভর—নিয়ে এস
অর্বন্তঃ—যুদ্ধাশ্ব
ইষম্—প্রেরণাকে

অগ্নির ধ্যান করি আমি, জ্যোতির্ময় নিবাসী তিনি সকলের অন্তরে, নিবাস তিনি যেখানে যায় গো-যূথেরা, নিবাস তিনি ধাবমান অশ্বদের, নিবাস তিনি চিরন্তন তুরঙ্গদের।

তোমার প্রবেগ নিয়ে এস তোমার স্তোতাদের অন্তরে ॥১॥

সো অগ্নির্যো বসুর্গৃণে সং যমায়ন্তি ধেনবঃ।
সমর্বন্তো রঘুদ্রুবঃ সং সুজাতাসঃ সূরয় ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥

সঃ—সেই
অগ্নিঃ—অগ্নি
যঃ—যে
বসুঃ—সম্বন্ত, জ্যোতির্ময়
গৃণে—স্তুতি করি
যম্—যাতে
সম্+আয়ন্তি—সম্মিলিত হয়
ধেনবঃ—ধেনুরা
সম্—(সম্ আয়ন্তি) সম্মিলিত হয়
অর্বন্তঃ—যুদ্ধাশ্বেরা
রঘুদ্রুবঃ—দ্রুতগামী
সম্—সম্মিলিত হয়
সুজাতাসঃ—সুষ্ঠু বা সিদ্ধ জন্ম যাদের
সূরয়ঃ—দিব্যদ্রষ্টারা
স্তোতৃভ্যঃ—স্তোতাদের কাছে
আ ভর—নিয়ে এস
ইষম্—প্রেরণাকে

এই সে অগ্নি সকলের অন্তরে নিবাসী যে, স্তুতি করি তার যার সঙ্গে গিয়ে সম্মিলিত হয় ধেনুরা, সম্মিলিত হয় দ্রুতগামী যুদ্ধাশ্বেরা, সম্মিলিত হয় সেই সব সূরিবৃন্দ যারা লাভ করেছে সিদ্ধ জন্ম।

তোমার প্রবেগ নিয়ে এস তোমার স্তোতাদের অন্তরে ॥২॥

অগ্নিহি বাজিনং বিশে দদাতি বিশ্বচর্ষণিঃ।
অগ্নী রায়ে স্বাভুবং স প্রীতো যাতি বার্য্যমিষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥

অগ্নিঃ—অগ্নি
হি—ফলতঃ, বস্তুতঃ
বাজিনম্—পূর্ণতারূপী অন্নকে
বিশে—বিশ্বজনের, মানুষের জন্য
দদাতি—দেয়
বিশ্বচর্ষণি—বিশ্বকর্ম্মকৃৎ

অগ্নিঃ—অগ্নি
রায়ে—আনন্দসম্পদের জন্য
সু-আভুবম্—যা সুষ্ঠুভাবে সম্যকভাবে
গড়ে উঠেছে আমাদের মধ্যে
সঃ—সে প্রীতঃ—প্রীত, সন্তুষ্ট হয়ে
যাতি—যায় বার্য্যম্—বরণীয়ের দিকে
ইষম্—প্রেরণাকে
স্তোতৃভ্যঃ - স্তোতাদের কাছে
আ ভর—নিয়ে এস

অগ্নি বিশ্বমানুষকে প্রদান করেন অন্নরূপী পরিপূর্ণতা, তিনিই বিশ্বকর্ম্মকৃৎ তিনিই প্রদান করেন পরম আনন্দের জন্য আমাদের স্বয়ংসম্ভূত সত্তা, প্রীত তিনি চলেছেন বরণীয় বস্তুর অভিমুখে। তোমার প্রবেগ নিয়ে এস তোমার স্তোতাদের অন্তরে॥৩॥

আ তে অগ্ন ইধীমহি দ্যুমন্তং দেবাজরম্।
যদ্ধ স্যা তে পনীয়সী সমিদ্দীদয়তি দ্যবীষং স্তোতৃভ্য আ ভর॥

আ (ইধীমহি)—চারিদিক ঘিরে
(প্রজ্বলিত করি)
তে—তোমার
অগ্নে—হে অগ্নি
(আ) ইধীমহি—(চারিদিক ঘিরে)
সমিদ্ধ করি, প্রজ্বলিত করি
দ্যুমন্তং—জ্যোতির্ম্ময়
দেব—হে দেবতা
অজরম্—জরাহীন

যৎ—যখন
হ—নিশ্চয় করে, ফলতঃ
স্যা—সেই তে—তোমার
পনীয়সী—পটীয়সী, আরও কর্ম্মক্ষম
সমিৎ-ইৎ—প্রভা, দীপ্তি
দীদয়তি—প্রোজ্জ্বল হয়
দাবি—দ্যুলোকে ইষম্—প্রেরণাকে
স্তোতৃভ্যঃ—স্তোতাদের কাছে
আ ভর—নিয়ে এস

হে অগ্নি, তোমার সেই শিখা দ্যুতিমান যে, জরাহীন যে, তাকে আমরা, হে দেবতা, সমিদ্ধ করি যখন তোমার সেই কৃতিমান্ সমিধ দ্যুলোকে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।
তোমার প্রবেগ নিয়ে এস স্তোতাদের অন্তরে ॥৪॥

আ তে অগ্ন ঋচা হবিঃ শুক্রস্য শোচিষস্পতে।
সুশ্চন্দ্র দস্ম বিশ্পতে হব্যবাট্ তুভ্যং হূয়ত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥

আ
তে—তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি
ঋচা—জ্যোতির্ময় বাক্ দিয়ে
হবিঃ—নৈবেদ্য
শুক্রস্য—শুভ্র
শোচিষঃ—জ্যোতির, দীপ্তির
পতে—অধিপতি
সু-চন্দ্র—হে পূর্ণ আনন্দশ্রী
দস্ম—হে কর্মকৃৎ
বিশ্পতে—হে বিশ্বপতি, হে জনপালক
হব্যবাট্—হে হব্যবাহক
তুভ্যম্—তোমার জন্য
হূয়তে—আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়
ইষম্—প্রেরণাকে
স্তোতৃভ্যঃ—স্তোতাদের কাছে
আ ভর—নিয়ে এস

হে অগ্নি, জ্ঞানময় বাক্ দিয়ে জ্যোতির্ময় তোমাকেই আহুতি অর্পণ করা হয়; হে পূর্ণ আনন্দশ্রী, কর্মকৃৎ তুমি, জনাধিপতি, আহুতিবাহক।
তোমার প্রবেগ নিয়ে এস স্তোতাদের অন্তরে ॥৫॥

প্রো ত্যে অগ্নয়োঽগ্নিষু বিশ্বং পুষ্যন্তি বার্যম্।
তে হিন্বিরে ত ইন্বিরে ত ইষণ্যন্ত্যানুষগিষং স্তোতৃভ্য আ ভর ॥

প্রো (+পুষ্যন্তি)—সম্মুখে (পোষণ করে)
ত্যে—তোমার
অগ্নয়ঃ—অগ্নিরা
অগ্নিষু—অগ্নিদের মধ্যে
বিশ্বম্—বাবতীয়
(প্রো) পুষ্যন্তি—(সম্মুখে) পোষণ করে
বার্যম্—বরণীয় যে বস্তু
তে—তারা
হিন্বিরে—ছুটে চলে
তে—তারা
ইন্বিরে—ধেয়ে চলে
তে—তারা
ইষণ্যন্তি—সবেগে এগিয়ে চলে
আনুষক্—নিরন্তর
ইষম্—প্রেরণাকে
স্তোতৃভ্য—স্তোতাদের কাছে
আ ভর—নিয়ে এস।

এই ত' সেইসব অগ্নি যারা অগ্নিসকলের মধ্যে সকল বরণীয় বস্তু পরিপুষ্ট করে, তারা ছুটে চলে, ধেয়ে চলে, সবেগে এগিয়ে চলে নিরন্তর।
তোমার প্রবেগ নিয়ে এস স্তোতাদের অন্তরে ॥৬॥

তব তো অগ্নে অর্চয়ো মহি ব্রাধন্ত বাজিনঃ।
যে পত্মভিঃ পক্ষানাং ব্রজা ভুরন্ত গোনামিষং স্তোতৃভ্যা আ ভর ॥

তব—তোমার
তো—সেই
অগ্নে—হে অগ্নি
অর্চয়ঃ—অনন্ত শিখাসব
মহি—বিশাল হয়ে
ব্রাধন্ত—বৃদ্ধিলাভ করে
বাজিনঃ—অশ্বসকল যেন
যে—যারা
পত্মভিঃ—পতনাঘাতে
পক্ষানাম্—ক্ষুরসকলের
ব্রজা—গোশালা, আবাস, নিবাস
ভুরন্ত—কামনা করে চলে
গোনাম্—গাভীদের ইষম্—প্রেরণাকে
স্তোতৃভ্যঃ—স্তোতাদের কাছে
আ ভর—নিয়ে এস।

হে অগ্নি, এই ত' তোমার সেই দীপ্ত শিখাসব, পরিপূর্ণতা সব অশ্বরাজির মত বিপুল পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে—তারা তাদের ক্ষুরাঘাতে পৌঁছে গিয়ে ধেনুদের গৃহে।
তোমার প্রবেগ নিয়ে এস স্তোতাদের অন্তরে ॥৭॥

নবা নো অগ্ন আ ভর স্তোতৃভ্যঃ সুক্ষিতীরিষঃ।
তে স্যাম য আনৃচুস্ত্বাদূতাসো দমেদম ইষং স্তোতৃভ্যা আ ভর ॥

নবাঃ—নূতন
নঃ—আমাদের কাছে
অগ্নে—হে অগ্নি
আ ভর—নিয়ে এস
স্তোতৃভ্যঃ—স্তোতাদের কাছে
সুক্ষিতীঃ—সুপ্রতিষ্ঠিত, সুধামস্থ
ইষঃ—প্রেরণাদের
তে—তারা
স্যাম—হই যেন আমরা যে—যারা
আনৃচুঃ—স্তুতি করেছে
ত্বা-দূতাসঃ—তুমি যাদের দূত
দমে দমে—প্রতিগৃহে ইষম্—প্রেরণাকে
স্তোতৃভ্যঃ—স্তোতাদের কাছে
আ ভর—নিয়ে এস

হে অগ্নি, স্তোতা আমরা, আমাদের কাছে সেইসব নবীন প্রেরণা নিয়ে এস, পেয়েছে যারা আপনাদের সুপ্রতিষ্ঠা, আমরা যেন হয়ে উঠি যাদের দূত হবে তুমি যারা গৃহ হতে গৃহে জ্যোতির্ময় স্তুতি গেয়ে চলবে।
তোমার প্রবেগ নিয়ে এস স্তোতাদের অন্তরে ॥৮॥

উভে সুশ্চন্দ্র সর্পিষো দর্বী শ্রীণীষ আসনি।
উতো ন উৎ পুপূর্যা উক্থেষু শবসস্পত ইষং স্তোতৃভ্য আ ভর ।।

উভে—উভয় দুটি
সু-চন্দ্র—হে পরিপূর্ণ আনন্দশ্রী
সর্পিষঃ—ঘৃতযুক্ত, তেজপ্রবাহপূর্ণ
দর্বী—হাতা দুটি
শ্রীণীষে—তুমি ঘুরিয়ে ধর
আসনি—তোমার মুখে
উতো—তারপর
নঃ—আমাদের উৎ—উর্দ্ধে নিয়ে
পুপূর্যাঃ—পূর্ণ কর
উক্থেষু—বাক্‌প্রকাশে, যজ্ঞের মধ্যে
শবসঃ পতে—হে শক্তির অধিষ্ঠাতৃ
ইষম্—প্রেরণাকে
স্তোতৃভ্যঃ স্তোতাদের কাছে
আ ভর—নিয়ে এস

হে পূর্ণ আনন্দশ্রী, স্বচ্ছধারাবর্ষী উভয় পাত্রই তুমি তোমার মুখের কাছে ঘুরিয়ে ধরেছ, তাই তুমি আমাদের উর্দ্ধে নিয়ে সত্যবাক্ দিয়ে ভরে দাও।
তোমার প্রবেগ নিয়ে এস স্তোতাদের অন্তরে ।।৯।।

এবা অগ্নিমজুর্যমুর্গীর্ভির্যজ্ঞেভিরানুষক্।
দধদস্মে সুবীর্যমুত ত্যদাশুশ্যামিষং স্তোতৃভ্য আ ভর ।।

এব—এই রকমে
অগ্নিম্—অগ্নিকে
অজুর্যমুঃ—অজুঃ—চালিয়ে নেয়
যমুঃ—সুসংযত করে
গীর্ভিঃ—বাক্যের দ্বারা
যজ্ঞেভিঃ—যজ্ঞের দ্বারা
আনুষক—নিরন্তর অবিচ্ছিন্নভাবে
দধৎ—সে স্থাপন করে যেন
অস্মে—আমাদের মধ্যে
সুবীর্যম্—পূর্ণ বীর্যবত্তর
উত—আর তাৎ—সেই
আশু অশ্যাম্—ক্ষিপ্রগামী অশ্বশক্তিকে
ইষম্—প্রেরণাকে
স্তোতৃভ্যঃ—স্তোতাদের কাছে
আ ভর—নিয়ে এস

এই রকমেই তারা অগ্নিকে প্রচালিত করেছে, সংযত করে রেখেছে নিরন্তর তাদের সত্যবাক্ দিয়ে তাদের যজ্ঞ দিয়ে। সে যেন আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ণ বীরত্ব আর সেই ক্ষিপ্র প্রাণশক্তি।
তোমাদের প্রবেগ নিয়ে এস স্তোতাদের অন্তরে

শয়তানের ডাক

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ডা: ফষ্টের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁকে নিয়ে নাটকও অনেকে দেখে থাকবে এখানে। ডা: ফষ্ট বিশ্ববিশ্রুত নাম এবং সর্বদেশেই বিদ্বজ্জন-পরিচিত। তাঁর সম্বন্ধে কিম্বদন্তী প্রচলিত প্রাচীনকাল থেকে জর্মনদেশে এবং সেখানে লোকমুখে বিস্তারিত ও প্রচারিত। তাঁকে নিয়ে দুখানি বিখ্যাত নাটক রচিত হয়েছে এক, ইংরেজীতে (নাট্যকার মার্লো কর্তৃক) আর দুই, জর্মনভাষায় (কবি ও মনীষী গ্যেটে কর্তৃক)। নামেই পরিচয়, ডা: ফষ্ট ছিলেন একজন মহাপণ্ডিত, সর্ববিদ্যাবিশারদ। তাঁর জ্ঞানস্পৃহার অবধি ছিল না, এ ছিল তাঁর একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষা। অপরিমেয় তাঁর কৌতূহলের সীমানা, সকল রকম তত্ত্ব, রহস্য, কূট সমস্যা উদ্‌ঘাটনের জন্য তাঁর ছিল অদম্য প্রেরণা। শুধু স্থূল জগতে নয়, বৈজ্ঞানিক তথ্য নয়, তিনি চলে গিয়েছিলেন ভৌতিক জগৎ ছাড়িয়ে ভূতুড়ে জগতের মধ্যে পর্যন্ত—লোকান্তরে সূক্ষ্মলোকে। সেখানকার কলকবজাও তিনি আয়ত্ত করতে চেয়েছিলেন, শুধু বুদ্ধিগত জ্ঞান নয়, তিনি চেয়েছিলেন বস্তুজগতের উপর স্বেচ্ছা-কর্তৃত্ব, সূক্ষ্মশক্তির উপর যথেচ্ছ অধিকার। আমরা যে বলি অষ্টসিদ্ধির কথা, তাঁর চেষ্টা ছিল সেই সব সিদ্ধি অর্জন এবং তাতেও তিনি অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন।

সাফল্যলাভ করেছিলেন কারণ তাঁর সুযোগ হয়েছিল (তাঁর দুর্যোগ হয়েছিল পরিণামে পরে আমরা দেখব) এক অসম্ভব সহায় পেয়ে—তাঁর হয়েছিল অপরূপ গুরুলাভ। সে গুরু স্বয়ং শয়তান। শয়তান হ'ল সেই অপশক্তি যা মানুষের ক্ষুধাকে দুরাকাঙ্ক্ষাকে আশ্রয় করে, নিয়ে যেতে চায় বিপথে, নরকের অভিমুখে। মানুষ হ'ল দেবত্বের পথযাত্রী, তার অন্তরের জীবনধারা চলেছে স্বর্লোকের পরমজ্যোতির মধ্যে, আনন্দের মধ্যে পৌঁছিতে। এই তার অন্তরতম ক্ষুধা বা আস্পৃহা কিন্তু এই প্রেরণাকে টেনে রাখে নীচের দিকে পার্থিব আকর্ষণ সব। এই পার্থিব আকর্ষণ মূর্ত হয়েছে যে অপশক্তির মধ্যে তাই হ'ল শয়তান। মানুষ যেখানে এবং যখনই উঠে চলতে চেয়েছে আলোর দিকে, বিশুদ্ধ আনন্দের দিকে, সেখানেই তখন এসে দাঁড়িয়েছে সেই অপশক্তি; প্রলুব্ধ করেছে মানুষকে—মানুষ যা চায়, তার সব আকাঙ্ক্ষা এবং আরও বেশি কিছু দিতে পারে সেই অপরূপ অপশক্তি—এমন প্রতিশ্রুতি দেয় সে। শুধু জ্ঞান নয়, শুধু শক্তি নয়, সে দিতে পারে আনন্দের পরাকাষ্ঠা, বিলাস রভস নিবিড় পরম ভোগ।

ভোগের পার্থিব আনন্দের পূর্ণ প্রতিমা হিসাবে ডা: ফষ্টকে দেখান হ'ল সেই অতুলনীয় রমণী, মানুষী হয়েও যিনি ছিলেন "সৌম্যা সৌম্যতরা

অপেষসৌন্দর্যোদ্ভাস্ত অতিসুন্দরী''—দর্শনমাত্র মোহিত সম্মোহিত বুদ্ধ কই বলে উঠলেন (কবির ভাষায়)

Is this the face that launched the thousand ships,
And burnt the topless towers of Ilion ?

ঊর্দ্ধমুখী মানুষের পদস্খলনের জন্য যথার্থভাবে অপশক্তি নিয়ে আসে এই সব প্রলোভন—যীশুখ্রীষ্টের সম্মুখেও এসেছিল এই অগ্নিপরীক্ষা—শয়তান এসে তাঁকে দেখাল সম্মুখে প্রসারিত করে বিশ্বের ভোগ ঐশ্বর্য্য সবই তাঁর করতলে, শুধু তাঁকে পরিত্যাগ করতে হবে অবশ্য ভগবানকে, আর নিজের অন্তরাত্মাকে। খ্রীষ্ট কিন্তু প্রলুব্ধ হলেন না, মান রাখলেন তাঁর অন্তরাত্মার সত্যের, বলে উঠলেন তাঁর সেই বিখ্যাত কথা দুটি Apage Satana, হঠে যাও শয়তান। আমাদের উপনিষদে বালক নচিকেতার কাহিনীও জানি আমরা, সেখানে কোন অপশক্তি নয়, স্বয়ং যমরাজ যিনি হ'লেন মৃত্যুর অধিকর্ত্তা অর্থাৎ অমৃতত্বের দেবতা, বালকের নিষ্ঠা এবং সত্য আকূতি পরীক্ষা করবার জন্যই তার কাছে প্রস্তাব করলেন যে তিনি তাকে দিতে পারেন—

ইমা রামাঃ সরথাঃ সতূর্য্যা ন হীদৃশা লম্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ

—এই সব রমণীয়া রমণী, এইসব রথরাজি, এই সব তূরী-ভেরী—মানুষে সহজে যা লাভ করে না—কিন্তু বালকের মন ভুলবার নয়, সেও বলে উঠল

নহি বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো

—বিত্তে কখনও মানুষ তৃপ্ত হয় না ; হে যমরাজ, তোমার এই সব যানবাহন নৃত্যগীত তোমারই থাক। অনুরূপভাবে তথাগতের অভিজ্ঞতাও সুপরিচিত ; তাঁর কাছে অপশক্তি স্বয়ং এসেছিল, তার নাম মার, যার অর্থ মৃত্যু নিয়ে আসে যে। নানারূপে এসেছিল প্রলোভন নিয়ে, ভীতি নিয়ে, তোষামোদ নিয়ে কিন্তু বুদ্ধের স্থিরতা বিচলিত করতে পারেনি।

আমরা জানি অতি প্রাচীন কালেও বৈদিকযুগে ঋষিদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল যেসব কুশক্তিদের সঙ্গে তাদের নাম তাঁরা দিয়েছিলেন দস্যু-দানব-তস্কর, তাদের কাজই ছিল ঋষি-দের সম্পদ অন্তরের চৈতন্য, জ্যোতি অপহরণ করা , ঋষিদের যজ্ঞ ছিল একটা ঊর্দ্ধায়ন, চেতনার অগ্রগতি, সত্তার ক্রমস্ফুরণ, তাই হ'ল অগ্নির প্রজ্বলন্ত শিখা। দৈত্যদানবদের চেষ্টা ছিল এই অগ্নি নির্ব্বাপিত করা, যজ্ঞকে ঘিরে তার অনুষ্ঠান ব্যাহত করা পরিণামে অবশ্য দৈত্য-দানবের পরাজয় এবং দেবতাদের জয়, এই হ'ল যজ্ঞসিদ্ধি, মানুষের দেবত্বলাভ।

সৃষ্টির মধ্যে মানুষ নিয়ে এসেছে একটা অপরূপ জিনিষ, একটা আন্তর চেতনা এবং প্রবেগ যা সৃষ্টিকে নিয়ে চলেছে তার প্রোজ্জ্বল পরমসার্থকতার দিকে। তবে বিশ্বে একদিকে রয়েছে যেমন এই ঊর্দ্ধাশী জ্যোতির্ম্ময় প্রবেগ, ঠিক অন্যদিকে তেমনি রয়েছে একটা বিপরীত প্রবেগ, অন্ধকারের অজ্ঞানের আকর্ষণ। মানুষের আধারই হ'ল এই দুই বিরোধী শক্তির রণক্ষেত্র। কে যাবে স্বর্গে, কে যাবে নরকে, কে হারাবে আত্মাকে, কে জয় করবে আত্মাকে, এই হ'ল বিশ্বসমস্যা।

পৌরাণিক কাহিনীতে আমরা শুনেছি রাক্ষসদের দৌরাত্ম্য, ঋষিদের যাগযজ্ঞে বিঘ্ন ঘটানই ছিল তাদের ব্রত।

ঋষিদের যজ্ঞের, তপস্যার, তাদের সাধনার ব্যাঘাত করা ছাড়াও রাক্ষসদের আর একটি বিচিত্র প্রলোভন ছিল, রাক্ষসদের আর এক নাম নরখাদক। নরমাংস তাদের অতি প্রিয় আহার্য্য ছিল। তাদের মুখে এ বস্তু ছিল একান্ত সুস্বাদু সুমিষ্ট—পরম উপাদেয়। নরদেহ এত মধুর কেন? আমরা একটা নিগূঢ় কারণ বলে দিতে পারি। মানুষের দেহকে মধুর করে তুলেছে তার অন্তরাত্মা, তার অন্তশ্চেতনা, যে বস্তুর একমাত্র অধিকারী মানুষই। অন্তরাত্মার স্নিগ্ধ স্পর্শ চারিয়ে গিয়েছে মানুষের দেহকোষে—জ্ঞাতসারে অবশ্য মানুষ জানে না তার এই গোপন সম্পদ—কস্তুরীমৃগ জানে না তার আপন নাভিস্থ সৌরভের রহস্য। কিন্তু রাক্ষসেরা তাদের ঘ্রাণে পেয়েছে এই সৌরভের হাওয়া—বাল্যকাল হতে আমরা ত শুনেছি রাক্ষসের মুখে এই মন্ত্র "হাঁউ মাঁউ খাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ", শুধু মানুষের নয়, মানুষের মধ্যে আবার ঋষিমাংসই রাক্ষসদের বিশেষ প্রিয়। ঋষি তাঁরাই যাঁদের মধ্যে অন্তরাত্মার মাধুর্য্য অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

এককালে মানুষের আদিযুগে পরিণতির প্রথম অবস্থায় প্রচলিত ছিল নরবলিপ্রথা। পশুযাগের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর বিবেচিত হ'ত নরমেধ। একযুগে ধর্ম্মসাধনার একটা নিগূঢ় অঙ্গ ছিল এই নরমেধ। যারা এই সাধনায় চলত, আধ্যাত্মিক সার্থকতা বা সিদ্ধির জন্য যারা এই পথ অবলম্বন করত তাদের বলা হ'ত কাপালিক। আমরা স্মরণ করতে পারি এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় এর রোমহর্ষক চিত্র।

নরমেধ যাহাতঃ যে কারণে বা যে ভাবে অনুষ্ঠিত হোক না, আসলে তা একটা রূপক-মাত্র। পশুবলি যেমন প্রতীক হ'ল পাশব স্বভাবকে বলিদান দেবতার কাছে, ভগবানের কাছে স্থূল দেহগত প্রকৃতিকে একান্ত উৎসর্গ করা, তেমনি নরবলিও হ'ল মানুষী ভাবকে, সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টিবস্তু তাকেই সমর্পণ করা নৈবেদ্য হিসাবে ভগবানের কাছে। মানুষী অহংকারের মূর্ত্ত প্রতীক এই নরদেহকে উৎসর্গ করে দেওয়া পরাৎপরের কাছে।

কার্য্যতঃ তবে এভাবে স্থূলদেহের বলিদানের কোন প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন স্থূল আধারে অশুদ্ধি-বর্জ্জন এবং আমূল পরিবার্জ্জন, শয়তানের গ্রাস হতে মুক্তি। বলা হয়ে থাকে দেহ হ'ল শ্রীদেহ, ভগবানের মন্দির, তাঁর পীঠস্থান। তাকে নির্ম্মল উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় করে রাখতে হবে ভাগবতসান্নিধ্য দিয়ে পূর্ণ রাখতে হবে—অপশক্তির ছায়া কালিমা যেন সেখানে না পড়ে—দেহের সার্থকতা ভগবানকে মূর্ত্ত করে ধরা পার্থিব আয়তনে।

শয়তান, অপশক্তি বাইরের কোন সত্তা নয়, মানুষ নিজেই হ'ল দ্বিধা-বিভক্ত সত্তা, দিব্যের ও দানবের সম্মিলিত তন্ত্রী সে। তার জীবনের সমস্ত সাধনাই হ'ল এই দুটিকে পৃথক করে ছাড়িয়ে নেওয়া—যে মুহূর্ত্তে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে সেই মুহূর্ত্তেই দেখা যাবে

অন্ধশক্তি আর নেই, সবই দিব্যশক্তি। যে সব প্রলোভন, যে সব কুমন্ত্রণা শরীরী হয়ে দেখা দেয় আমাদের সম্মুখে ভীষণ মূর্তি নিয়ে অথবা রমণীয় রূপ নিয়ে তারা আমাদের অন্তরেরই দুর্বলতা, প্রক্ষিপ্ত ছায়া। প্রতি পদে, প্রতি মুহূর্তে সেই দৃষ্টি আমাদের লাভ করতে হবে যা দেখিয়ে দেয় বস্তুর স্বরূপ, সেই শক্তি অর্জন করতে হবে যা আমাদের সমর্থ করে তমসাকে দূরে সরিয়ে দিতে, জ্যোতিকে সাদরে বরণ করতে :

উদীধ্বং জীবো অসুর্ণ আগাদপ
প্রাগাত্তম যা জ্যোতিরেতি

(ঊষা স্তোত্র)

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা কর

(২৭)

আত্মা বা পুরুষকে স্বারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে জ্ঞানযোগের সাধনায় প্রথম করণীয় হল দেহ-প্রাণ-মনের অধীনতা মুক্ত হয়ে তার বিবিক্ত স্বরূপের জ্ঞান লাভ করা। দেহের সঙ্গে আত্মা এমন ভাবে জড়িয়ে আছে যে দেহের অধীনতা থেকে তাকে মুক্ত করা প্রথমেই প্রয়োজন, নাহলে আত্মজ্ঞান আসবে কি করে? প্রাচীনেরা এর যে পথ আবিষ্কার করেছেন, সেই জ্ঞানপথের সঙ্গে আমরা কতকটা পরিচিত আছি। জ্ঞানপথে দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি অহঙ্কার সব কিছু নস্যাৎ করে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। কর্মযোগের পূর্ণতা প্রসঙ্গে আমরা এই 'নেতি' সাধনার প্রয়োজন ও উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করে দেখেছি যে, এভাবে পুরুষকে প্রকৃতির গুণকর্ম থেকে আলাদা করে না দেখতে শিখলে আমরা অপরা প্রকৃতির বশীভূত অবশ পুরুষকেই আত্মা বলে ভুল করে বসব। জ্ঞানযোগের সাধনায় নতুন পথ ধরে চলতে শিখেছি বলে আমরা প্রাচীন সব ভাবনা বর্জন করব, এমন কথা কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেন না। কেননা আমাদের লক্ষ্য পূর্ণযোগ, তার অনুকূলে প্রাচীনের আবিষ্কৃত সত্যকে গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু গ্রহণ করতে হবে নিজের প্রয়োজন বুঝে—সময় ও সাধনার উপযোগী করে। এ বিষয়ে রামকৃষ্ণদেবের কথাটাই প্রযোজ্য, "যার পেটে যা সয়"। দেহপ্রাণমন নিয়ে আমাদের সংসার, আমাদের কারবার। ওদিকে আমাদের দেশে এমন একটা মত দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হয়ে লোকের মনে গেঁথে বসেছিল যে, পরম সত্য অধিগত করতে হলে এ জীবনকে একেবারেই পরিহার করতে হয়। কেননা দেহপ্রাণমন নিয়েই চলতে হবে, ভ্রান্তি তার চিরসহচারিণী, পূর্ণজ্ঞান তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের যোগ-সাধনার বৈশিষ্ট্য ও নবআবিষ্কার হল, এই দেহপ্রাণমনকেই দিব্য করা। জীবনকে পরিত্যাগ করা নয়, দিব্যজীবন লাভ করাই আমাদের লক্ষ্য।

বিদেহমুক্তির যে আদর্শ আমাদের দেশে ছিল, তাতে তাঁরা এই মতই দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন যে দেহ থাকতে মুক্তি মেলে না, পরম জ্ঞান লাভ হয় না। তাই বহুল প্রচলিত পথ ছিল, পরম সত্য অধিগত করতে হলে বাহিরের এ জীবন থেকে একেবারেই ছুটি নিতে হবে। কিন্তু সকলে এ মত ও পথ গ্রহণ করেন নি। তাই সত্যসন্ধানের পথে জীবন্মুক্তি মেনে চলেছেন, এমন সব মহাত্মারা এ দেশে ছিলেন, এখনও আছেন। গীতা জীবন্মুক্তির আদর্শকেই শ্রেষ্ঠ বলে উপদেশ দিয়েছেন ও আমাদের সকলের জন্য সেই আদর্শ তুলে ধরেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে জ্ঞানভক্তিকর্মের সমন্বয় করে দেখিয়েছেন, তার প্রয়োগ এই জীবনেই। এই কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রেই জীবনের ধর্মযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হবে। শ্রীঅরবিন্দ

আগাগোড়া এই মত দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করে চলেছেন। তাই ঐ দুই মতে যে একটা বিরোধ ও সাধনার তারতম্য ছিল, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগ-সাধনায় তাকে সমন্বিত করেছেন, গ্রহণ ও পরিবর্জন এই দুটি করণ দিয়ে। জীবনকে শ্রীময় শান্তিময় সুন্দর করে তুলতে হবে, সত্য শিবকে সুন্দর হয়ে ফুটতে দিতে হবে। এবং তা করতে যে বাধাবিরোধ দেখা দেবে, তার সমাধান করতে জঞ্জাল বর্জন করতে হবে, জীবনকে বর্জন করতে হবে না। জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করতে হবে, তা পরম দেবতারই বিজয়।

জীবনের কর্মক্ষেত্র থেকে সরে যাওয়া বা শেষ পর্যন্ত তাকে বর্জন করাটা সাংখ্য-সম্মত সাধনা থেকেই এসেছিল। প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক সেখানে বড় কথা এবং সেটা প্রথম অবস্থায় অবশ্য-করণীয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু গীতায় প্রকৃতির তিন রকম অবস্থাও দেখানো হয়েছে। প্রথমে অষ্টধা অপরা প্রকৃতি যাকে নিয়ে আমাদের ব্যবহার চলে; তা থেকে পুরুষকে মুক্ত না করলে পুরুষ তাকেই স্বীয়া প্রকৃতি বলে ভুল করে তার বশীভূত হয়ে নিজের কর্তৃত্ব ভুলে থাকেন। এই অষ্টধা প্রকৃতিকে ধরে আছেন পরা প্রকৃতি, তিনিই জীবভূতা সনাতনী এবং "যয়েদং ধার্যতে জগৎ"। তিনিই জীব হয়েছেন, জীব তাঁরই সনাতন অংশ—eternal ray of Divine Light। শ্রীঅরবিন্দ এই জীবকে বলছেন চৈত্যপুরুষ। পুরুষ নাম দিলেও কার্যত ও বস্তুত সে শুদ্ধা প্রকৃতি, যেমন বৈষ্ণব সাধনে গোপী। এ দুটি প্রকৃতি সর্বজীবসাধারণ। এর পরও শ্রীকৃষ্ণ বলছেন তাঁর স্বীয়া প্রকৃতির কথা, একান্তই তাঁর সেই পরমা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁকেই আধার করে তাঁর সৃষ্টি কালে ও কালাতীত ভূমিতে। স্বীয়া প্রকৃতি হতে তিনি সর্বদা অভিন্ন। তাঁর সচ্চিদানন্দময়ী দিব্য প্রকৃতিই ঈশ্বরী শক্তি মহামায়া জগন্মাতা, জগতী ভগবতী। যে নামই তাঁকে দেওয়া যাক, সবই তিনি।

পরাপ্রকৃতি জগৎকে ধরে আছে, এর অর্থ কি? এর অর্থ হল মানুষ সাধারণ জীবনে তৃপ্ত নয়, সে চায় পুরুষোত্তমকে। প্রাকৃত মানুষ সাধারণ জীবনে রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বে বিচলিত, বিভ্রান্ত। তার কাছে জগৎ কুরুক্ষেত্র—যুদ্ধের ক্ষেত্র। কিন্তু তারও ভেতরে পিছন থেকে হৃদয়ে জাগে বৃন্দাবনের দিব্য স্বপ্ন। জগৎ ওই বৃন্দাবন রূপেই তার অন্তরে তার আদর্শে তার ভবিষ্য দৃষ্টিতে সত্য। এই কারণে পরা প্রকৃতিকে স্বীকার করে নিতে হবে। আর তারই অনুষঙ্গে অষ্টধা প্রকৃতিও আসে। কিন্তু সে আসে শুদ্ধা হয়ে রূপান্তরিত হয়ে, পুরুষোত্তমের সম্ভোগে নিজেকে নিবেদন করে। জীবনকে অস্বীকার করব কি করে? তার মূলে রয়েছে রস, রয়েছে আনন্দ। কিন্তু সেই জীবনকে নিজে বুঝে বেছে নিতে হবে, অনেক কাটছাঁট করে চলতে হবে এবং শুদ্ধ দেহ প্রাণমনবুদ্ধিকে গ্রহণ করে তাদের অশুদ্ধ রূপকে একেবারে বর্জন করতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ তাই বলেন আমরা যে অপরা প্রকৃতির অধীন, সেই অধীনতার পাশ ছিন্ন করতে হবে। দেহকে আত্মার পরিচ্ছদ বেশবাস বা পরমাত্মার একটি সুন্দর যন্ত্ররূপে দেখতে হবে।

পুরুষকে আত্মা ও পরমাত্মা—এইভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। আত্মভাব হল

বিশুদ্ধ চৈতন্য, মনোতীত হলে যে চেতনা উন্মেষিত হয়, তাই আত্মচৈতন্য। দর্পণের তুলনা দিয়ে বোঝানো হয়, কতই ছায়া দর্পণে পড়ে, কিন্তু সবই যেন ভেসে চলে যায়, কাউকে সে ধরে রাখে না। কথাটা বুঝে চলা কঠিন। সাংখ্য বলেছেন, পুরুষ যে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, সে কেমন? না জবাফুলোপহিত স্ফটিক যেমন। স্ফটিক স্বচ্ছ, তাই জবাফুল সামনে এলে রাগে রঞ্জিত দেখায়, আবার তা সরিয়ে নিলেই সে যেমন তেমনি শুভ্র স্বচ্ছ। আয়না কিন্তু ছায়ার সঙ্গে কখনও জড়ায় না, অথচ তার ওপরে ছায়া ফেলে সব কিছুই ভেসে যেতে পারে। গীতায় রাগদ্বেষবিযুক্ত হয়ে প্রসন্ন চিত্তে বিষয়ে বা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সঞ্চরণ করার কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই স্বচ্ছ চিত্ত আয়নার মতই কাজ করে, আত্মা তখন বিশ্বের যাকে বলা হয় 'আত্মবশ্য'। পুরুষ প্রসাদ অধিগত করে সর্বদাই আনন্দে ভরপুর। আর পরমাত্মার বোধ? শ্রীরামকৃষ্ণ চমৎকার করে তা বুঝিয়েছেন—"যেন বর্ষার জল সব কিছু জারিয়ে রেখেছে"। এই তাঁর শক্তিসম্পাত, প্রসাদ যেন থৈ থৈ করে সব ভাসিয়ে দিয়েছে। তিনিই সর্বত্র ওতপ্রোত, ভিতরে বাইরে। এই ভাবে দেখতে ও বুঝতে উপলব্ধি করতে পারলে প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার প্রশ্ন ওঠে না; প্রকৃতির বশীভূত হবার ভয়ও থাকে না। সেই বোধ পরমাত্মারই বোধ।

প্রকৃতি থেকে তফাৎ হতে গিয়ে তাকে পরিহার করার ঝোঁক থেকে এসেছিল অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রসাধনার পর্ব। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন দেহকর্ষণের কথা—"কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং... শরীরের ভূতগ্রামকে কষ্ট দিলে অন্তঃশরীরস্থ ভগবানকেও কষ্ট দেওয়া হয়। যখন দম্ভ বা তীব্র অহং নিয়ে বাসনা ও রিপু দ্বারা পরিচালিত হয়ে ঘোর তপস্যা করে মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রদ্ধাভরে মহৎ কার্য করতে যান, তখনও অন্তর পুরুষ পীড়িত হন। নিজেকে বা পরকে যন্ত্রণা দিলে সে তপস্যাকে আসুরিক বলা হয়, তার মূলে রজোগুণ বা তমোগুণের প্রাধান্য। গীতা এর নিন্দা করেছেন। আবার এই দেহকেই হরিমন্দির ভেবে ভক্ত যখন তাকে মার্জনা করেন সুসজ্জিত করেন, তখন এই দেহই হয় ভগবানের বিলাসক্ষেত্র। কৃষ্ণসেবায় দেহকে তাঁরা বাদী না ভেবে জেনেছেন, এ দেহ কৃষ্ণবিলাসের অঙ্গ।

শঙ্করাচার্য বিরচিত দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে যে সিদ্ধ দেহের পরিচয় পাই, তাতে "নানাছিদ্র-বটোদরবৎ" অর্থাৎ একটি যেন বৃহৎ বটগাছ, তার ভেতরে রয়েছে আলো এবং তার প্রভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে গাছের নানা ছিদ্র ভেদ করে। তখন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়মুখগুলি সবই প্রকাশ করে অন্তরাত্মার আলো। এ ক্ষেত্রেও দেহ বাদী হয় না, হয় আত্মারই প্রকাশ, জ্যোতিঃভাস্বর "তনু" বিচ্ছুরিত করে প্রজ্ঞা প্রাণ ও প্রেম।

আসল কথা আমরা শুধুই দেহাত্মবাদী বা দেহসর্বস্ব নই। জড়বাদীর একরোখা দর্শন যে দেহবাদ, তা নিশ্চয় বর্জনীয়। দেহের অধীনতা থেকে মুক্তি চাই বই কি। দেহ আত্মারই অনুগত হবে, তার ওপর চেপে বসে থাকবে না। দেহকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে আত্মার সঙ্গী হবার জন্য। সৈনিককে যেমন জীবনের দুঃসহ কষ্ট ও কৃচ্ছ্র তা অভ্যাসের শিক্ষা নিতে হয়, সেই রকম শুদ্ধ দেহ গড়ে তুলতেও কঠোর নিয়ম পালন করতে হয়।

কিন্তু সেটি করতে হবে অন্তরের ভাব নিয়ে, আত্মানুসন্ধানের আগ্রহ নিয়ে দেহমন্দিরে তার অধিপতিকে বসানোর জন্য, শরীরের ভূতগ্রামকে অযথা কর্ষণ করে কষ্ট দেবার জন্য নয়। আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে দেহকে এই ভাবে সুগঠিত ও সুশিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা ছিল। তাতে কায়িক শ্রম যথেষ্ট করতে হত এবং আসন প্রাণায়াম ইত্যাদির ব্যবস্থাও ছিল, দেহ-প্রাণ ও মনের ব্যায়াম যাতে সুসঙ্গত ভাবে চলে, ঊর্দ্ধতন শক্তিসম্পাতকে তারা যেন সুষমভাবে ধারণ করতে পারে। দেহের যিনি নায়ক "ক্ষেত্রপাল" তিনিই 'মনোময় প্রাণশরীর নেতা'। এই শুদ্ধ মনই মনোময় পুরুষ, তিনিই আত্মা। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আমরা যেমন জেনেছি যে আত্মা আবার কি, শুদ্ধমনই আত্মা। উপনিষৎ বলেন ব্রহ্মকে যে পায়, সে হল যজমান মন। প্রাণের বেলাতেও সেই কথা আসে, প্রাণের উত্তেজনা নয়, চাই প্রাণের উদ্দীপনা। উদ্দীপ্ত প্রাণই মনোময় পুরুষের নির্দেশে ঠিক ভাবে চলতে পারে। দেহ তখন ওই দিব্য ভাবেরই আধার, তার কোষে কোষে তখন শুদ্ধ মন ও উদ্দীপ্ত প্রাণচেতনার বিজলী খেলতে থাকবে। সুস্থ ও স্বচ্ছ সেই দেহ মনোময় পুরুষের অধীন হয়ে তাঁর ইঙ্গিতে চলে, সানন্দে সোৎসাহে বেছে নিতে পারে তিনি কি চান আর কোনটা প্রত্যাখ্যান করেন। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে দেহবশ্যতা নয়, দেহই তখন আত্মার বশ হয়ে জরা এবং ব্যাধিকেও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যেমন আনন্দময়ী মায়ের একবার জ্বর হল, তখন তিনি বললেন "আহা। ও এই দেহটাকে একটু ভোগ করুক না, ওরও তো ইচ্ছা হয় ভোগ করতে।" দেহ হতে বিবিক্ত হলেই এ ভাবে দেখা সম্ভব। এই সব রোগ ভোগকেও তখন দেখতে পাব যেন একটি তরঙ্গের দোলার মত। দেহের ভিতরে তার পথ বেয়ে সে এল আবার চলেও গেল। বিজ্ঞানী এই রকম করে রোগের বিশ্লেষণ করেন, দেহকে জরা ও ব্যাধির কবলিত হতে দেন না। বিশ্বব্যাপারেরই ব্যাপ্রিয়া—এভাবেও আবার রোগভোগকে দেখা যেতে পারে। মহামারী যখন আসে, তখন দেখতে পাই যেন একটা ঝড়ের মতই সে প্রবল বেগে সবার ওপর দিয়েই বয়ে যায়। আমিই যে শুধু তার বলি তা তো নয়। এরকম বিবিক্ত থেকে মৃত্যুরহস্য ও তার প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখীন হয়ে তার তত্ত্ব বুঝতে পারি এবং তার সঙ্গে বোঝাপড়াও করতে পারি। এই বিবিক্ত দৃষ্টিতে অভ্যস্ত হলে তিতিক্ষার ভূমি লাভ হয়। প্রাচীন যোগশাস্ত্রে দেহকে নিজের মুঠোয় আনার একটা পথও দেখানো হয়েছে "জন্মকথন্তাসংবোধ" প্রসঙ্গে। দেহের সব কিছু ওই ভূমিতে নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে। আধুনিক দৃষ্টিতে তাকে আমরা নিগ্রহ বলে ভুল করতে পারি, কিন্তু নিগ্রহ ও সংযম তো এক নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানে নিগ্রহের নিন্দা আছে, কিন্তু তাই বলে দেহের বশীভূত হয়ে থাকা তো আর চলে না, আবার তা থেকে মুক্তির পথও কিন্তু নিগ্রহ দিয়ে পাওয়া যায় না। সংযম এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নিগ্রহ অর্থে না জেনে না বুঝে আত্মদর্শন করার চেষ্টা, তার ফল ক্ষতিকর হয়। গীতা এর নিন্দা করেছেন। কিন্তু যোগে সংযম

অর্থে জেনে বুঝে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করার অভ্যাস, তা কোনমতেই নিন্দনীয় হতে পারে না। গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোক মনে পড়ে—

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু
যুক্ত স্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥"

আহার-বিহার নিদ্রা কর্ম এই সব বিষয়েই সংযত ও নিতাচারী হয়ে যোগ অভ্যাস করতে হয়। যোগাভ্যাসে যোগী আহার-বিহার কর্মচেষ্টায় নিদ্রায় জাগরণে সব বিষয়ে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তাঁর যোগসাধনাই দুঃখ নাশক হয়। তিনি অনুভব করেন ভগবানই আত্মা, ভগবানই সব, তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্ম ভগবানই ধরে আছেন।

এইভাবে দেহ ও প্রাণবৃত্তি যখন অনেকটা শাসনে আসে, তখন দেহ ও দেহবোধকে পৃথক রাখার চেষ্টা করতে হয়। স্বাস্থ্যের যে একটা নিটোল স্বচ্ছন্দ সুস্থ স্ফূর্তি, তাই হল কিন্তু স্বাভাবিকভাবে দেহবোধ, সেটা দেহের ওজনের ওপরে নির্ভর করে না। Health কথাটা এসেছে wholth থেকে, যার অর্থ সমগ্র ভাবে অখণ্ড নিটোল একটা অনুভব। যোগসূত্রে আসনের অভ্যাসে অনন্ত সমাপত্তি ও স্থির সুখানুভবের কথা আছে। উপনিষদে আকাশ-শরীর বলে যে শরীরানুভবের কথা বলা হয়েছে তাতে ওই আনন্ত্য এবং স্থির সুখের ভাব আসে। সেই অনুভূতির পরিপাকে ক্রমে দেহপিণ্ডের বোধ আর থাকে না। চেতনার অভিব্যক্তিতে ভাবদেহ সম্বন্ধে প্রাণ সচেতন হয়ে ওঠে।

প্রাণ দেহকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়, তেমনি মন সক্রিয় হয় প্রাণকে অবলম্বন করে। এই দিকে যদি আমরা সচেতন হই তখন দেহের চেয়েও সূক্ষ্ম সত্তা সম্বন্ধে সজাগ ও অবহিত থাকতে পারব। এই প্রাকৃত দেহভার নিয়ে যে জীবনের সত্তা তা হল দেহচেতনার অবিশুদ্ধ বহির্মুখ প্রকাশ। দেহটা নিয়ে বাড়াবাড়ি বা পীড়াপীড়ি কোনটাই স্বাস্থ্যকর নয়। তার আরাম বিরাম ছটফটানি নিয়ে সোরগোল করাটা জড়বুদ্ধির পরিচয়। এ থেকে চৈত্যবোধে উত্তীর্ণ হতে হবে। তার শিক্ষা ও প্রধান কৌশল হল দেহবিমুক্তির ভাবনা। দেহ শুধু জড় নয়, সে প্রাণময় মনোময় জড়, সে বোধের বাহন। বোধরূপ চেতনায় এই সংস্কার উৎপন্ন করতে হবে। আত্মপ্রকৃতির সব কিছুই চেতনার বিভূতি, এইটি ধারণা করায় অভ্যস্ত হতে হবে। সত্ত্ব রজ ও তম যথাক্রমে মন প্রাণ ও দেহকে আশ্রয় করেই গুণলীলা ঘটিয়ে চলেছে। আগুন আর ইন্ধনের দৃষ্টান্তে বুঝতে পারি, ইন্ধনে যে আগুন আছে তার প্রকাশেই ইন্ধন সার্থক হয়। সেই রকম দেহ যদি ইন্ধন হয়, তাহলে ইন্ধন যেমন আগুন হয়ে তাপ আর আলো ছড়ায়, ঠিক তেমনি প্রাণশক্তি তাপ আর চিৎশক্তি আলোকে প্রকাশ করে এই দেহবোধ দিয়েই। দেহকে যোগাগ্নিময় করা, উদ্দীপ্ত শক্তি ও বোধের বাহন করা দেহবিমুক্তির সাধনার উদ্দেশ্য।

এদেশে হঠযোগীরা আবার সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্মপ্রাণ নিয়ে সাধনার পথে অনেক কিছু নব আবিষ্কারও করেছেন। তার মধ্যে প্রধান হল কুণ্ডলিনী চৈতন্য। কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়ে তুলতে হয়; প্রাণস্রোত ঊর্দ্ধাভিমুখী হয়ে মেরুদণ্ড আশ্রয় করে তনুধ্যবর্তী সুষুম্না

নাড়ীর মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে, এই বোধে সাধক সচেতন হয়ে ওঠেন। শারীর বিজ্ঞান দিয়ে যদি প্রাণস্রোতকে বুঝতে হয়, তার প্রধান কথা হল nervous system অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বা নাড়ীতন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন থাকা। সুষুম্না ধ্যানে মেরুদণ্ড সম্পর্কে সজাগ থাকা সম্ভব হয় এবং নাড়ীতন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান ও তাকে সংযমিত করার শক্তি লাভ হয়। এই শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকলে তার পরিপাকে নিঃসংশয়ে বোঝা যায় যে, আসলে সূক্ষ্মপ্রাণই স্থূল দেহ ও প্রাণের নিয়ন্তা। প্রাণ চৈতন্যের শক্তি, তার ক্রিয়া মনেও যেমন দেহেও তেমন। কিন্তু দেহে তার ক্রিয়া কতকটা যান্ত্রিক এবং বেশীর ভাগই অবচেতনে। ক্ষুধা তৃষ্ণা অবসাদ কর্মপ্রেরণা ব্যাধি ইত্যাদি সমস্ত মিলিয়ে বেঁচে থাকার ইচ্ছা বা জিজীবিষা এ সবই প্রাণের শক্তিতে আছে, আর আছে মৃত্যুভয়। এই মৃত্যুভয় জীবের চৈতন্যে জড়িয়ে আছে, বলতে গেলে চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে। এটাই দেহধর্মতার চরম সঙ্কট, একে যে কোন ভাবে অতিক্রম করতেই হবে, অধ্যাত্ম সাধনার এ একটা প্রধান লক্ষ্য।

সূক্ষ্মপ্রাণের বশীকার সিদ্ধ হতে পারে দেহের বশীকারে। তারই চরম পরিপাকে মৃত্যুবিজ্ঞান অধিগত হবে। তখন আর দেহপাত হলেও আত্মজ্যোতি নির্বাপিত হওয়ার শঙ্কা থাকে না। প্রাকৃত দেহ জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর অধীন। চেতনার দিক থেকে দেখা যায় চেতনার ক্রমিক অবক্ষয় ও পরিশেষে চিরকালের মত বিলুপ্তি। কিন্তু উদ্দীপ্ত মনশ্চেতনা যে দেহকে জরা ও ব্যাধিমুক্ত করতে পারে, এর উদাহরণ প্রাকৃত জীবনেও আমরা দেখেছি। তেমনি যোগচেতনা মৃত্যুকে ছাপিয়ে বিস্ফারিত হতে পারে। চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করে এই জীবনেই আমরা জীবন ও মৃত্যুকে পেরিয়ে আসতে পারি। যোগীর জড়সমাধি কি একরকম জীবন্মৃত্যু নয়? চেতনা গুটিয়ে তার চরম নিগ্রহনে জড়ের উৎপত্তি। সমাধি সেই পরম নিগূঢ় চৈতন্যকে ছুঁয়ে থাকে, বেদ যাকে বলেছেন "অপ্রকেতং গহনং গভীরম্"। এই বিশুদ্ধ সত্তার বোধই কিন্তু আমাদের প্রাকৃত দেহবোধের মর্ম সত্তা। অভ্যাসের দ্বারা এই বোধকে জাগ্রতেও প্রবর্তিত করা যায়। আকাশ ভাবনা ব্যাপ্তি চৈতন্যের বোধ নিবিড় হতে থাকলে অনন্ত সত্তার শান্তি আধারে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখনই চেতনা প্রাকৃত জীবনমরণের দ্বন্দ্ব হতে নির্মুক্ত হয়। এইরকম করে মৃত্যুকে জয় করতে পারলে দেহধর্মতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া যায়। চৈত্যপুরুষকে জানা শুধু নয়, চৈত্যদেহ সম্বন্ধেও ধারণা গড়ে ওঠে এবং একটি সুসমঞ্জস অতি সূক্ষ্ম ভাবদেহে তা জমাট বাঁধে। এরকম অতিবাহিক দেহ যে আছে, তাও তখন পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়।

তারও পরে আসে ইচ্ছামৃত্যুর কথা এবং তা থেকে জন্মও ইচ্ছাধীন, এই সিদ্ধান্তে আসা যায়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পূর্ব জন্মগুলি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে গিয়ে এই কথাই বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণের এবং অর্জুনের দুজনেরই বহু জন্ম অতীত কালে সম্ভাবিত হয়েছে। সে সবই শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতিতে রয়েছে, তিনি জানেন, কিন্তু অর্জুন তা জানেন না। ভগবান মানব জন্ম গ্রহণ করেন কিন্তু সাধারণ জীব যেমন প্রকৃতির বশে বাধ্য হয়ে জন্ম গ্রহণ করে, তিনি তা করেন না। তিনি স্বেচ্ছায় প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে প্রকৃতিরই নিয়মেই মানব দেহে

আবির্ভূত হন। প্রকৃতি তো তাঁরই প্রকৃতি "স্বাং প্রকৃতিম্"। তিনিই তাঁর প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁর আত্মমায়ায় তিনি তাঁর প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এ অবস্থায় তাঁর দেহ অবশ্যই দিব্য দেহ এবং জীবনও দিব্য। সাধারণ ভাবে চৈতন্য পুরুষ প্রকৃতির নিয়মে মানুষের মধ্যে থাকেন যোগমায়ার অন্তরালে, কিন্তু তিনি অবতরণ করে সেই অন্তরাল দূর করেন। মানুষী তনু আশ্রয় করে ভাগবত চৈতন্য কেমন করে দেহ প্রাণ মনের মধ্যে প্রকাশিত হয়, নিজের জীবন্ত আদর্শ দ্বারা তিনি যুগসন্ধিক্ষণে মানবকে দেখিয়েও দেন। এই ভাবে যোগসাধনার পরম ও পূর্ণ সিদ্ধিতে মানবের দিব্য দেহপ্রাপ্তির আশ্বাস পাওয়া যায়। দিব্যজীবনেই দিব্যদেহ সম্ভব।

(ক্রমশঃ)

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথা

পবিত্র

শনিবার, ৬ নভেম্বর ১৯২৬

প্রশ্ন এ সপ্তাহের গোড়ার দিকে হয়তো বিরোধী শক্তির প্রভাবে প্রাণের তৎপরতা কিছু উত্তাপ করেছিল। সে প্রভাব সরিয়ে দেওয়াতেও তার ক্রিয়ার নূতনত্ব হেতু একটা উৎকণ্ঠা রয়ে গেল। পরে তা ঘুচে গিয়ে শান্তি এসেছিল।

মনের তৎপরতা হওয়াই সব চেয়ে বেশি মুশকিল। তাকে থামানো যায়না, তার থেকে সরে দাঁড়ানো যায় না। মানসিক একাগ্রতায় তা না হলে তখন নীরব থাকি কিন্তু পরমুহূর্তেই তা এসে পড়ে। ওকে যদি থামানো যেতো তাহলে তাড়াতাড়ি উন্নতি হতো কারণ একাগ্রতা সহজসাধ্য হতো। এখন প্রায়ই তা হচ্ছে, একাগ্রতা তেমন হচ্ছেনা।

উত্তর দেহাত্মক মনের ঐ ক্রিয়া কেবল তখনই রূপান্তরিত হবে যখন দেহেতেই পরিবর্তন আসবে। কিন্তু এখন এই চাই যাতে ধ্যানের সময় তা বর্জিত করা হয়।

প্রশ্ন কিন্তু মন তো সব কিছু দেখছে এবং তা প্রকাশ করে যাচ্ছে. তার সম্বন্ধে কি করা যাবে? ওকে কি চেপে দিতে চেষ্টা করব?

উত্তর চেপে দিতে নয়, প্রত্যাখ্যান করতে। তবে মনের সত্য ক্রিয়াও তো আছে. যা উপরের সত্যকে প্রতিফলিত করে। ওগুলি কি তেমন জিনিষ কিছু নয়?

প্রশ্ন তেমন মনে হয়না। সত্যের কোনো লক্ষণ তাতে নেই. বোধ হয় তা সাধারণ মানসিক ক্রিয়া। আজকাল প্রতিটি ধ্যানে বসবার আগে আমি শক্তিকে আহ্বান করি মনকে থামাবার জন্য. তার দিকে নিজেকে খুলে রাখি। তাই বোধ হয় ঠিক কাজ।

(নীরবতা)

শ্রীঅরবিন্দ X মেয়েটির সম্বন্ধে তুমি কি বলেছ?

প্রশ্ন আপনি যা বলেছেন তাই তাকে জানিয়েছি। বলেছি যে আপনি কারো রাজনীতি করা চাননা, সর্বদাই আপনার এই মত। ওকে বলেছি তৃতীয়জন কাউকে সেখানে পাঠাতে, আর গভর্ণরের মনোভাব বুঝিয়ে বলতে। আর বলেছি যে তাদের সন্দেহ হলে তারা এখানে এসে জেনে যেতে পারে সত্য কথা, ইত্যাদি।

উত্তর নলিনী বললে যে মেয়েটি আশ্চর্য হয়েছিল, ওরা আমাদের জন্য এত কিছু করা সত্ত্বেও আমরা ওদের জন্য কিছু করবনা।

প্রশ্ন : না, তেমন আমি বলিনি। যাতে ভুলবোঝা না হয় তাই কেবল বুঝিয়ে দিয়েছিলাম।

উত্তর : ওদের বোঝা উচিত যে রাজনীতির বিষয়ে আমি কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করতে পারিনা। শুধুই আধ্যাত্মিক জিনিস আমার কাছে পেতে পারে। তোমাকে যা সাহায্য দিয়েছে তার বদলে কেবল আধ্যাত্মিক সাহায্যই পাবে। তা গ্রহণ করতে পারলেই ভাল। আমার কাজ কেবল আধ্যাত্মিক স্তরে, যা করি তা উপর থেকে। C.R. যখন এসে সাহায্য চাইলে তখন ঐ ছাড়া অন্য কিছু করিনি। কিছুকালের জন্য নিজেকে খুলে রেখে সে গ্রহণ করতে পেরেছিল। তার শরীরও সেরেছিল। কিন্তু তার পর সে সংস্পর্শ কেটে দিলে। সে চেয়েছিল লোকমান্য, বিজয়রাঘবাচারীর আশীর্বাদ ইত্যাদি, তা আমি দিতে স্বীকার হইনি। যদি লোকের ভালো করতে চায়...কিন্তু তুমি তো জানো এখানে রাজনীতি কত কলুষিত।

প্রশ্ন এই কথাই তাকে বলব?

উত্তর বেশ, সুযোগ পেলে তখন বলবে। বলবে যে আমি আপাতত নিজেকে সব কিছু থেকে সরিয়ে কেবল আধ্যাত্মিক কাজেই নিমগ্ন আছি।

শনিবার, ৬ নভেম্বর ১৯২৬

মায়ের সঙ্গে সন্ধ্যা ৭টা

প্রশ্ন : দিনটা শান্তিতে কেটেছে। আজকে সন্ধ্যার ধ্যানে সব কাজ বাহ্যচেতনাতে হয়েছে। একটি শান্ত জ্যোতি নেমে দেহের উর্দ্ধাংশকে বেষ্টন করল, কোথা থেকে তা জানা গেল না। বাহ্য মন শান্তিতে ছেয়ে গেল। নিম্ন কেন্দ্রেও অর্থাৎ সমস্ত বাহ্য চেতনাতে তাই হলো। ঐ শান্তির মধ্যে আমি একাগ্রতা আনতে চাইলাম না।

মা : ঠিক হয়েছে, শক্তির ক্রিয়াকে অনুসরণ করাই উচিত। বাহ্যচেতনাতে ক্রিয়া করা মানে সম্পূর্ণ চেতনাকে সে এক করতে চায়।

প্রশ্ন কিন্তু মনের একটা অংশ কেবলই সক্রিয় থাকে, সে শুধু লক্ষ্য করতে থাকে। যা দেখি তা ভাষাতে ব্যক্ত করতে, যা বোধ করে তা প্রকাশ করতে চায়, থামাতে পারি না।

মা : আপাতত ওতে কিছু যায় আসে না। ভাষাতে ব্যক্ত না হলে তুমি তো সেটা জানতে পারবে না। আপাতত ওরও দরকার আছে।

মা : তুমি সরাসরি চেতনা পাবে, কোনো মাধ্যমে নয়। প্রকাশের জন্য ভাষার তো দরকারই কিন্তু এর পর মনের কাজেরই আর দরকার হবে না।

উনি যখন 'আর্য' পত্রিকা লিখতেন তখন মন ছিল সম্পূর্ণ নীরব, চেতনা ছিল উচ্চে

অভিজ্ঞানগো, সেই চেতনাই ভাষা দিচ্ছিল। প্রকাশ হলে তখন জানা যাচ্ছিল। 'আর্যেশ' লেখা বুদ্ধির দিকে নিখুঁত, সুস্পষ্ট, যুক্তিযুক্ত। অথচ মনের তাতে কিছুমাত্র অংশ ছিল না। তার মানে অবশ্য মন নিরর্থক জিনিস নয়। তারও কাজ আছে, কিন্তু

(এর পর পাতা ছেঁড়া)

প্রশ্ন : একি সম্ভব যে মনের জিনিস কিছু একখান ও কিছু অন্যখান থেকে আসে?

মা হাঁ, কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন বিশ্বের দেশে অলৌকিক জ্ঞানের খুব চর্চা হয়েছিল, কেউ কেউ অলৌকিক জ্ঞান লাভ করেছিল। সে জ্ঞানের তরঙ্গের সংস্পর্শ ঘটলে তখন তারও ক্রিয়া হবে, যদিও তা খুব বিরল। সাধারণত ওর জন্য একটা প্রবণতা থাকে, কিংবা কারো ঐরূপ গুণ থাকে কিংবা ওর স্মৃতি।

প্রশ্ন : এই দিব্য ভাব, এ কি ব্যক্তির আপন উচ্চতর সত্তা থেকে?

মা তুমি বলছ ব্যক্তির জীব বা জীবাত্মা থেকে, অর্থাৎ যা ব্যক্তিগত জাতকের উপর আধিপত্য করে? ওটা তার চেয়েও বড়ো। যাকে জীব বলি তা হলো দিব্যসত্তাদের বিভূতির মতো, যা বহু জীবকে নিজের ভিতর থেকে উন্মেষিত করে, সেই জীবগণ ব্যক্তির জন্ম দেয়।

তোমার বেলাতে সেই দিব্যসত্তাই জীবের জন্ম দিয়েছে। তার মধ্যে একটি ঐ ভাব সরাসরি পেয়েছে, ওর দ্বারাই পূর্ণতা আসবে। সে জীব তিনবার জন্ম নিয়েছে, তুমি হলে তার চতুর্থ। কোনো বিভূতি যখন এই ভাবে আপন আধার বেছে নেয় তখন তারই শক্তিতে সে নিয়ন্ত্রিত হয়। বাল্যকালে নানা দিকে ঝোঁক থাকে যার অর্থ বোঝা যায়না, কিন্তু তারপর সময় আসে যখন লক্ষ্যের দিকে চেতনা জাগে। তখন সে সব ঝোঁক পুরুষানুক্রমে কেন ঘটেছিল তার অর্থ বোঝা যায়। তোমার পেছনে যা আছে সেই হলো তোমার প্রকৃত আত্মা, পার্থিব জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি দিয়ে আচ্ছাদিত।

শনিবার, ১৩ নভেম্বর ১৯২৬

প্রশ্ন : আমার প্রাণসত্তা ধ্যানে পুরো অংশ নিচ্ছে। আমি বোধ করি যে আমার চেতনা মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক স্বচ্ছ শান্ত জিনিসের মতো প্রসারিত রয়েছে। চোখে দৃষ্টি না থাকলে আরো পরিষ্কার হয়, কিন্তু সব সময় তা হয় না। আর আমার বোধ হয় যে পিছনে রয়েছে এক উপস্থিতি যা আমার চেতনারই দোসর। সে যেন আমার দেহেরই সমান বড়ো, বাহ্য চেতনার সঙ্গে এক হয়ে মিলতে চায়। সে মিলন আজ পুরোই হচ্ছিল যদিও

চেতনার কিছু বদল হয়নি। যেন সামান্য স্পর্শেই আমি তার বিষয়ে পূর্ণ চেতন হবো। এটা কি দেহচেতনা নয়? অর্থাৎ মন-প্রাণ দেহ নিয়ে যে চেতনা?

উত্তর বোধ করি তা স্বাভাবিক চেতনা, দেহচেতনা সমেত, ওর পিছনে আছে আভ্যন্তর চেতনা, যে চায় বাহ্য চেতনার সঙ্গে মিলতে।

প্রশ্ন : এ ছাড়া প্রাণসত্তার ক্রিয়াতে টের পেলাম যা অহংগত ক্রিয়া। সে সব হলো প্রাণসত্তার জিনিস, আবেগময় কেন্দ্রের। চিন্তাগুলির মধ্যে কোনো গর্ব বা স্বার্থভাব নেই, কিন্তু কোনো কোনো চিন্তায় ঐ জিনিস এসে পড়ে, আমি ঠেকাতে পারি না। ও সব চলে যাবে কি?

উত্তর হাঁ। প্রথমে দেখবে যে ওগুলি মন থেকে আসে না। মন যদি মুক্ত ও আবেগশূন্য হয় তাহলে ওগুলি এলেও মনকে আচ্ছন্ন করে না। তখন তাতে সম্মতি না দিয়ে সরিয়ে রাখলে তা চলে যাবে। অনেকে তা পারে না, কারণ চেতনভাবে ওকে পৃথক করে দেখে না।

প্রশ্ন আমি গভীর ও বৃহৎকে অনুভব করি।

উত্তর বেশ।

(নামের সঙ্গে কয়েক পাতা ছেঁড়া)

প্রশ্ন দার্শনিকের যে পরশপাথর তাতে নাকি দেহও পরিবর্ত্তন পায়। তার মানে কি এটা উপলব্ধির কথা নয়?

না হাঁ। রূপান্তর হওয়া সম্বন্ধে ধারণা করাবরই ছিল, কিন্তু দৃষ্টিটা ছিল আংশিক ধরণের। ওরা ছিল তখনকার দিনের বৈজ্ঞানিক। কাল কি দেখেছিলে?

প্রশ্ন চোখে কিছু দেখিনি। কিন্তু উচ্চশক্তি ও তার মহত্বকে বোধ করেছি।

না পুরো পরিবর্তন প্রত্যাশা করতে পারোনা। কিন্তু কেউ কেউ কিছু দেখতে পায়।

প্রশ্ন : আমি দেখি একটা জ্যোতি, একটা জ্যোতির্মণ্ডল।

না হাঁ, ওর চেয়ে বেশি প্রায় হয় না। তবু কেউ কেউ বেশ পরিবর্তনও দেখে।

প্রশ্ন : আমি দেখলাম একটা বুকের ছাতার মতো, যা পরে বদলাতে পারে : কিন্তু চঞ্চল অনিশ্চিত জিনিস হওয়াতে ওদিকে মনোযোগ দিইনি।

না পর্যায়ক্রমে ওর বিভিন্ন অভিব্যক্তি হয়। তা হয় অপূর্ণ, কারণ স্থূল জিনিসটা

রূপান্তরিত হয় না, যা হয় তা রক্তের মধ্যে। কাল যা হয়েছিল তা প্রজ্ঞাশক্তির অভিব্যক্তি, বাক্ সম্বন্ধীয় জ্ঞান। তোমার চোখের মধ্যে কোনো ক্রিয়া হচ্ছে টের পাও কি?

প্রশ্ন : হাঁ, অনেক বার তা বলেছি।

মা : তোমার বাহ্যচেতনা কতটা আভ্যন্তরের সঙ্গে মিলতে পারে তার উপরে নির্ভর করে। বাহ্যসত্তার বিষুগুলি কাটিয়ে উঠতে পারলে তোমার উত্তরোত্তর অভিষেক হবে। বিশ্বের কোথায় কি আছে তা চোখেই দেখিয়ে দেবে, তাহলে সবই যথাযথভাবে জানবে। কিন্তু আগে সব বিষু কাটানো চাই।

প্রশ্ন আমাকে বিশেষ কিছু করতে হবে কি?

মা সব চেয়ে ভালো হবে নিজেকে খুলে দিয়ে বলা, যা করবার তা ক'রে দাও।

শনিবার, ২০ নভেম্বর ১৯২৬

প্রশ্ন : আমার সাধনা কেমন ভাবে চলছে তা বোধ করি মা আপনাকে বলেছেন।

উত্তর : হাঁ।

প্রশ্ন : ওর চেয়ে বেশি কিছু বলার নেই। আমি পিছনের বৃহৎ চেতনার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে দেখতে চেষ্টা করি, কিন্তু এখনও তা হয় না। বাহ্য চেতনাতে আর মনের ক্রিয়াতে বাধা আসে, তাতে আমাকে সরিয়ে দেয়।

উত্তর : এ তো পুরানো কথা। তুমি ঐদিকেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছ।

প্রশ্ন : জোর ক'রে চাপতে চেষ্টা করি না। কিন্তু ওর কি কোনো গুরুত্ব নেই?

উত্তর : ওগুলি সব বাহ্য ক্রিয়া, যা সাধনার ধারাতে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বাহ্য সত্তা তোমার জীবনকালেরই ব্যক্তিত্ব, তা তোমার আসল ব্যক্তিত্ব নয়।

প্রশ্ন কিন্তু কেমন ক'রে যাবে?

উত্তর : যখন ভিতরের চেতনা পুরো জাগ্রত হবে তখন বাহ্য জিনিসকে তা শোধিত ক'রে নেবে, আর যাকে তা পারবে না তাকে বর্জন করবে। সেরূপ পরিবর্তন একদিন আসবেই।

প্রশ্ন : আপনি লেলের সঙ্গে আপনার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। বাহ্য ক্রিয়া তখন কি একেবারে থেমে গেল?

উত্তর হাঁ, সমস্তই থেমে গেল। তবে সকলের তা হয় না। আমি পেয়েছিলাম কারণ আমার সত্তার মধ্যেই ছিল একটা স্থিরতা, আর আমি দেখলাম যে চিন্তাগুলো আসে বাইরের থেকে। তাকে প্রত্যাখ্যান করাতেই স্থির নিশ্চলতা এসে গেল। মনের কাছে সবই আসে কিন্তু তাতে সাড়া জাগে না। সবই দেখিতুনি, কিন্তু সাড়া ওঠে না। সেই সময়ে এমনি পুরো নীরবতা এসেছিল। সবই দেখেছি সিনেমার মতো। পরে আবার সব যথাযথ স্থানে নিয়ে নিতে হলো।

প্রশ্ন কিন্তু আমার বেলা তা কি হতে পারে না?
উত্তর হবে, উপরের চাপে। এখনই নয়। আগে নীরবতা আসা দরকার।

প্রশ্ন এখনও পর্যন্ত চেতনার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। মনের গভীরতা টের পাচ্ছি, পিছনে আরো গভীরতা বোধ করি। এটা জানছি যে শক্তি আমার মধ্যে কাজ করছে, কিন্তু পরিবর্তন এখনও তেমন হয়নি।

(এর পর দশটি পাতা ছেঁড়া)

(সমাপ্ত)

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

Thoughts and Aphorisms

(বাংলার ব্যাখ্যা সহ)

২২২—শুধু সাধুসন্ত ও দেবদূতের মধ্যেই ভগবত্তা নেই ; অসুরদেরও মানতে হবে।

২২৩—প্রাচীন পুঁথিতে অসুরদের বলে আগেকার দেবতা। তারা এখনও তাই আছে, আর দেবতাও পুরো দেবতা হয়না যদি তার মধ্যে একটি অসুর না থাকে।

২২৪—আমি রাম না হই তো রাবণ হবো, কারণ রাবণ বিষ্ণুরই উল্টো পিঠ।

এ কথাগুলির মানে নিস্তেজ মাধুর্য ও অক্ষম মহত্ত্ব হলো অপূর্ণ জিনিস, ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ নয়। শ্রীঅরবিন্দের এই সূত্রগুলি ধরে আরো বলতে পারি যে একজন নিরীহ দেবদূতের দয়ার চেয়ে একজন দয়ালু অসুরের দয়া অধিক কার্যকরী। ১১-১২-১৯৬৯

২২৫—ত্যাগ, ত্যাগ, ত্যাগ, অবশ্যই তা করবে, কিন্তু ত্যাগের জন্য ত্যাগ নয়, ভগবানের ও মানুষের জন্য ত্যাগ।

২২৬—স্বার্থপরতা আত্মাকে নাশ করে। কিন্তু এটা দেখো যে তোমার পরোপকারিতা অন্যের আত্মাকে নাশ না করে।

২২৭—পরোপকারিতা প্রায়ই হয় স্বার্থপরতার চূড়ান্ত রূপ।

মা, পরোপকারিতা অন্যের আত্মাকে নাশ করবে কেন ?

উত্তর অন্যকে যখন সাহায্য দাও, তখন সেই সঙ্গে তোমার মতামতগুলো তার ঘাড়ে চাপাও, তাতে তাদের আত্মা গুটিয়ে যায়, কারণ প্রত্যেকের আত্মার স্বতন্ত্র আভ্যন্তরীণ নীতি আছে, তোমার দেওয়া নীতি তার স্থান গ্রহণ করতে পারেনা। ১৩-১২-১৯৬৯

২২৮—ভগবান মারতে বললেও যে না মারে সে জগতে বিপর্যয় ঘটায়।

২২৯—মানব জীবনকে যা পারো সম্মান দাও, কিন্তু সমগ্র মানবতাকে শ্রদ্ধা করো।

২৩০—রাগের বশে, ঘৃণা বা প্রতিহিংসাতে মানুষ খুন করে ; এখন কিংবা পরে তার প্রতিফল পেতে হবে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য কেউ খুন করে, ভগবান তাকে মার্জনা করেন না। যে খুন করবে তার আগে জানা চাই যে মৃত্যুতে ওর মুক্তি হবে, আর সে জানবে যে সেই খুনী এবং তার অস্ত্র সেই নিহত ব্যক্তির মধ্যেও ভগবান রয়েছেন।

মা, ভগবান কেমন অবস্থাতে খুন করতে বলতে পারেন ?

উত্তর এ প্রশ্নের উত্তর আমি জানিনা, কারণ ভগবান কখনো আমায় খুন করতে বলেননি। ১৪-১২-১৯৬৯

২৩১—সাহস ও প্রেম মানুষের অপরিহার্য গুণ। আর সব গুণ ওর কাছে ম্লান হয়ে যায়, ঐ গুণ দুটিই কেবল আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখে।

২৩২—হীনতা ও স্বার্থপরতা হলো একমাত্র পাপ যাকে আমি ক্ষমা করতে পারিনা, অথচ এই দুটি প্রায় সর্বত্র। সুতরাং অন্যের বেলা একে ঘৃণা না ক'রে নিজের মধ্যে ওকে নিশ্চিহ্ন ক'রে ফেলা চাই।

২৩৩—মহত্ব ও বদান্যতা হলো আত্মার উচ্চ আকাশ, এ দুটি না থাকলে দৃষ্টি চলে যায় অন্ধকারের কৃমিকীটের দিকে।

২৩৪—তোমার এমন গুণ চাইনা যাতে লোকে বাহবা দেয় বা পুরস্কৃত করে, এমন গুণ চাই যাতে তোমাকে পূর্ণতা দেবে, যে গুণ ভগবান চান তোমার প্রকৃতির মধ্যে।

বা, ঐ কথাগুলির অর্থ বলুন (সাহস ও প্রেম), (হীনতা ও স্বার্থপরতা), (মহত্ব ও বদান্যতা)।

উত্তর : ১। সাহস মানে সব রকমের ভয়শূন্যতা।

২। প্রেম মানে আত্মদান, কোনো প্রতিদান না চেয়ে।

৩। হীনতা মানে সেই দুর্বলতা, যা নিজের গুণ নেই অথচ অন্যের গুণের হিসাব ও দাবি করে।

৪। স্বার্থপরতা মানে নিজেকেই বিশ্বের কেন্দ্র জ্ঞান ক'রে কেবল নিজের সুখের জন্যই জগতের সব কিছু কামনা করা।

৫। মহত্ব মানে যা কেবল নিজের দিকটা বিচার করেনা।

৬। বদান্যতা মানে যা অপরের সুখে সুখী হয়।

২৩৫—পরোপকার, কর্তব্য, সংসার, স্বদেশ, মানবতা, এগুলি যদি তোমার যন্ত্রের মতো না হয় তাহলে তা আত্মার কারাগারের মতো।

২৩৬—আমাদের দেশ হলো ভগবতী জননী, দেশের নিন্দা কখনো কোরোনা যদি সেই সঙ্গে দেশের প্রতি প্রেম ও মমতা তোমার না থাকে।

২৩৭—নিজের লাভের জন্য মানুষ দেশের বিরোধিতা করে অথচ তারা মাতৃহত্যার কথা শুনে আতংকিত হয়ে ওঠা উচিত বলে মনে করে।

বা, পরোপকার প্রভৃতি গুণগুলি আমার যন্ত্রের মতো কেমন ক'রে হয়?

উত্তর আমরা ভগবানের জিনিস, সুতরাং ওগুলির দ্বারা ভগবানেরই কাজ সে করবে। ভগবান যখন তোমাকে পরোপকার বা দেশের কাজে নিয়োগ করবেন তখন তাঁর যন্ত্র হয়ে ঐগুলি করলে কারাগারে থাকা হবেনা। সেখানকার আদেশ না পেয়ে তা করলে সে কেবল সামাজিক ও নৈতিক ক্রিয়া হবে। ১৭-১২-১৯৬৯

২৩৮—পুরাণো ছাঁচ ভেঙে ফেল কিন্তু তার প্রাণশক্তিকে বজায় রাখো, নতুবা তোমার ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবেনা।

২৩৯—বিপ্লব এসে অতীতকে ভেঙে কটাহে নিক্ষেপ করে কিন্তু তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে নতুন পোষাকে সেই পুরাণো জিনিস।

২৪০—সার্থক বিপ্লব জগতে ছয়টি মাত্র হয়েছে, তারও অধিকাংশ ব্যর্থপ্রায় তথাপি সেই বৃহৎ ব্যর্থতার ভিতর দিয়েই মানব অগ্রসর হয়ে চলে।

মা, বৃহৎ ব্যর্থতা বলতে শ্রীঅরবিন্দ কি বোঝাচ্ছেন?

উত্তর কোনো ঘটনার বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব তার বাস্তব সার্থকতার উপর নির্ভর করেনা, নির্ভর করে তার ভিতরকার ভাব ও লক্ষ্যের উপর। কোনো কাজের কেবল সার্থকতা নয় কিন্তু ব্যর্থ হলেও উদ্দেশ্য ও ভাবই তাকে মহত্ত্ব দান করে।* ১৮-১২-১৯৬৯

* অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

৪ নভেম্বর ১৯৫৩

৪ঠা অগষ্ট তারিখের "কথাবার্তা" থেকে ত্যাগ ও আত্মদান সম্পর্কীয় লেখাটি পড়া হলে—

প্রশ্ন : মা, আগেকার কালে দেবমন্দিরে নরবলি দেওয়া হতো কেন?

উত্তর : এ প্রশ্ন ঠিক বুঝলাম না। বলি দিতে বাধা কোথায়? ছাগবলি আর নর-বলিতে তফাৎ কি তাও জানিনা। তবে বংশানুক্রমে যে কথা শুনে আসছ, আর বাস্তবিক যা ঘটেছিল, তা হয়তো সম্পূর্ণ অন্যরূপ। বলি দেওয়ার কথাটা হয়তো প্রতীক হিসাবে বলা হতো। শুনতে পাই কোনো কোনো ধর্মে হাজার হাজার নরহত্যা করা হয়েছে। তা সম্ভব, মানুষের স্বভাবে জীবন নষ্ট করার একটা প্রবৃত্তি থাকে। সেই সব ধর্মে এই প্রবৃত্তি কাজ করেছে। তবে অবস্থাভেদ আছে। আগে নিশ্চয় হওয়া চাই যে কথাটা ঠিক কিনা। আমি নিশ্চয় নই, তবে তা সম্ভব বটে। সবই দৃষ্টিভঙ্গীর উপর নির্ভর করে। তবে কেউ যদি দেবতার কাছে অন্যের অস্তিত্বকে উৎসর্গ করার অধিকার গ্রহণ করে কিংবা সেই দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখে, তবে সেটা খুবই খারাপ মনোভাব। আগেই বলেছি যে পশুবলি ও নরবলিতে কেন তফাৎ হবে জানিনা, এ খুব আশ্চর্য কথা।

অনেক ধর্মে, যেমন এখনও রয়েছে ছিন্নমস্তা কালীর মন্দির, সেটা অতি অজ্ঞানান্ধকারের জিনিস। এ ভাব এসেছে আসুরিক দেবতার অহেতুক ভীতি থেকে, যিনি রক্ত চান বা আর কিছু ঐরূপ জিনিস চান, যাতে তোমার নিজের কোনো অনিষ্ট না হয়। এ সব আসে ভীতির মনোভাব থেকে, যাতে ভগবানকে ভয়াবহ মনে করা হয়। কিন্তু তাও যদি হয় তাহলে সেখানে ত্যাগ বা বলি হওয়া উচিত আত্মবলির দ্বারা। নিজের কিছু দেবার বদলে অন্য কোনো পশুর বা মানুষের জীবনকে ভগবানের কাছে বলি দেবার কি অধিকার আছে জানিনা। বলি দিতে হয় তো নিজেকে বলি দাও, অন্য কাউকে না। এ ব্যাপারটাই অসুন্দর ও অন্ধ অজ্ঞানতা, আর তা ছাড়া ছাগবলি ও নরবলিতে কি তফাৎ জানিনা; ছাগলকে যদি প্রশ্ন করো, কেন...

জগতে লোকের আপন অস্তিত্বের মূল্য সম্বন্ধে অদ্ভুত এক ধারণা আছে। যদি বলো "অন্যের জীবন নেবার অধিকার তোমার নেই," তার অর্থ বোঝা যায়; তাহলে ভগবানের কাছে কিছু নিবেদন করতে হলে নিজেকে নিবেদন করো। যদি মনে করো যে নির্মম ভগবান রক্ত বা আর কিছু চান, সেটা নিজের থেকে দাও। অন্যের জীবন নেবে কেন? সেটা হবে অসহ্য অত্যাচার। তবু যদি মুরগী জবাই হতো তো বুঝতাম তার একটা অর্থ

আছে, নিজেদের জীষ্ট খাওয়া হবে। একটা ঐরূপ অজুহাতে পেটভরা কিছু খাদ্য মিলবে। আমার কাছে কিন্তু এ সবের মধ্যে কোনো তফাৎ আছে বলে মনে হয় না।

প্রশ্ন : যখন বিপরীত আবহাওয়ার মধ্যে কিংবা মন প্রাণের বিপর্যয়ের মধ্যে আছি তখনও কি ভগবৎ উপস্থিতি অনুভব করতে পারি?

উত্তর যদি তেমন আবহাওয়া নিজেরই ভিতরকার জিনিস না হয়। তাহলে কিন্তু তা কঠিন। তথাপি। এমন দৃষ্টান্ত প্রায়ই আছে যেখানে বিপরীত জীবনেও ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটেছে। আমরা সকলে জানি সেই মাতালের কথা যে মত্ত অবস্থাতেই ভগবানের সংস্পর্শ পেয়েছিল, এবং তাতে তার জীবনই বদ্‌লে গেল, মদ ত্যাগ করলো। কিন্তু যখন ভগবানকে পেলে তখন তার মত্ত অবস্থা। আবার মনে হয় না যে ভগবান একজন নীতিবাগীশ— আবার ঐ কথাই আসছে। মানুষই হয় নীতিবাদী, ভগবান নয়। এমন হতে পারে যে ঐ সময়েই তার অনুকূল যোগাযোগ ঘটেছিল, ভগবান তো সব সময়েই উপস্থিত, তিনি তখনই তার কাছে নিজেকে প্রকাশ করলেন। আর যেখানে কোনো জ্ঞানী বা সাধু ব্যক্তি নিজের গুণকে যথেষ্ট মূল্য ও গুরুত্ব দিচ্ছে ও গর্ববোধ করছে সেখানে ভগবানের দেখা দেবার সম্ভাবনাই নেই, কারণ সেখানে তাঁর প্রকাশ হবার মতো জায়গা নেই, সমস্ত জায়গাটুকু তার আপন গুরুত্বে ও ব্যক্তিত্বে ভরাট হয়ে আছে।

অবশ্য যেখানে প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত বিশুদ্ধি রয়েছে সেখানে ভগবানের সংস্পর্শ ঘটবেই। তার মানে সেখানে এতটাই পূর্ণতা এসেছে যে ব্যক্তিগত মূল্য বা গুরুত্ব ঘুচে গেছে। প্রকৃতপক্ষে তাই হওয়া দরকার। ভগবান-সংস্পর্শের প্রধান বাধা হলো গর্ব, অহমিকা, আপন মূল্যবোধ, ব্যক্তিগত শক্তি ও গুণগরিমা বোধ, অর্থাৎ সেখানে সে নিজেকে এত বড়ো করছে যে ভগবানের সেখানে ঠাঁই হয় না।

না, সব চেয়ে বড়ো জিনিস হলো আস্পৃহার তীব্রতা। সে তীব্রতা আসে নানারূপ অবস্থাবিশেষের মধ্যে।

দুই আলাদা জিনিসে যেন গণ্ডগোল না পাকাই এক হলো প্রয়োজন (দৈহিক সংযমাদির), আর এক হলো নৈতিক ধারণা। দুটি স্বতন্ত্র জিনিস। আপন দেহচেতনা ও দেহবস্তুকে রূপান্তর দিতে তুমি সকল বিষবস্তু বর্জন করতে, মস্তিষ্ককে ভোঁতা করতে, ইচ্ছাশক্তিকে বর্জন করতে পারো। কিন্তু ওতে যদি মনে করো নৈতিক সিদ্ধিলাভ হবে তবে কোথাও তুমি পৌঁছবে না। সে উদ্দেশ্যই নেই, কেবল বাস্তব উদ্দেশ্য। যেমন, তুমি সব রকমের বিষ বর্জন করেছ, কারণ ওতে দেহের অনিষ্ট হয়। অনেকে মৃদু বিষের অভ্যাস রাখে (কারণ তাতে কোনো আপাত ক্ষতি হচ্ছে না), কিন্তু যে চায় নিজেকে পুরো সক্ষম সাবলীল রাখতে সে তাও বর্জন করে, নৈতিক কারণে নয়, বাস্তব কারণে কিংবা যৌক্তিক কারণে। কোনো গুণপ্রাপ্তির জন্য নয়, যে ভগবান তোমার গুণ দেখে খুশি হয়ে তোমায় দেখা দেবেন। তা মোটেই নয়। বরং যে ভুল কাজ করেছে, যে নিজের দোষ

দুর্বলতাকে জেনে তার থেকে মুক্ত হতে আন্তরিক আশ্পৃহা করে, তার কাছে কাছে তিনি থাকেন, কিন্তু যে কখনো কোনো ভুল করেনি বলে মদগর্বে অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার কাছে কখনো নয়। আসল জিনিস হলো ঐকান্তিকতা, স্বেচ্ছাসাধন, আশ্পৃহার তীব্রতা— এমন একটা প্রয়োজনবোধ চেপে থাকে যে তার কাছে জগতের সব কিছু নস্যাৎ হয়।

যা আমি আগেই বলেছি, সমর্পণ ও ত্যাগ, তার মধ্যে যদি কিছুমাত্র কুণ্ঠা থাকে তার মানে তুমি আধ্যাত্মিক চেতনার অবস্থাতে নেই। যদি কামনাপূরণ হয়নি বলে দুঃখবোধ করো, তার মানে সেই কামনার গুরুত্ব তোমার আশ্পৃহার সঙ্গে সমান রইল। যদি বলো, "কামনার মূল্য জেনেশুনেই আমি ত্যাগ করছি, যাতে ভগবানকে পেতে পারি, কিন্তু পাবো কিনা ঠিক জানিনা, অতএব ওটা আপাতত ত্যাগই রইল," কিন্তু তা হবে পাটোয়ারি। ভগবানকে বলা যে কামনার সুখটা তোমাকে দিচ্ছি, তার বদলে আমাকে পাওয়ার সুখ দাও, নইলে অন্যায় হবে। এ আত্মদান নয়, লেনদেন।

এমন কথা আমি প্রায়ই শুনে থাকি—"অনেক কিছু আমি ত্যাগ করলাম, অনেক প্রয়াস করেছি, অনেক রকম কষ্ট সয়েছি, কিন্তু তার বদলে কিছু পাইনি।" তার জবাবে আমি বলি, "তার আশ্চর্য কি?"

প্রশ্ন অতি গর্বিত ব্যক্তির কি আশ্পৃহা থাকতে পারে?

উত্তর: কেন থাকবে না? খুব গর্বিত ব্যক্তি যা খেয়ে খেয়ে চেতন হতে পারে, আঘাতে তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে! তখন তার আশ্পৃহা আসবে। আর তার প্রকৃতির মধ্যে যদি প্রাবল্য জিনিসটা থাকে তবে আশ্পৃহাও তার প্রবল হবে।

প্রশ্ন: আর কোনো আঘাত যদি সে না খায়?

উত্তর তা হতে পারে, তাতে একটা নিশ্চিত অবস্থা হবে। সকল দিকেই তার নিশ্চণ থাকবে। নিশ্চণের জট ছাড়াতে অনেক সময় লাগবে। যে কোনো অবস্থাকে নিয়েই কাজ শুরু করা যায়, এর আরম্ভ সকল অবস্থাতেই হতে পারে। তবে সে স্থলে অনেক সময় লেগে যায়। এমন নিশ্চণ থাকে যে এক পা এগোলে আধ পা পিছিয়ে যেতে হয়। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিজীবনের উদ্দেশ্যই হলো ভগবানকে জানা, সেখানে যখন হোক যেমন অবস্থাতেই হোক কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। আর সে জিনিস যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারে। কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকলেই তা হবে। তবে যদি তুমি আপন অবস্থাতেই খুশি থাকো, তা হয় একটা বাধাস্বরূপ, কারণ তুমি আপন আত্মতৃপ্তিতে ঘুমিয়ে থাকো। কিন্তু সে জিনিস স্থায়ী নয়। বর্তমান জগতে জীবনের যখন অহংতুষ্ট স্থায়ী হয় না—তবে যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ তুমি কঠিন হয়ে থাকো, তখন কোনো আশ্পৃহা আসেনা। কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। আর কেউ কিছু জানতে চাও?

কিছু না? তাহলে আজ গুড্ নাইট। —শ্রীমা

পথের কথা

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ বিজয়া দশমী

আজ স্পষ্টই দেখলাম, শক্তির প্রবল চাপ। সে বলছে বিজয়, বিজয়, সর্বৈব বিজয় হলো সঙ্গতির মধ্যে। বিজয়, তাই তো ভগবান; দেহের বিজয় স্বাস্থ্য। যত দুঃখ, যত ব্যাধি, সবই মিথ্যা। আজ সকালে তা সুস্পষ্ট ও দৃঢ়বিশ্বাস্য।

সবই ঠিক আছে। শক্তির চাপে সকল মিথ্যা বেরিয়ে পড়েছে। সমস্তই অপ্রত্যাশিত—ব্যক্তিতে, বস্তুতে, ঘটনাতে। এত কল্পনা করা যায় না, বিশ্বাস করা যায় না।

ভক্ত কিন্তু এ তো খুব ভালোই লক্ষণ, নয় কি?

মা হাঁ, তা ঠিক, তা ঠিক...যেন কোথাও বিষ জমা হয়েছিল, চাপের জোরে বিষ বেরিয়ে এলো, নিশ্চিহ্ন হবার জন্য। ভালোই লক্ষণ, খুবই ভালো।

ভক্ত: হাঁ, কারণ হাজার হাজার বছর যা গোপনে জমা হয়েছিল...

মা: হাঁ।

ভক্ত: তা এখন আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে।

মা হাঁ, তাই বটে। দেখা যাক। এখনও বলবার মতো সময় হয়নি, পরে হবে। অবিশ্বাস্য গো ছেলে। প্রবলতম শক্তি, ওঃ! (মা চোখ বুজে হাসলেন)

১৬ অক্টোবর ১৯৭১

ভক্ত দেহের কষ্টকে কেমন ক'রে জয় করা যায়?

মা সেই অভিজ্ঞতাই এখন আমার হচ্ছে।

দেহের এমন অবস্থা এসেছে যে সব কিছুই নির্ভর করছে ভগবানের সঙ্গে সে কেমনভাবে সংলগ্ন থাকে তারই উপরে—গ্রহিষ্ণু হয়ে সমর্পিত থাকার উপরে। এই কদিনে সেই অভিজ্ঞতাই হলো। সেই একই জিনিস যা অসহ্য বেদনা ও কষ্টের কারণ, অসহনীয় যন্ত্রণা, ভগবানের দিকে দেহটার গ্রহিষ্ণুতার একটুমাত্র পরিবর্তনেই সমস্ত হঠাৎ একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়—এমন কি একটা আনন্দময় অবস্থা এসে পড়ে। এ অভিজ্ঞতা অনেকবারই হয়েছে। আমার পক্ষে এ কেবল ঐকান্তিকতার তীব্রতার ব্যাপার—যে চেতনার মধ্যে সব কিছু ভগবানেরই ক্রিয়া, এবং তা অবস্থা অনুযায়ী স্থিতি উপলব্ধি এনে দেয়।

মনক বলব : দেহকোষগুলি যেন ভগবানে নির্ভর হতে শেখে আর এমন অবস্থায় আসে যাতে তারা বোধ করে যে তারা ভগবানেরই অভিব্যক্তি। এই হলো এখনকার অভিজ্ঞতা। ক্রিয়াফল বদ্‌লে যাবার অভিজ্ঞতা। কিন্তু মনে তা আসেনা, কারণ ভাষাতে তা ব্যক্ত করতে পারিনা। কোষগুলি কিন্তু অনুভব করছে যে প্রথমত তারা ভগবানেরই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (অর্থাৎ তুমিই যা চাও, তুমিই যা চাও...), আর দ্বিতীয় এক রকমের গ্রহিষ্ণুতা যা নিস্পন্দ (কি বলি?) অনড়, অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় গ্রহিষ্ণুতা (হাত খুলে হেসে) ঠিক বোঝাতে পারিনা। কথা বলা মিথ্যা। কিন্তু এটা বলা যায় দেহ বোধ করছে যে কেবল তুমিই আছো। ঠিক ঐরকম কথা। কিন্তু ভাষাতে বলতে গেলেই তা শক্ত হয়ে যায় অভিজ্ঞতায় কাঠিন্য আসে। আসলে ব্যাপারটি খুব নমনীয় ও সাবলীল : অর্থাৎ তোমার যেমন ইচ্ছা, তোমার যা খুশি...

(নীরব থেকে)

একজনকের মনোভাবে সবই হয় ভগবানময় (বলা যায়না), এ অভিজ্ঞতা অতি আশ্চর্য যে সব কিছুই ভগবান হয়ে যাচ্ছে, বিপরীত যা কিছু তা আপনা হতে অদৃশ্য হচ্ছে, দ্রুত অথবা মন্থরে, তৎক্ষণাৎ বা অল্পে অল্পে। এটাই আশ্চর্য কথা যে সব কিছুকে ভগবান বোধ করলে সব কিছুই ভগবান হয়ে যায়—আর তার বিপরীত সব কিছু মিলিয়ে যায়।

৩০ অক্টোবর, ১৯৭১

এমনি একটি বোধ আসছে যেন সৃষ্টির কি কারণ তা আমি জানি।

কথাটা হল এমন এক চেতনার ক্রিয়া যা একাধারে সামগ্রিক সর্বচেতনা ও সেই সঙ্গে বিশেষ ব্যক্তিচেতনা—আমাদেরই মতো—যে চেতনা (কেমন করে বলি) সর্বতোভাবে সর্বক্রিয়। এই দুই ভাবের চেতনা একত্রে এক জায়গাতে মিলে থাকে...সেই কথাই আমাদের জানা চাই। যে চেতনা একাধারে ব্যক্তিগত অথচ সর্বময়। এই দুই রকম চেতনাকে এক ক'রে একটিমাত্র বলে উপলব্ধি করাই এখন দরকার।

(নীরব থেকে)

আমাদের পক্ষে ওতে সময় নেবে বলে বোধ হয় (সময়ের মাপে আমরা দেখি), যেন "করা হচ্ছে", আর এবার তাই "করতে হবে"। এই তফাতের মোহ-মায়াতে আমরা আছি। তার কারণ...অপর পারে আমরা যাইনি।

কিন্তু ব্যক্তিচেতনা মিথ্যা নয়। তাকে সামগ্রিক চেতনার সঙ্গে এমন ভাবে মেলাতে হবে যেন তা একটাই হয়ে দাঁড়ায়, যা আমরা এখনও পারিনি। একটি অপরটিকে লুপ্ত করে নয়, দুই জিনিস মিলিয়ে দিয়ে...যাতে তার অভিব্যক্তি একত্রেই হয়।

যেমন, এ মুহূর্তে সৃষ্টিশক্তিকে ব্যক্তিচেতনাতেই নানাভাবে অনুভব করছি, অর্থাৎ দেখছি জানছি ও ইচ্ছা করছি যে ব্যক্তিচেতনার দ্বারাই এটি হচ্ছে। আমরা বলি "এমন হোক," কিন্তু সেটা মধ্যবর্তী চেতনার কথা, যা কোনটা হচ্ছে ও কোনটা হবে তা জানে।

কিন্তু সৃষ্টি হলো তার পরবর্তী রকম ক্রিয়ার ধাপ। তৎপরে...

তাই আমরা বলি ব্যক্তিচেতনা কাজ করছে, তাতে সময় লাগছে...কি যা বলি।

আমি যেমন বোধ করি তুমি এই নও, তুমি এখনও তাই নও, এটা ছেড়ে তুমি ওটা হবেনা—দুই মিলিয়ে একটা নতুন কিছু হবে।

এতে সব কিছুর ব্যাখ্যা হয়, সমস্ত কিছুর। কিছু বাদ যায়না। আমরা যতটা কল্পনা করতে পারি তার চেয়ে শতগুণ আশ্চর্য।

প্রশ্ন এই যে দেহ সে কথা জানবে কিনা। জানতে হলে একে টিকে থাকতেই হবে শুধু নয়, নতুন জীবন নিতে হবে। সে বিষয়ে আমি জানিনা। যাই হোক চেতনা কিন্তু পরিষ্কার জানছে, চেতনা দেহের উপর নির্ভর করেনা (দেহ দেখিয়ে)। এই দেহকে যদি সেই কাজে লাগানো যায় তো ভালো কথা নতুবা...এখনও অনেক কিছু জানবার আছে।

হাঁ, নতুন জানা চাই, পুরানোর ঝুটিন ফুরিয়ে গেছে।

জানতে হবে জড়ের নমনীয়তার কথা, যাতে উত্তরোত্তর সে বিকাশ পায়। এই কথা।

কত কাল লাগবে তা জানিনা। কত অভিজ্ঞতা চাই? জানিনা। কিন্তু পথ পরিষ্কার। রাস্তা পরিষ্কার।

১৭ নভেম্বর, ১৯৭১

অতি আশ্চর্য! সব জিনিসটা বদ্‌লে গেল...আর ভুলেও গেলাম।

ভক্ত: বদ্‌লে গিয়ে কি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এলো?

মা (নীরব থেকে পরে হেসে) চেতনা যেন সকল বিষয়ে একই জায়গাতে ছিলনা, ঠিক বলতে পারিনা। কিন্তু সবই হলো আলাদা রকম।

(নীরব থেকে)

কেমন করে বোঝাই। সাধারণ মানব চেতনা যতই উদার হোক, তা থাকে কেন্দ্রগত আর চারদিক থেকে সব সেখানে ঘিরে আসে (মাকড়সার জালের মতো ইঙ্গিত)। সব কিছু হয় কেন্দ্রাভিমুখী, অথচ এই জিনিস যেন ইতস্তত আলাদা আলাদা ছড়ানো (ঐরূপ ইঙ্গিত)। সাধারণ মানব চেতনা থাকে একটা বিন্দুতে, তারই অভিমুখে যায় সব কিছু (মাকড়সার জালের ইঙ্গিত), কিন্তু এখানে আর সে বিন্দুটি নয়, সব আলাদা আলাদা নিজস্ব।

এই কথা বলাই ঠিক হবে। আমার চেতনা এখন সব বিন্দুর মধ্যে, সে কিছু আর গ্রহণ করেনা, এই পর্যন্ত বলতে পারি। তার মানে তা এমন কিছুর মধ্যে যা রয়েছে সমস্ত কিছুর মধ্যে এবং তা সমস্ত কিছুকে চালাচ্ছে। এটি ভাষাতে বলতে হলে বলতে পারি—এ আর কোনো বিশেষ সত্তা নয়, এ "সব কিছুর ভিতরকার ভগবান"। কিন্তু ঠিক তাই নয়, বরং "সব কিছুর মধ্যে যা চেতন থেকে চালাচ্ছে।" চেতনারই কথা বটে, কিন্তু মানুষের সাধারণ চেতনা সে জিনিস নয়। সে চেতনার গুণই অন্যরকম ভাবে বদলানো।

১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭১

শ্রীঅরবিন্দ লিখছেন যে পৃথিবীতে অতিমানসের অভিব্যক্তি হবে দেহগত মনের মধ্যে—দেহাশ্রিত মনে, যা এখন আমার রয়েছে। এ অংশটার অস্তিত্ব তাই আমার কাছে এখন পরিষ্কার। এটা তাড়াতাড়ি পরিবর্তন নিচ্ছে। অতিমানসের প্রভাবে শারীর মানস বিকশিত হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ তাই লিখেছেন যে অতিমানসের পৃথিবীতে স্থায়ীভাবে অভিব্যক্ত হবার পক্ষে এটা অপরিহার্য।

কাজ ভালই চলছে...কিন্তু ব্যাপার সহজ নয় (মা হাসলেন)।

ভক্ত ঐ প্রশ্নই আমি নিজেকে করেছি, কারণ আমি দেখেছি যে চেতনার অবস্থার পুরোপুরি বদল ও দৃষ্টিভঙ্গীর বদল ছাড়া অমন রূপান্তর আসা সম্ভব নয়।

মা হাঁ।

ভক্ত যতক্ষণ কেউ বস্তুকে ও ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ আলাদা চোখে না দেখছে।

মা হাঁ, হাঁ।

ভক্ত: তাই প্রশ্ন হল যে কেমন ক'রে তা সম্ভব হতে পারে?

মা ঠিক এইরকম ভাবেই সম্ভব।

ভক্ত আগাগোড়াই বদ্‌লে যাওয়া চাই।

মা তাই তো হচ্ছে গো ছেলে। অন্যরকম ভেবোনা...আমি বলতে পারি যে আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি। কেবল এই দেহটাই (দেখিয়ে) যেমন ছিল তেমনি আছে।...

এর কতখানি বদল হবে? শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে দেহগত মনের রূপান্তর হলে দেহেরও রূপান্তর আপনা হতেই হবে। দেখা যাক।

ভক্ত কিন্তু এমন আমূল পরিবর্তন সম্বন্ধে আমাকে কিছু হদিস দিতে পারেন?

মা না, তা আমি জানি না, কারণ আমার বেলাতে সব কিছু সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মন তো ছেড়ে চলে গেছে। বাইরের থেকে বলতে পারো যে আমি বুদ্ধিহীন হয়ে গেছি, কিছুই জানি না। আর দেহগত মন অল্প অল্প উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। আমার বেলাতে যেন এটি ক'রে দেওয়া হচ্ছে—আমি নিজে কিছু করিনি। আগাগোড়া সবই করে দেওয়া হচ্ছে।

তাই হয়েছে কারণ আগে আমি চৈত্য সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলাম (যে চৈত্য তৈরি হয়েছিল বহু জন্মের ভিতর দিয়ে)। ঐ চৈত্যই আমার মধ্যে সজাগ ছিল। জাগ্রত থেকে সে সকলের সঙ্গে সমান আচরণ করেছে, তাই বাহ্য পরিবর্তন কিছু হয়নি। এখন

বলতে পারি চৈত্য সত্তা যাকে থেকে সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে, তাহলে দেহমানস সত্তা রূপান্তরিত হবার সময় পাবে। আসল মন তো ছেড়ে চলে গেছে।

অতএব দেহমানসের রূপান্তর হওয়া অপরিহার্য ছিল, কারণ আমি তা ছাড়া অন্য কিছু নই, বুঝতে পারলে? খুব কম লোকই এটা মেনে নেবে। (হেসে) আমার বেলাতে আমার কোনো মতামত না নিয়েই এটা করা হচ্ছে। অতি সহজে এই ব্যাপার ঘটছে।

ভক্ত: আমি ওর চেয়ে বাস্তব কিছু চাইব...

মা (হেসে) কিন্তু আমার যা হচ্ছে তা কি তুমি মেনে নেবে, অর্থাৎ তোমার বাক্তিত্ব বোধটির বুদ্ধিহীন হয়ে থাকা?

ভক্ত আমি প্রস্তুত।

মা এতে তুমি হতাশ হবে না?

ভক্ত না, না, না।

মা তাহলে সব কিছু সোজা হয়ে যায় স্থায়ী ভাবে। ব্যক্তিত্ব গেলে ব্যক্তির ক্ষমতাও চলে গেল। ঝাড়া হাত পা শিশুর মতো হয়ে গেলে। ভগবানকে বললে, "তুমিই আমার হয়ে সব কিছু ক'রে দাও (আমি নিজে কিছুই পারিনা!) আর তখনই সব ঠিক হয়ে যাবে।

দেহ নিজেকে ছেড়েই দিয়েছে, এমন কি ভগবানের কাছে সে বলেছে, "যদি মরবার হয় তবে দেহনাশের ইচ্ছা এনে দাও" যাতে মৃত্যুকে আমি প্রতিরোধ না করি, বিনাশেরই ইচ্ছা করি। এই হলো এ দেহের মনোভাব (দেহের দিকে ইঙ্গিত)। তার বদলে যে কথা শোনা হলো (কথা নয়, আমি তা কথাতে তর্জমা করছি) তা এই, "তুমি যদি ব্যথা ব্যাধিগুলো মেনে নাও তাহলে বিনাশের বদলে রূপান্তর হওয়াই ভালো।" দেহ তাই ব্যথা ব্যাধিকে মেনে নিলে।

ঠিক তা নয়। ঠিক কথাটা বুঝিয়ে বলা কঠিন। তবে এ একটা নতুন রকম মনোভাব, নতুন অনুভূতি। বলবার মতো নয়।

বস্তুত প্রত্যেকের পক্ষেই আলাদা কথা। আমার পক্ষে এই ছিল বাস্তব—আমার বেছে নেবার কিছু ছিল না। যা হয়েছে তা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবিকই এই দরকার; এবং তা সহজ হয়েছে চৈত্য সত্তা পুরো সামনে থেকে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করাতে। ধীরে সুস্থে বিনা কোনো বাধাতে তাই করা হচ্ছে।

যেমন দেখা শোনার বেলাতে। সে বিষয়ে ক্ষমতা কমে যাওয়া নয়, কারণ লোকে যা বলতে চায় তা স্পষ্ট ক'রে ভাবলে বুঝি ও শুনতে পাই। আমি দেখতে পাই যা আভ্যন্তর জিনিসকে প্রকাশ করে...নতুবা তা অস্পষ্ট। চোখ যে দেখছে না তা নয়, কিন্তু অন্য কিছু। অর্থাৎ সব কিছুই নতুন রকম।

(নীরব থেকে)

বস্তুত দেহের সদিচ্ছা থাকা দরকার—তা আমার আছে। মনের নয়, দেহেরই সদিচ্ছা। সব অসুবিধা সে মেনে নিয়েছে...কিন্তু তার ভাবটাই আসল, তার ফলটা নয়। অসুবিধা অপরিহার্য তা জানি। ভাবটাই কিন্তু আসল (হাত খুলে দেখালেন)। আমি দেখেছি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভগবানে সমর্পণ মানে ভগবানের উপর আস্থা এমন নাও হতে পারে, কারণ সেখানে তুমি বলো, "তুমি যদি কষ্টও দাও তবু আমি নিজেকে সমর্পণ করছি." এখানে আস্থা রইল না! আশ্চর্য বটে; কিন্তু আস্থা মানে অন্য কিছু, নিতান্ত "অটুট" ভাবে জানা যে ক্ষয় ক্ষতি আমার কিছুই হবে না—আমরা নিজেরাই ভগবৎ চেতনার ভিতর থেকে কষ্ট-দুঃখ টেনে আনি...শান্তি দরকার, অনাবিল শান্তি। সেই রকম রূপান্তর আনবার নিয়ে আসি।

এর অনেক দৃষ্টান্ত নিয়েছে...বলতে অনেক ঘন্টা লেগে যাবে।

চেতনারই বদল চাই, এমন কি কোষগুলির চেতনার। বুঝেছ? বাস্তব রকমের বদল।

তা বোঝাবার ভাষা নেই, কারণ পৃথিবীতে সে জিনিস অভিব্যক্ত হয়নি, তা অনভিব্যক্ত। কথা সবই পাশ কাটিয়ে যায়, ঠিক বলা হয় না।

(নীরব থেকে)

বলতে পারো যে প্রতি মিনিটে তুমি মনে করছ তুমি বাঁচবে কি তুমি মরবে (এদিক ওদিক দুদিকে হাত নাড়লেন), কিংবা তুমি চিরন্তন বাঁচবে। প্রতি মিনিটে দুই ভাবের মধ্যে তাই হচ্ছে কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে বুঝতেই পারোনা, আর বলতেও পারোনা যে এই করো তো এদিক আর ঐ করো ওদিক হবে। তা সম্ভব নয়। অবস্থাটা অবর্ণনীয়।

২২ ডিসেম্বর ১৯৭১

শ্রীঅরবিন্দের একটি চিঠি আমাকে শোনানো হয়েছে যাতে তিনি বলছেন যে অতিমানসের স্থায়ী অবস্থানের জন্য তার দেহমানসে অধিষ্ঠিত হওয়া দরকার (অতিমানস শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে এসেছিল কিন্তু বারবার এসেই বার বার চলে গেছে, স্থায়ী হয়নি)। সেই কাজটাই আমার মধ্যে হচ্ছে মাসের পর মাস; মন সরে গেছে, দেহগত মন তার স্থান নিয়েছে, কিছুকাল আগের থেকেই তা লক্ষ্য করছি (আগেই বলেছি যে সমস্ত কিছু আমি ভিন্নরকম ভাবে দেখছি)। আমি লক্ষ্য করছি যে এই দেহগত মন যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছে, সে সর্বাত্মক ভাবে পুরো অন্যরকম ভাবে সব কিছু দেখছে। তাই দেখলাম যে অতিমানসের কাজ এখানে হচ্ছে। অসাধারণ সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে কাজ চলেছে।

কেবলই যা হচ্ছে তা বাধা (আগেই বলেছি)। প্রতি মুহূর্তে এই ভাব—তুমি মরতে চাও, তুমি বাঁচতে চাও? মরতে চাও, বাঁচতে চাও? প্রতি মুহূর্তে তীব্রতর।

আর জীবন মানে ভগবানের সঙ্গে মিলন আর চেতনার নতুনত্ব। এদিক আর ওদিক (ওঁরা করলেন)। গতকাল কিংবা পরশু হঠাৎ দেহটা বলে উঠল না, থাকো, আমি জীবনই চাই, আর কিছুনা। ওর পর থেকে সব ভালো চলছে।

ওঃ! যা হচ্ছে তার বর্ণনা করলে অনেক বই লেখা দরকার হবে—এমনই সব কিছু নূতন ও অসাধারণ। সমস্তই আগাগোড়া নূতন।

(মা গভীর ভাবে নিমগ্ন হলেন)

দেহমৃত্যুর প্রয়োজনে অবচেতনা হলো পরাজয়বাদী। অবচেতনা বলে যে উন্নতি যতই কেন হোক, প্রয়াস যতই করো, শেষ পর্যন্ত যে তাই, যেহেতু আজও পর্যন্ত তাই হয়ে আসছে। সুতরাং কাজ হবে যাতে অবচেতনের মধ্যেও রূপান্তরের নিশ্চয়তা প্রবেশ করে। সেই সংগ্রাম চলেছে প্রতি মুহূর্তে।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৭১

আজ হলো আলোর উৎসব—নোয়েল, অর্থাৎ জগতে আলো ফিরে আসার উৎসব, এটি ক্রিশ্চান ধর্মের চেয়েও অনেক বেশি প্রাচীন।

আর আসছে শনিবার হবে পয়লা জানুয়ারি।

ভক্ত: আশা করি ১৯৭২ সাল ভালোই হবে?

মা: (মাথা নেড়ে) আমার উত্তরোত্তর এই বিশ্বাস হচ্ছে যে আমরা যে ভাবে সব কিছুর প্রতিক্রিয়া ঘটাই তাতেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। আমি যা দেখছি তাতে বাস্তবভাবে সন্তোষজনক জিনিস হয়না। তুমি মন পাও আর না পাও সব কিছুই ঠিক ভাবে বদ্‌লে যায় যদি নিজের দিকে বা সবকিছুর দিকে না চেয়ে কেবল ভগবানেরই দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়; তা করতে পারলে কোনোদিকেই গণ্ডগোল থাকেনা। অভিজ্ঞতা এই যে জিনিসটা মূলতঃ ভালোই আসে কিন্তু আমাদের প্রতিক্রিয়াতে তার তফাৎ হয়ে যায়, উত্তরোত্তর সেই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে। তিনটি ব্যাপার এখানে রয়েছে: আসল ঘটনাটা, তার প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা, আর তৃতীয় যেখানে সব কিছু ভগবৎ চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত—তাতেই সব কিছু আশ্চর্য রকমে সহজ হয়ে যায়। আমি বাস্তবের কথা, বাস্তব জীবনের কথা বলছি, যেমন, দেহের এই সব ছোটোখাটো অসুবিধার কথা, তার প্রতিক্রিয়া, ব্যথা পাওয়া কিংবা না পাওয়া, বন্ধ অবস্থা ঘটা, গিলতে না পারা, যে সব জিনিসকে জোয়ান অবস্থাতে গ্রাহ্যই হোতোনা,—সকলের বেলাতেই তাই। কিন্তু দেহচেতনার মধ্যে অবস্থান করলে, কখন কি হচ্ছে তাই দেখতে থাকলে—ওঃ—সে এক দুর্ভোগ। কিন্তু যদি ভগবৎ উপস্থিতির মধ্যে থাকো, তিনিই দেখছেন, তিনিই সব কিছু করছেন, তখন কেবল শান্তি, শান্তি, সময়ের কোনো দীর্ঘতা আর নেই, সব কিছুই সহজ—তুমি যে কেবল আনন্দ পাও তাও নয়...শুধুই এই যে তিনি রয়েছেন, তিনিই

একমাত্র সর্বসমাধান। জগৎও ঐদিকেই চলেছে, ঐ ভগবৎ চেতনার দিকে—তিনিই কর্তা হয়ে করছেন, তিনিই আছেন,—এই যদি হয় তাহলে একই ঘটনা অন্য রকম—যেমন পরশু অসুস্থ ছিলাম, কালও তাই, দেহ একই ভাবে রইল অথচ সবই শান্তিতে।

এতেই সব কিছুর ব্যাখ্যা পাবে। জগৎ একই আছে—কেবল বিভিন্ন ও বিপরীত দৃষ্টিতে তাকে দেখা হয়। সবই চেতনার ক্রিয়া, কিন্তু এ চেতনা নয়, সে চেতনা নয়। নিজেদের চেতনার ভাবে দেখা, কিংবা ভগবৎ চেতনার ভাবে দেখা। এতেই সব কিছুর তফাৎ, এ বিষয়ে আমি একেবারে দৃঢ়নিশ্চয়।

ভক্ত জগৎ যেমন থাকবার প্রতি মুহূর্তে ঠিক তাই আছে।

মা হাঁ।

ভক্ত আমরাই কেবল ভুল চোখে দেখি, ভুল ভাবে নিয়ে থাকি।

মা যেমন মৃত্যু। তা একটা মধ্যবর্তের অবস্থা, কিন্তু আমাদের কাছে ওটা বরাবরই মৃত্যু, কারণ আমাদের চেতনাই তেমনি ; কিন্তু যদি তুমি ভগবৎ চেতনা পাও—ওঃ! তাহলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত বুঝে ফেলবে। এ আমি বোঝাতে পারব না।

একটা গতি একটা অগ্রগতি, আমাদের পক্ষে সময়ের অনুপাতে...কিন্তু রয়েছে তা চেতনার মধ্যে...বুঝিয়ে বলা কঠিন...যেন ছবিটা গড়িয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে আসছে। সবই ঠিক করা আছে, আমাদের কাছে যেন তা পর্দার উপরে ক্রমশ বেরিয়ে আসতে দেখছি, ধারাবাহিক ক্রমে, কতকটা সেই ধরনের।

ভক্ত হাঁ, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে অতিমানস চেতনাতে সমস্ত ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান একত্রে আছে পাশাপাশি, চেতনার যেন একটাই নকসার মধ্যে।

মা হাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই। কিন্তু আমার কাছে সেটাই অনুভূতি। আমি যে তাই "ভাবছি" এমন নয় (আমি তো ভাবিই না) কিন্তু শুধু অনুভব করি, আর সে কথাটা বুঝিয়ে বলা কঠিন।

আর ওর যা ফল হয় আমাদের কাছে তা আমাদের চেতনার অবস্থার উপর নির্ভর করে। চেতনা নিজের মধ্যে থাকা ও সবের মধ্যে থাকা (আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকার চেয়ে তা ভালো, কিন্তু তাও সত্য নয়, তার মধ্যেও দোষগুণ আছে)—সত্য যা তা হলো—সমস্ত গোটাটাই ভগবান, দেশ কাল সমেত, আর দেহ তেমন চেতনাই পেতে পারে। এই দেহটা সেই চেতনাই পেয়েছে (মুহূর্তে মুহূর্তে), আর তখন সব কিছুতে...সুখ নয়, ফূর্তি নয়, আনন্দ নয়...একটা পরমানন্দ শান্তি...যা জ্যোতির্ময় সৃজনকারী...অনবদ্য। তবে তা আসে আর যায়, আসে আর যায়,...আর ওর থেকে বেরিয়ে এলেই সাধারণ মানুষী চেতনার অন্ধকার গর্তের মধ্যে এসে পড়ি। কিন্তু তুমি জানবে যে এটা কেন হয়, মুহূর্তের

পরিবর্তনে একটা থেকে অন্যটাতে চলে যাওয়া—এরও দরকার আছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য উদ্‌ঘাটনের জন্য। সে উদ্দেশ্য হলো সৃষ্ট জনেরা স্রষ্টার মতোই চেতন হোক। এই দিক দিয়েই হলো সকল কথা। সৃষ্টির লক্ষ্য হলো সেই চেতনা আসা, সেই তিনি যিনি অসীম, চিরন্তন, সর্বশক্তিমান (ধর্মবাদীরা যাকে বলে ভগবান); আমরা বলি যে সেই চেতনাই ভগবান অসীম, চিরন্তন, সর্বশক্তিমান, কালাতীত। অথচ প্রতিটি ব্যক্তিবিন্দু সেই চেতনার অধিকারী, সেই একই মাত্র চেতনার।

বিভাজনের ধারাই জগতের সৃষ্টি, আর বিচিত্র বিভক্তির মধ্যেই শাশ্বতের বিকাশ। আমাদের ভাষা সে জিনিস বুঝিয়ে বলতে অক্ষম। পরে একদিন তা বলতে পারব। কিন্তু একটা হচ্ছেই—সে কথা জেনে রাখো (মা হাসলেন)।

শুভ নোয়েল্ ('ক্রিসমাস') গো ছেলে—জ্যোতির উৎসব।*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কঠিন ডানায় ওড়া

বীরবাহু

নারসিসাস্ ফুলের ভারতীয় নাম নার্গিশ। 'চশমা'র ধারে ধারে নারসিসাস্-এর কন্দগুলি ভুঁই-চাঁপার কন্দগুলির মত একত্রে জড়াজড়ি করিয়া থাকে। খরার সময় অল্প আর্দ্র মাটির মধ্যে কন্দগুলি ঘুমাইয়া থাকে। শীতের প্রাক্‌কালে প্রত্যেক কন্দ হইতে একটা করিয়া কাণ্ড বাহির হয়। কাণ্ড অনেকটা রজনীগন্ধার কাণ্ডের মত, কিন্তু আকারে অনেক ক্ষুদ্র। প্রত্যেক কাণ্ডের শেষে রজনীগন্ধার গুচ্ছের মত নার্গিশ ফলের এক গুচ্ছ।

ফুলগুলি দেখিতে খুব সুন্দর। অনেকটা রজনীগন্ধারই মত, শুভ্র ফুল, ফুলের মধ্য-ভাগ কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ। কিন্তু কি মিষ্টি গন্ধ! 'চশমা'র আসে-পাশের সমস্ত এলাকা সুগন্ধে মধুর হইয়া যায়। পুরাকালের গ্রীক গল্পের নারসিসাসের মত; যেন 'চশমার' আপনার নিজের প্রকৃতি দেখিয়া নিজের প্রেমে নিজেই মশগুল হইয়া গিয়াছে। চশমার ধারে ধারে আপনার আনন্দে আপনি আত্মহারা নারসিসাসের সম্পূর্ণ গুণকীর্তন করা সম্ভব নয়।

এইবার স্কোয়াড্রনের বৈমানিকরা একদিন সকলেই আসিয়া পৌঁছাইল। আসিল স্পেশাল ট্রেন। কোন বিমানই সাথে আসিল না। বিমানহীন বিমান-বহর। তখন শুরু হইল পুরাদমে পি, টি, (Physical training) এবং প্যারেড্।

দিনগুলি তখনও বেশ আরামের। শীতের রেশ বেশ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু অধিক শীতে কাবু হওয়ার আশঙ্কা নাই। জল-বায়ু আবহাওয়া বেশ উপভোগ করার মত। এই ত পি, টি, আর প্যারেড্ করার উপযুক্ত সময়। প্রত্যেক দিন অতি প্রত্যুষে পি, টি, করার পর প্রাতরাশ। প্রাতরাশের পরে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবসানে ঘন্টা দুয়েকের মত প্যারেড্। আবার বৈকালে কোন কোন দিন শুধু প্যারেড আবার কখনও অস্ত্র-চালনা শিক্ষা। এবার স্বাস্থ্যের উন্নতি স্থির নিশ্চয়—স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ার আর কোন সম্ভাবনাও রহিল না।

আমাদের স্কোয়াড্রনের সকল বৈমানিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে দেখিয়া সমংগ্লী বিমানবন্দরের পুরাতন বাসিন্দারা অর্থাৎ গোরারা বেশ বিচলিত হইয়া পড়িলেন। বিচলিত হইয়া পড়ার যথেষ্ট কারণ বর্তমান ছিল।

বিলাতী রাজকীয়-বিমান-বাহিনীর যে পঁচিশ ত্রিশ জন বৈমানিক সমংগ্লী বিমান-বন্দরের ছাউনিতে পরম আরামে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাঁহাদেকে প্রত্যেক দিন কেন, বৎসরের মধ্যে একদিন পর্য্যন্ত, পি, টি বা প্যারেড্ করিতে হয় নাই। আর কোথা হইতে এক 'নেটিভ' বৈমানিকের দল আসিয়া তাহাদের নিশ্চিন্ত আরামে ব্যাঘাত ঘটাইবে? তাহারা ঐখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবেই জীবন যাপন করিতেছিলেন। সকালে যখন ইচ্ছা শয্যা

ত্যাগ, যখন ইচ্ছা করণে (office) গমন, যখন ইচ্ছা করণ হইতে বাসস্থানে আগমন, সর্ব্বকার্য্যই সম্পূর্ণ নিজের স্বাধীন ইচ্ছার অধীন। সেইজন্য আমাদের স্কোয়াড্রনের বৈমানিকদের বিনয় ও নিয়মানুবর্ত্তিতা তাহাদের পক্ষে সাধারণভাবেও বরদাস্ত করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

পি, টি, ও প্যারেড্ আমরা শুরু করিতেই তাহারা খুব বরসহকারে আমাদের সাথে মেলা-মেশা বন্ধ করিলেন এবং সব সময় দূরে রাখিয়া চলিতে শুরু করিলেন, যেন আমাদের বিনয় এবং নিয়মানুবর্ত্তিতা এক দুরারোগ্য অশুচি ব্যাধি আর এই অশুচি ব্যাধির স্পর্শ তাহাদের দেহে লাগিলে তাহাদেরও অগত্যা পি,টি, ও প্যারেড আরম্ভ করিতে হইবে: আর পিটি এবং প্যারেড্ করিলে তাহাদের দেহে অকারণ নানা ব্যাধির সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।

আমাদের স্কোয়াড্রনে ডাক্তার ফ্ল্যাইট লেফ্‌টেনান্ট দাশ ছিলেন স্বাস্থ্য-বিভাগের আধিকারিক। আমাদের স্কোয়াড্রনের কয়েকজন, গোরাদের প্ররোচনায়, তাঁহার নিকট গিয়া পি, টি, ও প্যারেড হইতে অব্যাহতি লাভ করার জন্য আবেদন করিল। পি, টি, ও প্যারেড হইতে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাহারা ওজুহাত দিল যে পি, টি, করায় তাহাদের অত্যধিক পরিশ্রম হইতেছে এবং সেই পরিশ্রমে তাহাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিয়াছে। ডাক্তার ফ্ল্যাইট লেফ্‌টেনান্ট দাশ কিন্তু উল্টা বুঝিলেন, এবং তাঁহার প্রতিক্রিয়াতে ফল প্রায় উল্টা হওয়ার উপক্রম হইল। কেননা ডাক্তার দাশ সরাসরি গোরা ষ্টেশন কমাণ্ডারের নিকট উপস্থিত হইয়া সংশ্লিষ্ট বিমান-বন্দরে উপস্থিত সমস্ত বৈমানিকদের জন্যই পি টি ও প্যারেড শুরু করার জন্য ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিলেন।

পি, টি, এবং প্যারেড্ ছাড়া আরও একটি কারণে গোরা বৈমানিকরা আমাদের স্কোয়াড্রনের বৈমানিদের উপর রুষ্ট হইলেন। এখন বিমানবন্দরের ছাউনিতে বৈমানিকদের সংখ্যা পূর্ব্বের তুলনায় অনেক গুণ বেশী হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য এখন কোয়েটা সহরে 'লিবার্টি' রান (অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদ করিতে যাওয়ার জন্য যানের বিশেষ বন্দোবস্ত) নূতন ব্যবস্থায় শুরু হইল। এখন আর যখন ইচ্ছা গাড়ী লইয়া গমন অথবা যখন ইচ্ছা তখন ছাউনিতে ফিরিয়া আসা রহিত হইয়া গেল। এখন লিবার্টি রানে আমোদ করিতে যাইতে হইলে প্রথমে 'করণ' হইতে লিখিত অনুমতি লইতে হইত এবং যাওয়ার সময় এবং ফিরিয়া আসিলে আরক্ষী বৈমানিকদের ঘরে আরক্ষী বৈমানিকদের অধ্যক্ষকে সেই লিখিত অনুমতি দেখাইয়া তাহার সহি লইতে হইত। বিমান-বাহিনীর সব ছাউনিতেই আমোদ-প্রমোদ করিতে কোন সহরে যাইতে হইলে এইরূপ ব্যবস্থাই চালু ছিল। এখানে এটা কথা বলা অসঙ্গত হইবে না যে বিমান-বাহিনীর বৈমানিকদের বাসোপযোগী ছাউনি কখনও সহরের নিকট, স্থাপন করা হয় না। সহরের নিকট স্থাপন না-করার নানা কারণ আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বৈমানিকদের প্রত্যেক পক্ষকালে একবার করিয়া সহরে গিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়। পক্ষকাল ধরিয়া

ছাউনির মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের দম যখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম তখন তাহাদের কিছুক্ষণের জন্য ছাউনির বাহিরে গিয়া এই পক্ষকালে অর্জিত অতিরিক্ত শক্তি কিছুটা হ্রাস করিতে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। সেই জন্য তাহাদের অনুমতি লইতে হইত অন্ততঃ তিন-চার দিন পূর্বে এবং ছাউনি হইতে নিষ্ক্রমণ এবং ছাউনিতে পুনরাগমনের সময় ছাউনির বৈমানিক রক্ষীদলের নিকট সেই অনুমতি দর্শাইবার রীতি বহুকাল হইতেই বিমান বহরে প্রচলিত আছে।

নূতন ব্যবস্থায় এখন প্রত্যহই একখানা করিয়া যান সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ছাউনি হইতে রওনা হইয়া যাইত এবং মধ্যরাত্রির পূর্বেই ফিরিয়া আসত। এই ব্যবস্থা গোরা বৈমানিকদের পক্ষে বিশেষ পীড়াদায়ক হইল।

চামান সহর কোয়েটা হইতে বেশী দূরে নয়। তখনকার দিনে গাড়ী ছাড়িয়া যাইত সকালে এবং প্রত্যাবর্তন করিত সন্ধ্যার পর।

সারা অর্খাৎ অখণ্ডিত ভারতবর্ষে তখন আঙ্গুর বলিতে চামান হইতে আনীত আঙ্গুরই বুঝাইত। সাধারণতঃ প্রথমে আঙ্গুর গাড়ী বোঝাই হইয়া পৌঁছিত কোয়েটা সহরে এবং সেখান হইতে নানা স্থানে চালান হইত। চামানে আঙ্গুরের সুফলন হইলে সারা ভারতবর্ষে ফেরিওয়ালারা সস্তায় আঙ্গুর বিক্রয় করিত আর সুফলন না হইলে দুর্মূল্যে ফলের দোকান হইতে আঙ্গুর ক্রয় করিতে হইত।

এখন খণ্ডিত ভারতের নানা স্থানেই প্রচুর পরিমাণ আঙ্গুরের ফলন হইতেছে, এবং আঙ্গুর-উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলির মধ্যে ভারতও গণ্য হইয়াছে।

সপ্তাহান্তে একদিন ছুটি লইয়া আমরা কয়েকজন বৈমানিক চামান দর্শনে গেলাম। কোয়েটার তুলনায় চামান সহর কিছুই নয়। কোয়েটা এবং চামান সহরের গঠন একই প্রকার। এই দুই স্থানের আসল পার্থক্য হইল ফসলের উৎপাদনে। কোয়েটায় যেখানে 'চশমা' অর্খাৎ জল সেখানে আর তার আসেপাশে, গমের ক্ষেত বা শাকশব্জি বা ঐজাতীয় কোন ফসল উৎপন্ন হইত। হয়ত সামান্য কিছু আঙ্গুরও ফলিত। কিন্তু চামানে চতুর্দিকে শুধু আঙ্গুর আর আঙ্গুর। আর কত বিভিন্ন প্রকারের, কত ভিন্ন স্বাদের আর আকারের আর বর্ণের আর গন্ধের।

ও দেশের চাষীদের মধ্যে "রেওয়াজ" আছে যে, যদি কোন আগন্তুক বাগানে ফল দেখিতে আসেন, তখন বাগানের মালিক আগন্তুককে বাগানে বসিয়া স্বাদ গ্রহণ করার জন্য যত ফল,—এ ক্ষেত্রে আঙ্গুর ফল—প্রয়োজন সমস্তই বিনা দ্বিধায় নিজ হাতে দেয়। এ দেওয়াতে কোন কার্পণ্য নাই। উপরন্তু এই ফল গ্রহণে যদি কোন অতিথি আগ্রহ প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে বাগানের মালিক নিশ্চয়ই অপমান বোধ করেন।

আঙ্গুর ফলের বাগান না বলিয়া আঙ্গুর-ফলের ক্ষেত বলাই শ্রেয়, আর যে ক্ষেতেই আমরা সেদিন গেলাম সেখানেই মালিক নিজ হাতে সুপক্ক ও সুগঠিত ফল, লতা হইতে তুলিয়া যত্ন সহকারে আমাদের হাতে তুলিয়া দিলেন। আমরাও বিনা দ্বিধায় সেই সুপক্ক

সুগঠিত সুমিষ্ট সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ বিনষ্ট না করিয়া গ্রহণ করিলাম। কয়েকটা বাগান দেখিতে দেখিতেই আমাদের ক্ষুধা মন্দ হইয়া আসিল। যে আঙ্গুর ফলের জন্য এত লোভ, সেই আঙ্গুর ফলের জন্য বিতৃষ্ণা না হইলেও তখনকার মত লোভ নিঃশেষ হইয়া গেল। সেদিন আর অন্য কোনও খাদ্যগ্রহণ করার প্রয়োজন রহিল না।

সারাদিন বাগানে বাগানে হৈ হৈ করিয়া ঘুরিতে ফিরিতে নিজেদের উপর নজর দেবার অবকাশ হয় নাই। সারাদিন আনন্দে আর উত্তেজনায় কাটিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় বিমান বন্দরের ছাউনিতে পৌঁছাইবার পর নিজ নিজ আবাসে যাওয়ার সময় একটা অদ্ভুত ভাব বোধে আসিল! হাঁটিবার সময় মনে হইল, পথ যেন দুলিয়া উঠিতেছে! যে পথ আগে সহজ-সোজা বলিয়া দেখিয়াছি, এখন যেন সে পথ একবার উঁচু হইয়াই নীচু হইয়া যাইতেছে; কখনও বা সোজা পথ হঠাৎ দক্ষিণে ঘুরিয়া গেল, এবং নিজে দক্ষিণ দিকে ঘুরিতেই পথ বামদিকে ঘুরিয়া গেল!! পথ বা আশেপাশের ঝোপঝাড় বা অন্যবস্তুগুলি এমনভাবে উপহাস পূর্বে করিয়াছে বলিয়া মনে পড়িল না! সোজা হইয়া পথ চলাও মুস্কিল হইয়া পড়িল। প্রতি পদক্ষেপেই পথের সাথে লড়াই করিতে করিতে উপলব্ধি হইল যে নিজেও টলিতেছি! কোনও প্রকারে নিজের ব্যারাক বাড়ীতে পৌঁছাইয়া টলিতে টলিতে গিয়া শয্যা গ্রহণ করিলাম। সেদিন রাত্রে শয্যা গ্রহণ করিতে করিতেই নিদ্রাদেবী আসিয়া আসিয়া সমস্ত ক্লান্তি অবসাদ মুক্ত করিয়া দিলেন। রাত্রি গভীর নিদ্রায় কাটিয়া গেল। পরদিন নিদ্রাভঙ্গ হইল অনেক বেলায়। তখন পারিপার্শ্বিক দুনিয়া শান্ত, পূর্বরাত্রের মত হেলিয়া দুলিয়া আর ঠাট্টা-তামাসা করিতেছে না।

সেদিন খুব শিক্ষা হইল। আঙ্গুর ফল্ পরিমিত আহারে স্বাস্থ্যের উন্নতি নিশ্চয়ই হয়, কিন্তু অপরিমিত আহারে কিঞ্চিৎ মাদকতা ত নিশ্চয়ই আসে উপরন্তু ভুক্তদ্রব্য সহজে জীর্ণ হয় না, এবং পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত ঘটায়।

একটা কথা বলা হয় নাই। সন্ধ্যাতে আমাদের স্কোয়াড্রনের বৈমানিকদের পৌঁছিবার পূর্বেই তাহাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, অর্থাৎ খাট, কেদারা, মেজ ইত্যাদি প্রত্যেক ব্যারাকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছিল এবং সাজাইয়া রাখার পর প্রত্যেক কামরা ভাল করিয়া বন্ধ করার পর কুলুপ লাগান হইয়াছিল। কুলুপগুলি বন্ধ করার পর কুলুপের একটা চাবি সামরিক যন্ত্রবিদ সংস্থার কর্ম্মকর্তার নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল। বৈমানিকরা বিমান বন্দরের ছাউনিতে পৌঁছাইবার পর, তাঁহারা তাঁহাদের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রগুলি নিজেরা মিলাইয়া বুঝিয়া লইতে লাগিল। মিলাইয়া লইতে গিয়া দেখা গেল যে আসবাব পত্রের সংখ্যা পুনরায় কমিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক ব্যারাকবাড়ী হইতেই এক নালিশ।

এদিকে স্কোয়াড্রনের বৈমানিকরা সকলে আসিয়া পড়িয়াছে; তাহাদের যাহাতে কোন অসুবিধায় না পড়িতে হয়, সেইজন্য সামরিক যন্ত্রবিদ সংস্থার কর্ম্মকর্তার নিকট উপস্থিত হইয়া এইবার বেশ অসংযত ভাষায় বক্তব্য শুরু করিয়া শেষ করিলাম। অসংযত ভাষা

সাধারণতঃ সকলে সহ্য করিতে পারে না। পরিণামে ফল উলটা হইয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ফল ভালই হইল। কর্ম্মকর্ত্তা নিজেই তুরন্ত আসিয়া পড়িলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া লইলেন। তারপর কোন আসবাব কত কম হইয়া গিয়াছে তাহার একটা লিখিত হিসাব লইয়া গেলেন। এবার ঘাটতি পূরণে আর বিলম্ব হইলনা। নূতন মেজ, কেদারা আর খাট আসিয়া হারাইয়া যাওয়া বস্তুগুলির স্থান অধিকার করিল। নূতন মেজ কেদারা আর খাট আসার পর যদিও আর কাহারও কিছু বলার রহিল না কিন্তু সকলেরই ধারণাতে বেশ স্পষ্ট হইয়াই ফুটিয়া উঠিল আসবাব পত্রগুলি কোন পথে অন্যত্র পৌঁছায়।

এর পর হইতে সামরিক যন্ত্রবিদ সংস্থার যে কোন ব্যক্তির সাথেই কথা বলিতে আমরা খুব সাবধান হইয়া চলিতাম।

দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে দিনগুলি কাটিয়া যাইতে ছিল। কাজ-কর্ম্ম পি, টি, আর প্যারেড্ ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। পি, টি, আর প্যারেডের পর দেহ ক্লান্ত থাকে এবং পরদিন অতি প্রত্যূষে সুখ-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পুনরায় পি, টি, করিতে হইবে, সেইজন্য কেহই দীর্ঘ রাত্রি পর্য্যন্ত মেসে বসিয়া বিশ্রামের সাথে আলাপ গল্পগুজব করিতে রাজি হইত না। অবস্থার বিপাকে পড়িয়া সবাইকেই বেশ ভাল মানুষ সাজিয়া থাকিতে হইতেছে।

এই নিশ্চিন্ত-আরামে ব্যাঘাত আসিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ একদিন একটি বিমান, যে সে বিমান নয়, একেবারে হারিকেন বিমান—নিঃশব্দে এবং পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়াই আমাদের ছাউনির উপর কয়েকবার ঘুরিয়া গেল এবং অবিলম্বে সমংগ্রী বিমান অবতরণ ক্ষেত্রে বিশেষ ওস্তাদের মত অবতরণ করিল। একে বহুদিন পর্য্যন্ত কোন বিমান আমাদের দর্শনে আসে নাই, তার উপর বিমান এমন নিঃশব্দে আসিয়া আমাদের বিমান ক্ষেত্রেই অবতরণ করিল যে আমরা বিমান-চালকের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলাম। তাঁহার বিমান-চালনার কৌশল এবং অবতরণের ভঙ্গি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে বিমান-চালক ভারতীয় বিমান-বহরের কোন ওস্তাদ বৈমানিক হইবেন। শুধু তাই নয়, তিনি আসিলেন নিঃশব্দে, বহুদূর হইতে বিমানের এঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিয়া যাহাতে আমরা বিমানের আগমন-বার্ত্তা জানিতে না পারি। আর বিমান অবতরণ করিলেন এমন সুন্দর সাইড্-স্লিপ করিয়া যে, যে দেখিল সেই বুঝিতে পারিল বিমান নিয়ন্ত্রণে বিমান-চালকের কি অসীম ক্ষমতা।

বিমানের গতি নম্বর হইয়া অবতরণ ক্ষেত্রের দিকে যাইতেই যে যেমন অবস্থায় ছিল, সেই অবস্থাতেই বিমান ক্ষেত্রের দিকে ছুটিল।

ইতিমধ্যে ভারতীয় বিমানবাহিনীর দুই নম্বর স্কোয়াড্রন কমাণ্ডার সিং বিমান-অবতরণ ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া বিমান ধীরে ধীরে আগাইয়া আনিয়া বিমান-বন্দরের নিয়ন্ত্রণ-মন্দিরের নিকট পেনে (pen) বিমান রাখিয়া, আমাদের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

হারিকেন বিমান চালনায় দক্ষতার জন্য তাঁহার খুব সুনাম ছিল। নিঃশব্দে শত্রু-বিমান-ঘাঁটির উপর কেমন করিয়া অতর্কিতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হয় সেই কৌশল, স্কোয়াড্রন লীডার সিংয়ের চাইতে ভাল অনেকেই জানিতেন না এবং সেই কৌশলের একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত তিনি আমাদের দেখাইলেন।

ছাউনি হইতে বিমান অবতরণ ক্ষেত্র বহুদূরে; তৎসত্ত্বেও অনেকেই বিমানক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিল। অবশ্য গোরা বৈমানিকরা ব্যতিরেকে। বিমান ভাল করিয়া রাখার পর স্কোয়াড্রন লীডার সিংকে আমাদের খানা-ঘরে লইয়া আসা হইল। প্রায় সমস্ত প্রশ্নই তিনি এড়াইয়া গেলেন, শুধু একথা-সেকথা বলিয়া আমাদের ধৈর্য্যের সীমার বাঁধ পরীক্ষা করার পর সংগঠনী বিমান ক্ষেত্রে তাঁহার আসিবার হেতু জানাইলেন।

ভারতীয় বিমান-বাহিনীর দুই নম্বর স্কোয়াড্রনের নিকটও সেই সময় হকার কম্পানীর হারিকেন বিমান ছিল এবং তাঁহার অধীন দুই নম্বর স্কোয়াড্রন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সেই সময় ফিরিয়া আসিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কোহাট বিমান বন্দরে বিশ্রাম করিতেছিল। ঐ এলাকার গ্রুপ হেড্-কোয়ার্টার পেশাবরে। আমরাও পেশাবর গ্রুপ হেড্-কোয়ার্টারেরই অধীন। কোহাট বিমান বন্দর ও পেশাবর বিমান বন্দরের মধ্যে দূরত্ব সামান্যই এবং দুই বিমান-বন্দর ও বৈমানিকদের জন্য ছাউনি কাঁটা-তার এবং উচ্চ দেওয়াল দিয়া বেষ্টিত। সেই জন্য তাঁহাদের হারিকেন বিমানগুলি তাঁহাদের স্কোয়াড্রনের সাথেই ছিল এবং পি, টি, ও প্যারেড্ তাঁহারাও কিছু কিছু করিতেছিলেন কিন্তু বিমানের সঙ্গ তাঁহাদের কখনও ছাড়িতে হয় নাই। প্রত্যহই কিছু না কিছু লইয়া উড়িয়া যাওয়ার ব্যবস্থা তাঁহাদের স্কোয়াড্রনে ছিল। সেই জন্য তাঁহারা বেড়াইবার উদ্দেশ্যে কখন কখন পেশাবরে উড়িয়া যাইতেন। এখন তিনি সরাসরি পেশাবর বিমান-ক্ষেত্র হইতেই আসিতেছেন।

পেশাবর গ্রুপ হেড্-কোয়ার্টার হইতে অদ্যই তিনি বিশেষ সংবাদ পাইয়াছেন। এবার ভারতীয় স্কোয়াড্রনগুলির মধ্যে সাত নম্বর স্কোয়াড্রনকে নূতন বিমান দেওয়া দিল্লীস্থিত বিমান-বাহিনীর হেড্-কোয়ার্টার সাব্যস্ত করিয়াছে। নূতন বিমানের নাম সুপার মেরাইন স্পিটফায়ার। স্পিটফায়ার কথার অর্থ হইল অগ্নি বর্ষণকারী। সত্যসত্যই স্পিট ফায়ার 'বাঘা' জঙ্গী বিমান।

আপনার সঞ্চয়

—তা যত অল্প
বা বেশি হোক না কেন
তার থেকে
আপনার আয়

আরও বাড়িয়ে তুলুন

UIB কয়েকটি পরিকল্পনা

৭¾% সুদ পেতে হ'লে ৩ বছরের অধিক মেয়াদী ফিক্সড্ ডিপোজিটে লগ্নী করুন।

প্রতি মাসে ১০৲ সঞ্চয় ক'রে ৭ বছর পরে ১০৯৫৲ রেকারিং ডিপোজিট এ্যাকাউন্ট খুলে পেতে পারেন।

১০০৲ টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনলে ২০ বছর পরে ৪২৫৲ টাকা পাবেন।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৭, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা-১৩
টেলিফোন : ২৩-১৭৮৪ (৩ লাইন)

Progressive/UIB-13/FB

COMPLETE WORKS
OF
SRI AUROBINDO

Centenary Volumes

De Luxe *Rs. 1000.00*
Popular *Rs. 750.00*

SRI AUROBINDO ASHRAM PRESS

PHONE : 47-2869

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX Phone : 556735

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

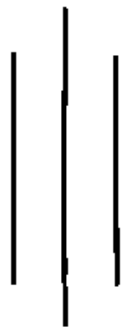

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

Phone : 34-2665 Gram : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে
শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড :	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

Statement about ownership and other particulars about Newspaper (Vartika) to be published in the first issue every year after last day of February

FORM IV (*See Rule.* 8)

1.	Place of Publication	Pondicherry
2.	Periodicity of its publication:	Quarterly
3.	Printer's Name:	Amiyo Ranjan Ganguli
	Nationality	Indian
	Address	Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry-2.
	Publisher's Name:	H. K. Niyogi
	Nationality	Indian
	Address	Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2
5.	Editor's Name:	Nolini Kanta Gupta
	Nationality	Indian
	Address	Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry-2
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital	Sri Aurobindo Ashram Trust Pondicherry-2

I, H. K. Niyogi, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date: 24th April, 1966

H. K. Niyogi
Signature of Publisher

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

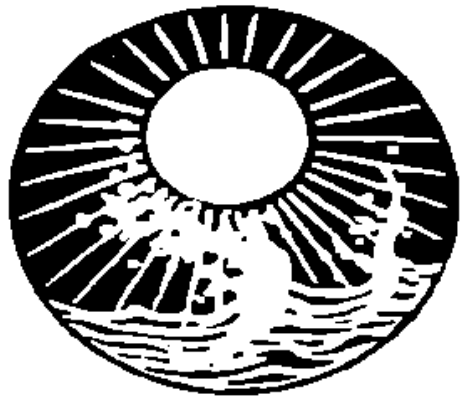

শ্রীঅরবিন্দ-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা

১৫ই আগষ্ট, ১৯৭২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(শ্রীঅরবিন্দ-জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শতাব্দীর প্রণাম	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
সাবিত্রী	...
ঋগ্বেদ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
সোনার খোঁচে	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের চিত্রাকণা ও চুম্বকবাণী	
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
পথের কথা	শ্রীমা
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু
ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি	শ্রীঅরবিন্দ
সুন্দরের সন্ধানে	...
লীলায়ন	নিশিকান্ত

বর্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি. পি. যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: **Nolini Kanta Gupta**
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry—2

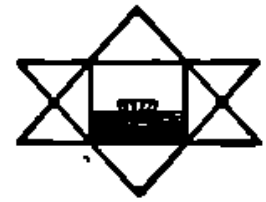

১৫ই আগষ্ট, ১৯৭২

শ্রীঅরবিন্দের বাণী
অমর সূর্য্যালোক
ভবিষ্যৎ ছেয়ে উদ্ভাসিত।

—শ্রীমা

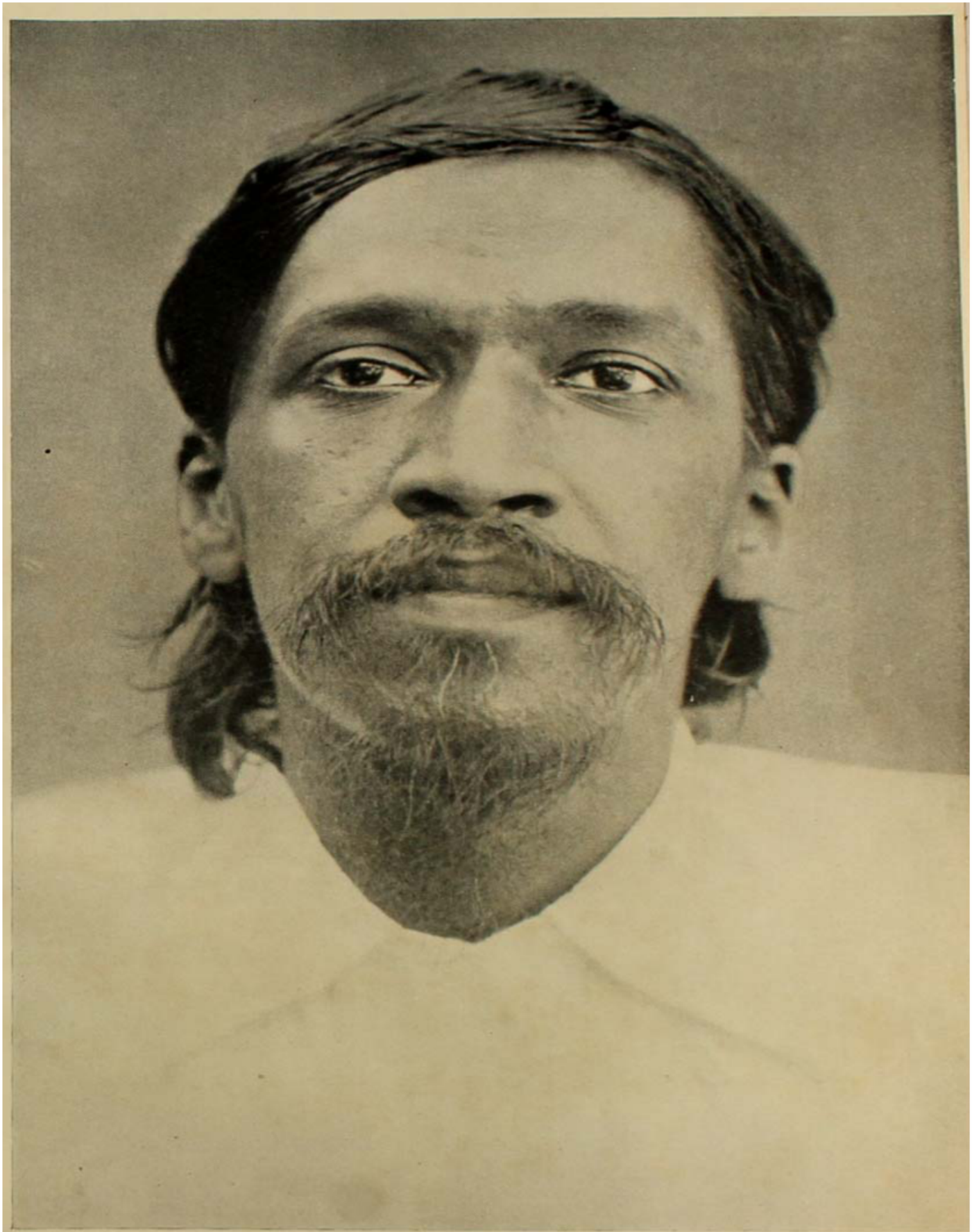

শ্রীঅরবিন্দ, আলিপুর জেল, ১৯০৮

শতাব্দীর প্রণাম

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ব্যক্তির মহত্ত্ব তাঁর মধ্যে নির্ব্যক্তিকের মহত্ত্ব। নিজের সম্বন্ধে চিন্তা তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। তাঁর ভাবনা অনুভব কর্ম বৃহত্তর ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত। যত বৃহৎ সে ক্ষেত্র তত উঁচু তাঁর সত্তার মর্যাদা। মানব জীবন ও সমাজের গঠনে রয়েছে একটা ক্রমোর্ধ্বগামী আরোহণী। এই স্তরপরম্পরা সংকীর্ণতার সব ক্ষেত্র থেকে উঠে চলে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে, ব্যক্তিকে বহত্তর শুদ্ধতর মাত্রার নির্ব্যক্তিকতায় তুলে নিয়ে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমরা শুরু করি নিম্নতন ও সংকীর্ণতম ক্ষেত্র দিয়ে—যেমন, পরিবার—নিজেদের ক্রমে আরো বাড়িয়ে ছড়িয়ে পরবর্তী ধাপে ওঠা—তা হল দেশ, তারপরে মানবজাতি এবং তাকেও ছাড়িয়ে শেষে তুরীয় পদের সোপানাবলী।

জন্মাবধি শ্রীঅরবিন্দ এই রকম এমন নির্ব্যক্তিক ব্যক্তি—কথাটার সেরা অর্থে। সীমাবদ্ধ অনৈক ব্যক্তির চেতনা তাঁর কখনো ছিল না। তাঁর প্রকৃতি ও চরিত্র থেকে এরকম ব্যক্তিগত আধারের চিহ্ন সব মুছে গিয়েছিল। পারিবারিক পরিচয় কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তাও অনেকটা হেলাফেলায়; পরবর্তী উর্ধ্বতর ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার সম্বন্ধটির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে অনেক বেশি। যথাকালে স্বদেশী আধারটি দুর্বার হয়েছিল এবং তার মহৎ কর্তব্য সাধন করেছিল; কিন্তু তারই মধ্যে সে শেষ হয়ে যায় নি, অন্তরালে বিশ্বমানবতা বরাবর প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে। বস্তুত জাতীয়তার মূর্তিকে এটিই দিয়েছে বৃহত্তর মহত্তর মূল্য। জাতীয়টি তো বিশ্বমানবতায় উঠে যাবার সোপান, তা হল মানবগোষ্ঠিরই এক অঙ্গ বা অংশ। আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বব্যাপী কল্যাণের তা হল এক পন্থা, তবে তারও পরে আছে বৃহত্তর মূর্তি বা আধার, আত্মার মূর্তি বা আধার, তুরীয় চেতনা। প্রকৃতপক্ষে এই বস্তুটিই রয়েছে শ্রীঅরবিন্দের চেতনার মূলে তাঁর সত্তার অটল ভিত্তি হিসাবে—এটিই দিয়েছে তাঁর জীবনের সমস্ত মহত্ত্ব ও মাধুর্য, অর্থ ও উদ্দেশ্য। যখন বাহিরে প্রকট হয়ে প্রকাশ পায়নি তখনও কিন্তু অন্তরালে এই অপরীক্ষী ব্যক্তিত্ব তেমনি ছিল; এটিই তাঁর সমস্ত জীবনকে দিয়েছিল এক বিশেষ ছন্দ ও ছটা, আদ্যন্ত জীবনকে একটা নূতনত্ব, সজীবতা এবং উদ্দেশ্য-মুখী গভীর এক উপাদান—জীবনের প্রথম দিকের সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে পর্যন্ত। এ যেন সকল জিনিস অসীমতা ও শাশ্বতের দৃষ্টি দিয়ে দেখা—যে-দৃষ্টি, বৈদিক ঋষি যেমন বলেছেন, আকাশব্যাপী প্রসারিত, তৃতীয় নয়ন।

অন্য কথায়, শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে যোগী, দিব্য, নির্ব্যক্তিক মানুষটিই জন্মাবধি আসল মানুষ হয়ে ছিল। তাই তো দেখি যা দিয়ে অপরের সাধনার শেষ ঠিক তাই দিয়েই তাঁর জীবনের যাত্রা শুরু। আন্তর সত্তায় তাঁকে সাধারণের মতো ধাপের পর ধাপ ধরে ক্রমে ক্রমে চেতনা ও স্থিতির প্রসারণের শিখরে উঠতে হয়নি। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে, প্রত্যেক ব্যাপারে ও অবস্থায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'কর্তব্য কর্ম' করে এসেছেন নিঃস্বার্থ ও আত্ম-

বলিত ভাবে, কিম্বা বলতে পারি—একান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার আসীন থেকে ; আজন্ম যোগী, মানব দেবতার স্বভাব ও প্রকৃতিই এই। তাঁর পক্ষে কৃত কর্তব্য কর্ম জীবনক্ষেত্রের সীমানা সর্বদা ছাপিয়ে ছাড়িয়ে যায়, সীমিত সীমার নিষেধের মধ্যে তা যেন একান্ত আবদ্ধ থাকতেই পারে না। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা চলে, সাংসারিক জীবনে যখন তিনি—আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যখন, তখনও আসক্তি বা পার্থিব বন্ধন দ্বারা অভিভূত আবদ্ধ নন, অবস্থা বিশেষে যা করা কর্তব্য তা-ই করেছেন—নিরাসক্ত, মুক্ত, অন্য এক আদেশের অধীনে। আবার বৃহত্তর জাতীয় জীবনের ক্ষেত্র যখন গ্রহণ করেছেন সেখানেও সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকেননি—তাঁর দেশপ্রেম পরশ্রীকাতর স্বদেশসর্বস্বতা অথবা অতীতের সংকীর্ণ স্বদলপ্রীতিতে প্রত্যাবর্তন নয় তাঁর দেশপ্রেমের প্রশস্ত ভিত্তি সর্বমানবের একাত্মতা, আবার এই উদারভিত্তি মানবতাও তাঁর অন্তর্নিহিত চেতনার পক্ষে যথেষ্ট সুপ্রসর নয় মানবতা তো আর শুধু মানবিকতা, দানদাক্ষিণ্য, কৃপা বা মানবসেবা নয়। প্রকৃত মানবতায় পৌঁছান যেতে পারে, পৌঁছান যায়, তাকে আরো দূরে দেবত্বে টেনে তুলে ধরে, যেখানে মানুষ সব শুধু সহোদর কিম্বা ভগবানের অংশ পর্যন্ত হয়নি—হয়েছে তাঁর সঙ্গে অভিন্ন, অনন্য সত্তা ও ব্যক্তিত্ব।

এই রকমে শ্রীঅরবিন্দ আদর্শ কর্মী, কারিগর যিনি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের কাজটি তার নীতি অনুসারে সার্থক করে চলেছেন, নিখুঁত তার প্রয়োগপদ্ধতি। গৃহী, নাগরিক, স্বদেশ-প্রেমিক হিসাবে নির্দিষ্ট কর্মটি নিষ্পন্ন করেছেন আত্মগত ভাবে কোনো ব্যক্তিগত ব্যক্তিত্বের চেতনা বা বোধ না নিয়ে, করেছেন সেই বিরাট অহংবিমুক্ত নির্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে যা জ্যোতির্ময় বিশ্বচেতনারই লক্ষণ, যার ভিত্তি আরো উর্ধ্বতর এক তুরীয় ধাপে।

শ্রীঅরবিন্দ সম্পূর্ণ গীতোক্তভাবের কর্মযোগী। তিনি দিয়েছেন দৃষ্টান্ত, নিজের জীবনে ধরে দিয়েছেন উদাহরণ—কিম্ আসীত ব্রজেত কিম্—কোন কর্ম করণীয় আর কী রূপে তা কর্তব্য নিজের অবস্থা বা পরিস্থিতি অনুযায়ী। এর অর্থ অবশ্য নয় বর্তমানের আধারে বন্দী থাকা, চিরাচরিতে আবদ্ধ কিম্বা প্রচলিত, অস্থায়ী ও আধারে আসক্ত থাকা বরং, আগেই যেমন বলেছি, শ্রীঅরবিন্দ সর্বদাই পদক্ষেপে সীমানা মাড়িয়ে ছাড়িয়ে চলেছেন, তিনি ছিলেন বিপুলী, একরকমের কালাপাহাড় প্রায়—তাঁর ভিতরে চেতনার প্রবেগ চরম পরম পরিপূর্ণ সত্যটি ছাড়া কিছুতে তৃপ্ত হত না ; এই দিক থেকে উত্তরণের প্রত্যেক ধাপ হয়েছে উর্ধ্বতরের দিকে—বলতে হয় প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত উর্ধ্বতমের দিকে লম্ফন দিয়ে উঠবার ক্ষেত্র।

এই গহন পরম সত্যটিই তাঁর জীবনের সকল স্তর সকল অবস্থা সকল কর্ম ঘিরে ছেয়ে ছিল ; এ সব শুধুই নিয়ে চলেছে তুরীয় সত্যে, কিন্তু এই বাস্তবের নিত্যবোধ তাঁর কর্মে দিয়েছে একটা বিশেষ অর্থ ও প্রকৃতি। এই পরম সত্যের দিকে, এই তুরীয়ের দিকে যাবার প্রবর্তনা তাঁর কাছে অতিক্রান্ত স্তরাবলীর বর্জন নয় : এ হল সংকীর্ণতর নিম্নতর স্তরকে আত্মগত করে উর্ধ্বে তুলে ধরা, উর্ধ্বের অঙ্গীভূত করে তোলা যেমন গাছের

শিকড়স্থ মাটি জীবন্ত রসে গৃহীত ও রূপান্তরিত হয়ে চলে যায় একেবারে চূড়ায়, উপরের আলো ও তেজে।

সমষ্টিগত জীবনে যে স্তরবিন্যাস সেখানে লীলাশৃঙ্খলার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন পরম সত্যের খেলা, সেইটিই বাস্তব প্রমূর্ত করে দেখিয়েছেন যা সর্বদা অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থেকে কাজ করে চলেছে। পরম সৎ শুধুই পরম চিৎ নয়, তা আবার তেজ শক্তি; সেখানে এখনো নিহিত এমন এক গোপন উৎস যা আজো ছোঁয়া যায়নি, যাকে মানুষী চেতনা সজ্ঞানে ধরে পার্থিব জীবনের কাজে লাগাতে পারেনি। মানুষী প্রতিভা আজ জড়জগতের এমন এক জড়শক্তির সন্ধান পেয়েছে যা প্রায় অজড়—গ্রহাতীত বিকিরণ, লেজার (Laser) রশ্মি এবং সমজাতীয় শক্তি, যাদের ক্ষমতার মাত্রা প্রায় অবিশ্বাস্য। তেমনি চেতনার মধ্যে একটা শক্তির পাক আছে বা শুধুই এমন শক্তি নয় যা জানে, কিন্তু সৃষ্টিও করে, আবার কেবল সৃষ্টিই করে না রূপান্তর পর্যন্ত এনে দেয়। সেই শক্তিই গাঢ়তম তীব্রতা নিয়েই জড়ে প্রবেশ করে তাকে রূপান্তরের পরে প্রদীপ্ত জড়ে পরিণত করে—প্রদীপ্ত স্থূল সৌরা-লোকে নয়, ভাস্বর পরম আত্মার জ্যোতিতে।

শ্রীঅরবিন্দ এই শক্তিই উদ্‌ঘাটিত করে মানুষের হাতে দিয়েছেন। তাঁরই যারা শৃঙ্খলমুক্ত এই শক্তি, নতুন এক জগৎ সৃষ্টি করে চলেছে—দারুণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়েই—আমাদের এই প্রাচীন গোলকটি পুনর্গঠিত ও পুনর্বিন্যস্ত করে, যার অঙ্কে আবির্ভূত হবে স্বর্ণযুগের পৃথিবী।

২

শ্রীঅরবিন্দে, বিশেষ করে, এই নির্ব্যক্তিকতা বাস্তবিকপক্ষে ব্যক্তিকতার পুনর্গঠন। নির্ব্যক্তিকতা অর্থই ব্যক্তিকতা বর্জন নয়—অর্থাৎ গোটা ব্যক্তিত্বের চূড়ান্ত নেতি বা বিনাশ নয়, নির্ব্যক্তিকতার আসল অর্থ অহংয়ের নিঃশেষ, কিম্বা বলতে পারি অহংএর পরিবর্তে যথার্থ ব্যক্তিটির স্থাপনা, অহং তো শুধু বিকৃতি অথবা অধঃপতন। অহং-বোধ মূলত স্থান নিয়েছে ব্যক্তির মধ্যে; কিন্তু চেতনার নানা পর্যায়ে নানা স্তরে সমষ্টির বিভিন্ন আধারেও তার অস্তিত্ব রয়েছে। পরিচয়ের ক্রমোচ্চ ধারার উল্লেখ করেছি—তাদের সংশ্লিষ্ট রয়েছে আবার পারিবারিক অহং, জাতীয় অহং, সর্বমানবতার অহং পর্যন্ত। সমষ্টিগত অহং ব্যক্তিগত অহংয়ের মতোই দুর্বার। একমাত্র তুরীয় চেতনাতেই—যিনি একমাত্র যথার্থ 'ব্যক্তি' সেই ভগবানের চেতনার মধ্যেই—নিম্নতর সব অহং উন্মূল বা ঊর্ধ্বায়িত হয়, পায় তাদের সত্যকারের ব্যক্তিকে।

তাহলে, নির্ব্যক্তিকতা লাভের আসল পদ্ধতি হল ব্যক্তিত্বের পুনর্গঠন; অন্যভাবে বলতে পারি পদ্ধা হল—অহং বস্তুটির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন সত্তার যে প্রকৃত সত্য রূপটি তার সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাতে পুষ্টিলাভ এবং তা-ই হয়ে ওঠা। এর অর্থ ব্যক্তির দিব্যতা অর্জন। ব্যক্তি তখন ব্যক্তিগত ভগবানের মধ্যে নিজেকে ভগবৎ করে তোলে; প্রথমে

অবশ্য নিজের আন্তর চেতনায়, পরে চতুর্দিকের আধার বা ক্ষেত্রটিও ভাগবত বোধে রূপান্তরিত হয়। এমন চেতনার কাছে পারিবারিক বেলায়ও সংজ্ঞা ও পরিধি ভিন্ন হয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি তাঁর যথার্থ সংসারের সম্পর্কে কথাগুলি। একটা দেশও পায় তার দেবসত্তা, ভাগবত প্রেরণার প্রকাশে ফুটে ওঠে একটা তুরীয় ব্যক্তিত্ব, প্রত্যেক দেশ আবার নিজস্ব ধরণে সার্থক করে বিশ্বলীলার উদ্দেশ্যটি। বেদোক্ত ঋষির 'সহস্রশীর্ষ পুরুষের' মধ্যে মানবতা এক আমূল পরিবর্তনের ফলে জ্যোতির্ময় মূর্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই চিত্র—প্রমূর্ত করেছেন নিজের চেতনায় তথা বিশ্বচেতনায়ও। ভবিষ্যকাল বিশ্বপুরুষের (কিম্বা বিশ্বপ্রকৃতি, বলা চলে) ভিতরে এই তুরীয় রচনাকে প্রস্তুত রেখেছে—দিন আগত যখন এই নবসৃষ্ট পৃথিবীর বুকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। সেই পরমে—পরব্রহ্মে—অনাদিকাল থেকে যাবতীয় জিনিসের সত্যটি নিহিত সমস্যা হল কখন কী রূপে তাকে নামিয়ে আনতে হবে। যিনি তা করেন তিনি অবতার—যিনি অবতরণ করেন, তাকে সশরীরে ধারণ করেন।

পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়—নির্ব্যক্তিতা লাভ অর্থ কিম্বা তার পরিণতি হল দিব্যতা-লাভ—উর্ধ্ব থেকে পরম ব্যক্তির, ভগবানের অবতরণ, অথবা অন্তরে তার আবির্ভাব (দুটি একই জিনিস), যার ফলে নিম্নতর ও স্থূল মত রূপায়তন ও গঠন তাদের গ্রহণ ও পরম সত্যস্বর মধ্যে আত্মস্বীকরণ যাতে এক অভিন্ন আধার ও ব্যক্তিত্ব লাভ হয়।

শ্রীঅরবিন্দের চেতনার তাৎপর্য এই রকম, নূতন ভাগবত বিশ্বের এই সংসিদ্ধির অভিমুখে এ-চেতনার প্রভাবে কাজটি যে চলেছে তার প্রকৃতি এই।

শেষ করছি তাহলে যা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম সেখানে, যা বলেছিলাম তার সুস্পষ্ট ঘোষণায়—মহতের মহত্ত্ব তাঁর মধ্যেকার দেবত্বের মহত্বে।

উপসংহারে পুনরুক্তি করি তাঁর কথায়—কী তিনি ও কী তাঁর কাজ, মর্ত্য ও মানুষের জন্য কী তাঁর প্রতিশ্রুতি—

সব তখন পরিবর্তিত হবে,
যাদুময় শৃঙ্খলা এক আসবে
এই যান্ত্রিক বিশ্বসৃষ্টির উপর ছেয়ে,
মর্ত্যের জগতে এসে বাস করবে।
অধিকতর শক্তিমান জাতি এক,
প্রকৃতির জ্যোতির্ময় চূড়ায় চূড়ায়,
অধ্যাত্মের প্রতিষ্ঠায়
অতিমানুষ জীবনের রাজা হয়ে
শাসন করবে,
পৃথিবীকে স্বর্গের প্রায় সদৃশচয়
সমরূপ করে ধরবে
আর মানুষের অজ্ঞান হৃদয়কে
নিয়ে যাবে স্বর্গের দিকে
সত্যের দিকে
আর মানুষের মর্ত্য-প্রকৃতিকে
তুলে ধরবে দেবত্বের দিকে...
প্রকৃতি মর্ত্যে থাকবে প্রচ্ছন্ন
ভগবানকে প্রকাশ করবার জন্য
চিন্ময় পুরুষ মানুষী লীলায়
যোগ দেবে,
এই পার্থিব জীবন হয়ে উঠবে
দিব্য জীবন।

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব্ব—নবম সর্গ

প্রাণদেবতাদের স্বর্গ

(১)

তার চারিদিকে এক মহাশুভদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে,
তার স্বর্গত হাস্যগৌরবের মধ্যে ধরে রয়েছে
হর্ষোৎফুল্ল অনন্তের এক জ্যোতি,
মুক্ত হৃদয়ের সুখসার রাজ্য সব ;
দিব্য সোমরসে মদমত্ত সে
নিমজ্জিত আলোকের অন্তরে, চিরতরে দিব্যস্বরূপ সে।
দেবতাদের প্রিয়, অন্তরঙ্গ তাদের,
দেবাদেশে চলেছে সে আনন্দের অভিমুখে,
আপন সুখের আপনি সে অধিপতি,
একচ্ছত্র প্রভু সে তার সকল শক্তির সকল ক্ষেত্রে।
নিশ্চিত জানে সে আনন্দের জন্য সকল রূপ সৃষ্টি হয়েছে,
ভয় দুঃখ ভাগ্যের আঘাত তাকে বিচলিত করে না,
ধাবমান কালের নিঃশ্বাস তার ভীতিকর নয়,
অবস্থার বিপর্য্যয় অবরোধ ঘটায় না তার,
ছড়িয়ে চলেছে সে মধুর নির্ব্বাধ সহজ স্বাচ্ছন্দ্য :
মুক্ত সে সেই শারীর দুর্ব্বলতা হ'তে—মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করে যে,
সেই সঙ্কটের ক্ষেত্র হ'তে বহুদূরে সে
আমাদের সঙ্কল্প স্খলিত যেখানে পদে পদে।
হৃদয়-আবেগের দমনে প্রয়োজন নাই তার,
তৃপ্ত ইন্দ্রিয়ের উষ্ণ আলিঙ্গনে শিহরিত সে :
ছুটে চলেছে আশ্চর্য্য প্রবেগ এক আর অগ্নিশিখা
আর কণ্ঠস্বর এক
জীবনধারার এই অপরূপ রক্তিম খরস্রোতে ;
দিব্যহাস্যের রত্নখচিত ছন্দে জীবন চলে তার,
আশ্রয় তার বিশ্বভূত প্রেমের বক্ষপরে।

বন্ধনহীন আনন্দময় আত্মা চির অক্ষত
জ্যোতির্ম্ময় তার সূর্য্য-বুধ আর চন্দ্রমা-গোষ্ঠী বিচরণ করে
শোকহারা স্রোতস্বিনীর ছন্দময় প্রবেগের ধারে ধারে
অপার্থিব নন্দনের সৌরভস্নাত হয়ে ;
নীরব নিবিড় আনন্দ এক স্বর্গকে ছেয়ে রয়েছে,
চিরন্তন প্রভা এক শিখরে শিখরে ছড়ায় হাসি তার ;
রক্তসের অস্ফুট কণ্ঠাভাস এক
স্পন্দিত হয় বাতাসে, স্পর্শ করে মুক্ত পৃথিবীর মাটি ;
মগ্ন নিরন্তর পুলকের অন্ধমাঝারে,
তার মধুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত একই সুর বারবার টেনে
আনন্দের গাঢ় উচ্ছ্বাস বয়ে চলে প্রহরের ধারায়।
মহিমার শান্তির তোরণ এক পার হয়ে এগিয়ে চলে
পথযাত্রী এক সানুতল হতে ধ্যানী সানুতলে ;
বিশ্ব মায়াবীর দর্পণে দেখা যায় যেমন
অপরূপ প্রতিবিম্ব ভেসে যায়, অন্তরাত্মার দৃশ্যাবলী,
তেমনি সে পার হয়ে যায় অবিনশ্বর আনন্দের চিত্রাবলী ;
দৃষ্টি নিবদ্ধ তার সৌন্দর্য্যের আনন্দের অতল অন্তরে।
চারিদিক ঘিরে তার জ্বলে সচেতন শত সূর্য্যের আলোক,
অর্থবহ মহান প্রতীকসব ঢালে অপার সুখস্রোত।
তার দর্শনের তরে দলবদ্ধ হয়ে আসে উজ্জ্বল প্রশান্তির প্রান্তরসব,
পুণ্যলোকের গিরিমালা আর রক্তনীল সানুতল যত,
পুলকের উৎস গভীর গহ্বরশ্রেণী আর কলচঞ্চল নির্ঝরধারা
আর বনরাজি, স্পন্দিত যেখানে রক্তিম নিঃসঙ্গতা ;
নিম্নে তার প্রসারিত স্ফুরৎ-রঙ্গ-খচিত চিন্তারাজি যেন,
ধ্যানমগ্ন স্বপ্নময় নগরী যত গন্ধর্ব্ব-রাজন্যদের।
আকাশে স্পন্দমান গহনসব পার হয়ে
সন্তর্পণে ভেসে আসে মধুর ধারায় অস্ফুট প্রফুল্ল সঙ্গীত এক,
শোনে সে অন্তরঙ্গে আপন হৃদয়ে অদৃশ্য আঙুলের আঘাতে
ফুটে ওঠে বীণারব—স্বর্গের গায়কেরা চলে যায় যেমন ;
অপার্থিব সুরমধুর কণ্ঠ যত কীর্ত্তন করে
শাশ্বত প্রেমের মহিমা
স্বর্গের শ্বেতনীল চন্দ্রালোকের বাতাসে।
সেই অদ্ভুত জগতের চূড়া ও মর্ম্মকন্দর যেন—

অদূরে মাথা তুলে উঠেছে স্বর্গীয় সমুচ্চ অনাবৃত গিরিমালা,
প্রজ্বলিত যেন কত সূর্যাস্ত ধ্যানমগ্ন সন্ধ্যার কোলে ;
তাদের পাদমূল খোঁজে যেন অভিনব কোন অনাবিষ্কৃত গভীর গহ্বর,
আর ডুবে যায় আনন্দ-আপ্লুত শুব্ধতার অন্তরে ;
তাদের গাত্র বেয়ে নেমে যায় উচ্চহাস্য আর
কলকণ্ঠের ত্রস্ত ধারা
আর এঁকেবেঁকে যায় সঙ্গীতমুখর কত স্রোতস্বিনীমালা,
পূজা করে চলে নীল নীলিমা পুণ্যমন্ত্রে তাদের
নেমে যায় ছায়াঘন সংগোপন বনরাজিতলে,
ঊর্দ্ধে উঠেছে গিয়ে বিপুল নির্বাক রহস্যের মাঝে,
শিখর তাদের আরোহণ করে জীবনের ওপারে এক মহত্তর অভিমুখে,
প্রাণলোকের দেবতাদের সমুজ্জ্বল নন্দনকানন যত
বরণ করে তাকে, তাদের মৃত্যুহীন সুরমালা সাজিয়ে।
কালের ধারায় প্রস্ফুটিত যা কিছু সবই নিখুঁত নির্দোষ সেখানে,
সৌন্দর্য্য সেখানে সৃষ্টির সহজাত স্বরূপ,
শান্তি সেখানে শুদ্ধির বিলাস-শিহরণ,
প্রেমের সেখানে সার্থক হয় সোনালী গোলাপী স্বপ্নসব,
শক্তি পরিধান করে তার আশা-আকাঙ্ক্ষার রাজমুকুট,
কামনা ঊর্দ্ধে উঠে যায় সবেগে সর্ববলাধার অগ্নিশিখা যেন
আর সুখভোগ অর্জন করে দেবতাদের পদবী,
স্বপ্ন বিচরণ করে তারকামালায় রাজসরণী বেয়ে
মধুময় সামান্য পদার্থসব পরিণত হয় অলৌকিক মহিমায়।

ঋগ্বেদ

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

পঞ্চম মণ্ডল—সপ্তম সূক্ত

সখায়ঃ সং বঃ সম্যঞ্চমিষং স্তোমং চাগ্নয়ে।
বর্ষিষ্ঠায় ক্ষিতীনামূর্জো নপ্ত্রে সহস্বতে॥

সখায়ঃ—হে সখাবৃন্দ
সম্—সম্যক
বঃ—তোমাদের মধ্যে
সম্যঞ্চম্—সম্যক্ পরিপূর্ণ
ইষম্—প্রেরণা
স্তোমম্—প্রতিষ্ঠামন্ত্র
চ—এবং
অগ্নয়ে—অগ্নির জন্য
বর্ষিষ্ঠায়—পরম বর্ধনকর্ম যে তার জন্য
ক্ষিতীনাম্—অধিষ্ঠানসমূহের, স্থিতিসমূহের
ঊর্জঃ—ওজঃশক্তির
নপ্ত্রে—পুত্রের জন্য
সহস্বতে—বলবানের জন্য

হে সখাবৃন্দ, তোমাদের মধ্যে হোক সম্যক প্রেরণা, সম্যক প্রতিষ্ঠামন্ত্র অগ্নির জন্য, যাবতীয় লোকে তিনি পরম বর্ধনকর্তা, বীর্য্যের তিনি বলবান পুত্র ॥১॥

কুত্রা চিদ্যস্য সমৃতৌ রণা নরো নৃষদনে।
অর্হন্তশ্চিদ্যমিন্ধতে সংজনয়ন্তি জন্তবঃ॥

কুত্রা=(কুত্র)—যেখানে সেখানে
চিৎ—হোক

যস্য—যার
সম্-ঋতৌ—সঙ্গে সংযুক্ত হ'লে
রণ্বাঃ—আনন্দপূর্ণ
নরঃ—বীরবৃন্দ (নেতৃবৃন্দ—সায়ণ)
নৃ-সদনে—মানুষের গৃহে
অর্হন্তঃ—যোগ্য যারা, অধিকারী যারা
চিৎ—তারাই
যম্—যাকে
ইন্ধতে—সমিদ্ধ করে
সম্-জনয়ন্তি—সুষ্ঠুভাবে জন্মদান করে
জন্তবঃ—যারা জন্মগ্রহণ করেছে

যেখানে হোক তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে যেসব বীরবৃন্দ পরম আনন্দে, সেই সব যোগ্য পুরুষেরা তাদের মানুষী গৃহে তাকে প্রজ্বলিত করে, এই যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা তাকে সুজন্ম দান করে ।।২।।

সং যদিষো বনামহে সং হব্যা মানুষাণাম্ ।
উত দ্যুম্নস্য শবস ঋতস্য রশ্মিমা দদে ।।

সম্ (+বনামহে)—সম্যক বা পূর্ণভাবে
যৎ—যখন
(সম্+) বনামহে—সম্যক্ বা পূর্ণভাবে অর্জন করি বা জয় করি
হব্যা—আহুতিসব
মানুষাণাম্—মানুষদের
উত—তখন
দ্যুম্নস্য—দ্যুতির, দীপনের
শবসা—সামর্থ্যের
ঋতস্য—সত্যের
রশ্মিম্—রশ্মিসকল
আ+দদে—নিজের মধ্যে সংগৃহীত ক'রে ধরে, সংগ্রহ করে

যখনই আমরা শক্তির প্রেরণাসব পূর্ণভাবে অর্জন করি, অর্জন করি মানুষী আহুতিসব, তখনই জ্যোতির আপন সামর্থ্যে সে সত্যের কিরণরাজি সংগৃহীত করে আপনার মধ্যে ।।৩।।

সঃ স্ম কৃণোতি কেতুমা নক্তং চিদ্দূর আ সতে।
পাবকো যদনস্পতীন্ প্র স্ম মিনাত্যজরঃ ॥

সঃ—সে
স্ম—ফলতঃ
কৃণোতি—সৃষ্টি করে
কেতুম্—সাক্ষাৎ জ্ঞান
আ (+সতে)—
নক্তম্—রাত্রির মধ্যে
চিৎ—এমন কি
দূরে—দূরে
আ+সতে—যে রয়েছে, নিবাস করে
পাবকঃ—পূতকর, শুদ্ধিদাতা
যৎ—যখন
বনস্পতীন্—আরণ্য তরুলতা
(প্র+) মিনাতি—খণ্ডিত করে, বিচূর্ণ ক'রে চলে
অজরঃ—অজর সে, জরাহীন সে

সে সত্যজ্ঞান সৃষ্টি করে, তার জন্যে রাত্রির মধ্যে যে রয়েছে বহুদূরে, পাবক অজর বহ্নি যাবতীয় বন-জঙ্গল মন্থন করে চলে ॥৪॥

অব স্ম যস্য বেষণে স্বেদং পথিষু জুহ্বতি।
অভীমহ স্বজেন্যং ভুমা পৃষ্ঠেব রুরুহঃ ॥

অব (+জুহ্বতি)—নীচে
স্ম—ফলতঃ
যস্য—যার
বেষণে—সেবায়, পরিচর্য্যায় (সায়ণ)
স্বেদম্—ঘর্ম্ম, স্বেদ
পথিষু—পথে পথে
(অব+) জুহ্বতি—নিক্ষেপ করে আহুতিরূপে
অভি—(তার) দিকে

ঈম্—তার
অহ—নিশ্চয়
স্বজেন্যম্—স্বয়ম্ভূ, স্বয়ংজাত
তৃষ—বৃহৎ, বিশাল
পৃষ্ঠা ইব—ভূমির মত
রুরুহঃ—উত্তীর্ণ হয়, উঠে চলে

তাঁর সেবাকর্মে মানুষেরা যখন পথে পথে তাদের স্বেদবিন্দু ছড়িয়ে চলে আহুতির নৈবেদ্যের মত, তখন তারা সত্যসত্যই উঠে চলে এই স্বয়ম্ভুর দিকে প্রসারিত একখানি ভূমির উপরে যেন ॥৫॥

যং মর্ত্যঃ পুরুস্পৃহং বিদদ্বিশ্বস্য ধায়সে।
প্র স্বাদনং পিতূনামস্ততাতিং চিদায়বে॥

যম্—যাকে
মর্ত্যঃ—মর্ত্য মানুষ
পুরুস্পৃহম্—সকল কামনার আধার
বিদৎ—জানতে পারে
বিশ্বস্য—বিশ্ববস্তুর
ধায়সে—স্থাপনের জন্য
প্র—প্রতি, দিকে, এগিয়ে চলে
স্বাদনম্—সুস্বাদের
পিতূনাম্—পানীয় সকলের
অস্ততাতিম্—নীড় প্রস্তুতের জন্য
চিৎ—নিশ্চয়, অবশ্য
আয়বে—আয়ুষ্মান বা মানবের জন্য

মর্ত্যজীব জানবে তাকে যে সকল কামনার আধার সেই আমাদের মধ্যে স্থাপন করবে বিশ্ববস্তুকে ; সে চলে যায় মধুস্বাদী পানীয় যেখানে, যেখানে মানুষের জন্য নীড় প্রস্তুত হয়ে চলে ॥৬॥

স হি ষ্মা ধন্বাক্ষিতং দাতা ন দাত্যা পশুঃ।
হিরিশ্মশ্রুঃ শুচিদন্নৃভুরনিভৃষ্টতবিষিঃ ॥

সঃ—সে
হি—কারণ
ষ্ম—নিশ্চয়
ধন্ব—মরুভূমি
আক্ষিতম্—বাসস্থান
দাতা—বিদীর্ণ করে যে
ন—যেন, মত
আ-দাতি—দীর্ণ করে
পশুঃ—পশু
হিরিশ্মশ্রুঃ—হিরণ্ময় শ্মশ্রু
শুচিদন্—দীপ্তদন্ত (সায়ণ), শুচিশুভ্র দন্ত
ঋভুঃ—লৌহকার যেন
অনিভৃষ্ট—অপীড়িত (সায়ণ)
তবিষিঃ—উত্তাপ, বল (সায়ণ)

যে মরুভূমি আমাদের আবাস, সে তাকে দীর্ণ করে দীর্ণকারী পশুর মত, হিরণ্ময় শ্মশ্রু তার শুভ্রদন্ত, লৌহকার যেন, তার বল তাপপীড়িত নয়।

শুচিঃ ষ্ম যস্মা অত্রিবৎ প্র স্বধিতীব রীয়তে।
সুষ্বরন্নৃত মাতা ক্রাণা যদানশে ভগম্ ॥

শুচিঃ—শুচি, শুভ্র
ষ্ম—নিশ্চয়
যস্মৈ—যার জন্য
অত্রিবৎ—ভোক্তার মত
স্বধিতিঃ-ইব—কুঠারের মত
প্র+রীয়তে—অগ্রসর হয়ে চলে
সু-সূঃ—সুপ্রসবা
অসৃত—জন্ম দিয়েছে

মাতা—মাতা
ক্রাণা—কর্ম্ম করে চলে, কর্ম্ম সম্পাদন করে
যৎ—যাতে
আনশে—লাভ করে সে, ভোগ করে সে
ভগম্—পরম ভোগ, পরমানন্দ

শুচিশুভ্র তিনি, তাঁর কূটার যেন ভোক্তার মত ক্রমে অগ্রসর হয়ে চলে, সুপ্রসবা মাতা তাঁকে জন্ম দিয়েছেন, তিনি কর্ম্মসিদ্ধি নিয়ে আসেন, পরম আনন্দ ভোগ করেন ॥৮॥

আ যস্তে সপিরাস্রুতেঽগ্নে শমস্তি ধায়সে।
এষু দ্যুম্নমুত শ্রব আ চিত্তং মর্তেষু ধাঃ॥

আ—সর্ব্বত্র
যঃ—যে
তে—তোমার
সপিঃ-আস্রুতে—তোমার জন্য সর্পিল ধারাকে সবন করা হয়,
সোমধারাকে পরিস্রুত করা হয়
অগ্নে—হে অগ্নি
শম্—শান্তি, শান্তিস্থান
অস্তি—হয়েছে
ধায়সে—(তোমার) প্রতিষ্ঠার জন্য
আ—সর্ব্বত্র
এষু—এদের মধ্যে
দ্যুম্নম্—জ্যোতি
উত—আর
শ্রবঃ—দিব্যশ্রুতি
আ—সর্ব্বত্র
চিত্তম্—চিন্ময় সত্তা
মর্তেষু—মর্ত্যমানুষদের মধ্যে
আ + ধাঃ—প্রতিষ্ঠা কর

হে অগ্নি, তোমার দিকে সর্পিল রসধারা চলেছে, তোমার জন্য তোমার প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিস্থান হয়েছে যে মানুষ, তারাই মর্ত্যজীবের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে জ্যোতি ও শ্রুতি ও চিন্ময় অন্তরাত্মা ॥৯॥

ইতি চিন্মন্যানদ্রিজস্থালতনা পশুং দদে ।
আদগ্নে অপৃণতোঽত্রিঃ সাসহ্যাদ্দস্যূনিষঃ সাসহ্যান্নৃন্ ॥

ইতি চিৎ—এই রকমেই
মন্যাম্—মননশক্তি
অদ্রিজঃ (অদ্রি—জড়সত্তা)—জড়সত্তা হতে জাত অথবা অধর্ষণীয় জন্ম যার
দা-দাতম্—তোমা কর্তৃক দত্ত
পশুম্—গাভী, জ্ঞানজ্যোতি
আ-দদে—গ্রহণ করেছি
আৎ—তারপর
অগ্নে—হে অগ্নি
অপৃণতঃ—যারা (তোমার) তুষ্টি বা পূর্ণতা সাধন করে না
অত্রিঃ—অত্রি ঋষি
সাসহ্যাৎ—পরাজিত করে যেন
দস্যূন্—দস্যুসকলকে
ইষঃ—শক্তিসকল
সাসহ্যাৎ—জয় করে যেন
নৃন্—মানুষী শক্তিসকল

জন্ম আমার অপ্রতিহত, আমি তাই তোমার প্রদত্ত মানসশক্তি আর জ্যোতিঃশক্তি গ্রহণ করি, তোমার পূর্ণ তুষ্টি সাধন করে না যারা সেই সব দস্যুবলকে অত্রিঋষি পরাভূত করেছেন, পরাভূত করেছেন সকল প্রবেগ, সকল মানুষী প্রেরণা ॥১০॥

সোনার খোঁজে

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

আমরা সেদিন একখানা নাটক দেখলাম আমাদের স্কুলপ্রাঙ্গণে। সৎপ্রেমের লিখিত কাহিনী; অভিনয় করেছে আমাদের এখানকার আশ্রমের ইউরোপীয় সঙ্গী-সাথীরা। পাশ্চাত্য বিশেষণটি উল্লেখ করলাম কেন পরে বুঝবে।

নাটকের বিষয় হল সোনার খোঁজে চোরাকারবারীদলের কথা অবশ্য এ হল বাহ্যরূপ, আসলে এ সোনা আন্তর-চেতনার সোনা। এই অন্বেষুরা দৃশ্যতঃ স্থূল সোনার উদ্দেশ্যে চলেছে ঘুরে ফিরে দেশ-বিদেশে, তবে এ হ'ল সেই অভিযানের প্রতীক যার লক্ষ্য জ্ঞানালোক পরম সত্য, সকল দেশের সকল মানুষই যা আকাঙ্ক্ষা করেছে কোন না কোন প্রকারে, যা না পেলে চিরসুখ পরমার্থ লাভ হয় না।

নাটকে দেখান হয়েছে স্বর্ণলোভীদের জীবন, তাদের স্থূল জীবন কি বিপদপূর্ণ, শারীরিক কত অসুবিধা কত দুঃকষ্টের ভিতর দিয়ে তাদের চলতে হয়। অশন-বসন-বাসনের অভাব শুধু নয় দেশের সমাজের এমন কঠোর নিয়ম-কানুন রয়েছে মানুষকে ঘিরে নিপীড়িত করে শাস্তি-শৃঙ্খলার নামে। পুলিশ, পাসপোর্ট, ভিসা কত কি পদে পদে মানুষকে আটকে রেখেছে, বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু এসব কিছুই নয়, আন্তর-জীবনকে সাক্ষাৎ করতে হয় যে সব দুরূহ দুর্জয় শত্রুদেরকে তাদের তুলনায়। এ মানুষেরা কি চায়? ঘর থেকে তারা ছুটে বের হয়েছে কেন? কি তাদের লক্ষ্য? আলো চায়? মুক্তি চায়? ভগবানকে চায়? সাধারণতঃ পাশ্চাত্য চেতনায় এ সব জিনিষ হ'ল নাম মাত্র, শোনা কথা, আলো আছে, আনন্দ আছে, ভগবান আছে—আছে কি? কোথায় গেলে কি উপায়ে এ সব জিনিষের সন্ধানলাভ হতে পারে? দেশ সমাজ আত্মীয় পরিজন বন্ধুজন বিসর্জন দিয়ে, এত সব আকর্ষণ জলাঞ্জলি দিয়ে চলে যেতে হবে দূরে—এই হল একেবারে গোড়ার, আরম্ভের সংঘর্ষ, দুঃখাভিঘাত। অন্তরে একটা অগ্নিজ্বালা নিয়ে ছুটেছে এরা, একটা দারুণ আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, তার সঙ্গে তেমনি রয়েছে নিদারুণ অনিশ্চয়তা হায়া উদ্দেশ্যের মরীচিকার পিছনে ছুটছে এরা?

আধ্যাত্মিক যাত্রা, ভাগবত সাধনার এই যে দুর্গম পথ, তা অতি পরিচিত, শাণিত ক্ষুরধার যেমন বলা হয়। কিন্তু এরই সঙ্গে আরও একটি নিবিড়তর কষ্টের উপকরণ জুড়ে দেওয়া হয় তা হল একটা কুটিল আত্ম-সমীক্ষা, ইচ্ছাকৃত আত্ম-পীড়ন। অনেক সময় মনে হয় এই আত্মপীড়নই হ'ল যেন পথ চলা এগিয়ে চলা; কিছুই জানি না যখন কি আছে, কি নাই, কিছু নিশ্চয় যখন নাই অথচ প্রেরণা রয়েছে এগিয়ে চলবার, তখন প্রেরণা প্রলোভন

হয় দেয়ালে মাথা কুটে নিজের অস্তিত্বকে জাগিয়ে রাখা। পাশ্চাত্যে এই ধারারই নাম দেওয়া হয়েছে dark night of the soul—অন্তরাত্মার আঁধার রাত্রি।

তোমাদের অনেকের হয় ত' শ্রীমায়ের একটি কথা মনে পড়তে পারে এই প্রসঙ্গে। শ্রীমা একবার বলেছিলেন এই খেলার মাঠের আসরে যে আমরা ভারতবাসীরা কল্পনা করতে পারি না, ইউরোপে কি কঠিন অধ্যাত্মের সংযোগ লাভ করা, এ জিনিষের সচরাচর কোন চিহ্ন-হদিশ আদৌ মেলে না, সাধারণ জীবনে তেমন মানুষও পাওয়া যায় না, এবিষয়ে পুস্তক পর্য্যন্ত সুদুর্লভ—বিশেষভাবে সেই যুগে। তোমরা রয়েছ এখানে একটা জীবন্ত আবহাওয়ার মধ্যে, গ্রন্থের অভাব নেই, মৌখিক উপদেশের অভাব নেই, সঙ্গী-সাথী দিশারী পর্য্যন্ত মিলে যায়। পথের সন্ধান এখানে চোখ খুললেই হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। ইউরোপে এ জগতের কথা খুব কম লোকেই বোঝে, বেশীর ভাগই কিছুই বোঝে না, নয় মনে করে তুমি হয়েছ উদ্দাম পাগল। মা নিজেও জিজ্ঞাসার দিক দিয়ে বাহ্যতঃ অনেক চেষ্টা করেছিলেন, অনেক পরে যখন শুনেছিলেন গীতার কথা তখন গীতার খোঁজ হয়েছিল এক দুরূহ ব্যাপার—আর যখন সংগ্রহ করলেন তা হ'ল অনুবাদের অনুবাদ। আর কি অনুবাদ! তবে মায়ের এক সময়ে সুযোগ হয়েছিল একজন ভারতীয় পণ্ডিত সাধকের সঙ্গে পরিচয়ের। তিনি একজন খাঁটি লোক ছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে মা বেশ কিছু সাহায্য পেয়েছিলেন।

ইউরোপীয় মনের ধারা চলেছে একান্ত বিচারবুদ্ধির সহায়ে। এ পথে যে বিপদ রয়েছে তা বলছি আরও কিছু। উর্দ্ধে রয়েছে একটা উচ্চতর বিচার বা বিবেকবুদ্ধি, তার মধ্যে কিছুটা সত্যকার আলো সহজেই থাকে বা প্রবেশ করে, নিম্নের দিকে রয়েছে প্রাণের সহজ প্রেরণা, তার মধ্যেও স্বতঃই অস্বাভাবিক কিছু দেখা দেয় না যেমন পশুদের। এই দুয়ের মাঝখানে রয়েছে একান্ত মানুষী বৃত্তি একটা জড় মন, স্থূল ইন্দ্রিয়গত কৌতূহল, গোলমাল এনে দেয় এই জিনিষটি—অনাবশ্যক প্রশ্নপরায়ণ, বিশ্লেষণ-বিলাসী এই স্থূল মস্তিষ্কগত মন প্রকৃতির সহজগতির মধ্যে এনে দেয় বিকৃতি, অস্বাস্থ্য। এর প্রভাবে উর্দ্ধের বুদ্ধিও বিচলিত হয়, আত্মবিশ্বাস হারায় আর নীচের প্রাণবৃত্তিকে তার সহজ সরলতার মধ্যে এনে দেয় আবিলতা কুটিলতা। একটা সংশয়মুখী চেতনা তুলে ধরে আর তার সঙ্গে প্রায়ই এনে জুড়ে দেয় জোর অস্বীকার অন্ততঃ অস্বীকারের দিকে ঝোঁক, নিরপেক্ষতা নয়।

ইউরোপে, আধুনিক ইউরোপের মানসলোক পত্তন করেছেন দেকার্ত, তিনি শুরু করেছেন এই বলে, "সকল জ্ঞান, সকল উপলব্ধির গোড়া হ'ল সংশয়। কিছুই বিশ্বাস করে মেনে নেবে না, সব দেখবে সংশয়ের চোখে। তবে এই সন্দেহ করছে কে? সে ত' আমি! তবে "আমি"ই হ'ল প্রথম আদি অকৃত্রিম স্থির সত্য।" কিন্তু দেকার্তের অনুবর্ত্তীরা এখানেই থেমে যাননি, তাঁরা এ স্থির আদিসত্যকেও বিশ্লেষণ করে অনিশ্চিতের পর্য্যায়ে মরীচিকার মতিভ্রমের পর্য্যায়ে সরিয়ে দিয়েছেন। মনের মধ্যে এই যে সন্দেহের

আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, প্রাণের বাসনা আসক্তি বিরোধ বিদ্রোহ নিশে নিয়ে এসেছে একটা নারকীয় লোক।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক অভিযান সংশয় দিয়ে আরম্ভ নয়, তার আরম্ভ বিশ্বাস দিয়ে, শ্রদ্ধা দিয়ে। আরম্ভে জিজ্ঞাসার উল্লেখ আছে বটে কিন্তু সে জিজ্ঞাসার অর্থ প্রশ্ন নয়, তার আসল অর্থ আকূতি। ভারতীয় মনে ব্রহ্ম বা ভগবান স্বতঃসিদ্ধ সত্য, এই সত্যকে মেনে নিয়ে গ্রহণ করেই যাত্রা সুরু করতে হবে। ব্রহ্ম বা ভগবান নাই, তার প্রমাণ আবিষ্কার করতে হবে, প্রতি পদে যাচাই করে দেখতে হবে এ জিনিষ কোথাও আছে কিনা—সাধনার সূর্য্যস্নাত পথ—সূর্য্যযান, হিরণ্ময় বর্ম্ম এ নয়। ভগবান আছেন, আত্মা আছে, তাঁকে সাক্ষাৎকার করতে হবে, অধিগত করতে হবে এই হল সাধকের সাধনা। নচিকেতা তখনই তাঁর আধ্যাত্মিক যাত্রা সুরু করলেন যখন শ্রদ্ধা তাঁর মধ্যে প্রবেশ করল, তাকে অধিকার করল। তাই তিনি এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের জোরেই যমের দুয়ারে পৌঁছিলেন গিয়ে এবং আদায় করলেন তাঁর পরম কাম্যবস্তুকে।

সূর্য্যালোকিত পথ অর্থ নয় যে-পথে যাবতীয় বাধা-বিপত্তি দূর হয়ে গিয়েছে, পথ হয়ে গিয়েছে সহজ কুসুমাস্তীর্ণ—তা নয়, তবে বাধা-বিপত্তি সব আমাদের বিচলিত করে না, যেন আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করেনা, তাদের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে আমরা চলে যাই আঘাত সত্ত্বেও অক্ষত হয়ে। আমরা দেখি সম্মুখে আমাদের অবিকম্প অবিচল জ্বলছে এক স্থির আলোক-বর্ত্তিকা, সম্মুখে চলেছে সে পথ দেখিয়ে আশ্বাস ছড়িয়ে আমাদের প্রতি অঙ্গে একটা শান্তিরই প্রলেপ দিয়ে।

Dark night—আঁধার রাত্রি—অন্য ধরণের বস্তু। পথ একান্ত কণ্টকাকীর্ণ এত জটিল ও কুটিল যে প্রতি পদে পথভ্রষ্ট হবারই সম্ভাবনা বেশী অথবা তা যেন বিপুল সাগরে হাল-পালহারা নিঃসঙ্গ নৌকা এক, দিকনির্ণয় ভাগ্যমাত্র, যাত্রী যেখানে আকস্মিকের অসহায় পুতুল। এই আঁধার রজনী শ্রীরাধার বিরহের সঙ্গে তুলনা করা হয় কিন্তু একটা বৃহৎ এবং মূলের পার্থক্য রয়েছে, কারণ শ্রীরাধার কাছে শ্রীকৃষ্ণ অনুপস্থিত বটে কিন্তু অনস্তি নয় বা সন্দেহের বিষয়ও নয়। সে বিরহের মধ্যেই রয়েছে নিবিড় একাগ্র শ্রদ্ধা, একটা অন্তরাত্মার চিরমিলন। তাই তাঁর বিরহ পরমানন্দেরই বিপরীত দিক, রূপান্তর বা নামান্তর।

চেতনার মধ্যে অন্ধকার নেমে আসে অচেতনার জন্য, অচেতনার উৎস মানুষের মধ্যে হ'ল সন্দেহ। সংশয়ের মত দ্বিতীয় শত্রু আর মানুষের নাই, সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। মানুষের মধ্যে অনেক দুর্ব্বলতা রয়েছে, বাসনা কামনার সমস্ত রাজ্যটাই তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যাবতীয় আসক্তি লোভ মোহ শরীরের অক্ষমতা সব, সকলের উপরে তার অহংকার, অহংবোধ; কিন্তু মূল বিষয় হ'ল সংশয়। সংশয়ের উৎপত্তি, মানুষের স্থূল মন হ'তে। স্থূল মনই তার আপন নীড়, স্বগৃহ। স্থূল মনের কাজ স্থূলে রূপ দেওয়া, আকার দেওয়া, প্রকাশ করে ধরা জড়দেহ দিয়ে। তাকে ভার দেওয়া হয়েছে ভৌতিক রূপায়ন করার,

সুতরাং তাকে দেখতে হয় কোন জিনিষকে রূপ দিতে চলেছে সে, এ থেকেই উৎপত্তি সন্দেহের, সংশয়ের—যা সে করতে চলেছে সেটা কি ঠিক? সেটা কি যথাযোগ্য এবং করণীয়? আর জড়ত্বনের ভুলই এইখানে। এ প্রশ্ন করবার অধিকার সত্যসত্যই তার নাই। আসল কাজ তার যন্ত্রের কাজ, তাকে যা দেওয়া হবে সেই জিনিষকে সে রূপায়িত করবে—আসল প্রশ্ন হ'ল কার যন্ত্র সে, কে এনে দেবে তার জন্য ব্যবহারের বস্তু। যে এনে দেবে, যার যন্ত্র সে তারই নাম হ'ল শ্রদ্ধা, বিশ্বাস। কারণ বিশ্বাস বা শ্রদ্ধাই হল অন্তরাত্মার ইশারা, দিব্য আলো, ভাগবৎ নির্দ্দেশ। পাশ্চাত্যেরই একজন অধ্যাত্মদিশারী বলে গিয়েছেন, "Faith is the testimony of things unseen." আমাদের ঋষিরাও বলেন, "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।" যার মধ্যে এই দিব্য অংশটি অনুপস্থিত তার নাম কবন্ধ। যারা কেবল মস্তিষ্কের সহায়ে বিচারবুদ্ধির আশ্রয়ে "দেকার্তীয়" পন্থায় চলতে চেষ্টা করে তারা অন্ধকার হতে আরও গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করবে, যদি না অন্ধকারে সে একান্ত আকুতি জ্বলে উঠে যা অন্ধকারকে পরাভূত করবে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে বিশ্বাসে বিশ্বাস কি? ভুল বিশ্বাসও ত' হতে পারে। ভুল বিশ্বাস হতে পারে না, হয় সু-বিশ্বাস কি কু-বিশ্বাস। তোমার বিশ্বাস থাকতে পারে আঁধারের উপর আর না হয় আলোর উপর। আঁধারের উপর যে বিশ্বাস তার নাম মোহ, আর আলোর উপর যে বিশ্বাস তারই নাম শ্রদ্ধা (উপনিষদ যার উল্লেখ করেছেন), অবশ্য এমনও হতে পারে যে তোমার আলোর উপরও সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই, আঁধারের উপরেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস নেই, তোমার দৃষ্টি একবার এটির উপর আর একবার ওটির উপর দ্বিধাভিন্ন দোলাচল-বৃত্তি, তোমার স্থিতি তখন পৃথিবীতেও নয়, স্বর্গেও নয়, তুমি ঝুলে থাকবে অন্তরিক্ষে মধ্যপথে ত্রিশঙ্কুর মত, সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে। আমরা স্মরণ করতে পারি গীতার কথা

নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ...
উভয়বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।

অন্ধবিশ্বাসের কথা বলা হয়, কিন্তু কাকে বলে অন্ধ বিশ্বাস? অন্ধকারকে যা বিশ্বাস করে, সত্যসত্যই তাই হল অন্ধ বিশ্বাস; আর যে বিশ্বাস আলোকের উপর সে বিশ্বাস চক্ষুষ্মান—লোকে বলবে হয় ত অন্ধ কিন্তু তার চক্ষু ঘুরে আর একদিকে তাকিয়ে রয়েছে (এক ফরাসী কবি যেমন বলেছেন), তাই বাহ্যতঃ সে অন্ধ।

যা হোক, বিচারবুদ্ধির এই হাতড়িয়ে চলার পথে, যার অন্য নাম হল আত্মার আঁধার রজনী, যদি একটা সত্যকার আন্তরিকতা থাকে, থাকে একান্ত আকুতি তবে পরিণামে অবশ্যই তা নিয়ে যায় সুড়ঙ্গের শেষে, হয় তার আলোক-দর্শন। কিন্তু তবুও এ হ'ল তটস্থ ব্রহ্ম, সূর্য্যালোকের স্পর্শমাত্র; দূর হতে ভোরের দর্শন যেমন হয়েছিল আমাদের স্বর্গলোভাতুর-দের; কিন্তু সূর্যমণ্ডলের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে সেখানে অবগাহন করলে—জ্যোক্‌চ সূর্য্যং দৃশে,—ঋষিরা যেমন বলেছেন,—তা হল অন্য জিনিষ, তাতে প্রয়োজন একটা আমূল পরিবর্ত্তন, প্রয়োজন চিত্তের ও মনের মধ্যে এমন কি শারীরিক কোষে অবধি

আলোকের স্পন্দন, এ-পারের আকৃতির মধ্যে ও-পারের প্রকৃতির আবেশ, প্রয়োজন এই সূর্যস্নান।

বৈদিক ঋষি তাঁর এক মন্ত্রে সুন্দর এক চিত্র দিয়েছেন এই প্রসঙ্গে। তিনি বলছেন—চর্মকার যেমন পশুর চামড়া ছাড়িয়ে পাট করে ধরে, বরুণদেব তেমনি পৃথিবীকে খুলে প্রসারিত করে ধরেন সূর্যালোকের কাছে—

বি যঃ জঘান শমিতা ইব চর্ম উপ স্তিরে
পৃথিবীম্ সূর্যায়।

অন্য কথায়, আমরা যেমন বলেছি, পৃথিবীকে অর্থাৎ একান্ত জড় সত্তা ও চেতনাকে সূর্যস্নাত করতে হবে আর এ কাজটি করেন বরুণদেব যিনি হ'লেন বৃহতের সত্তা, বৃহতের চেতনা—যেখানে অহংএর নিঃশেষ বিলুপ্তি ; আর বরুণদেবের অনুগ্রহ লাভ করতে হ'লে হতে হবে শ্রদ্ধাশীল, শ্রদ্ধাবনত।

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(নামের ব্যাখ্যা সহ)

২৪১—নাস্তিকতাবাদ হলো নানা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংকীর্ণ ধর্মরীতি ও হীনতার বিরুদ্ধে বিপরীত প্রতিবাদস্বরূপ। ভগবান তাদের সংকীর্ণতার তাসের ঘরগুলি ভাঙবার জন্য নাস্তিকতাকে পাথরের মুদ্গরস্বরূপ প্রয়োগ করেন।

২৪২—"ধর্মের" নামের ধ্বজার আড়ালে মানুষ কতই ঘৃণা ও অন্ধতাকে জড়ো করেছে!

না, ওর কোনটা ভালো? ধর্ম কিংবা নাস্তিকতা?

উত্তর এই সব ধর্মগুলি যতকাল বজায় থাকবে ততকাল পর্যন্ত নাস্তিকতাও তার বদলা হিসাবে অপরিহার্য থাকবে। স্বার্থবুদ্ধিশূন্য ও বিশুদ্ধভাবে আসল সত্যের অনুসন্ধান ও তার ঐকান্তিক অনুসরণের জন্য দুই রকম জিনিসই লোপ পাওয়া উচিত। ২১-১২-১৯৬৯

২৪৩—ভগবান যখন তোমার লোভকে তীব্র ক'রে তোলেন তখনই তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যান, যখন তিনি নির্মমরূপে শাস্তি দেন তখনই তিনি পুরো ভালোবাসেন, যখন প্রবল বিরুদ্ধতা করেন তখনই তিনি সব চেয়ে সহায়ক হন।

২৪৪—ভগবান যদি মানুষকে লোভ না দেখাতেন তাহলে জগৎ কবে উচ্ছন্ন হয়ে যেতো।

২৪৫—ভিতরে ভিতরে লুব্ধতাকে সহিয়ে নাও যাতে তোমার নিম্নমুখী আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের দ্বারা নিজেকে ক্লিষ্ট ক'রে ফেল।

২৪৬—বিশুদ্ধ হবার জন্য নিজেকে যদি তুমি ভগবানের হাতে ছেড়ে দাও তাহলে তিনিই তোমার দোষত্রুটিগুলিকে ভিতরে ভিতরে ঘুচিয়ে দেবেন; কিন্তু নিজের জোরে যদি তা করতে যাও তাহলে বাহ্য নানারকম পাপ ও দুর্ভোগের খপ্পরে গিয়ে পড়বে।

২৪৭—লোকে যাকে মন্দ বলে তার সব কিছুই যে মন্দ তা বলোনা, কিন্তু ভগবান যা পছন্দ করেন না তা প্রত্যাখ্যান করবে; লোকে যেটা ভালো বলে তার সব কিছুই যে

ভালো তা বলো না, কিন্তু ভগবান যাকে ভালো বলে গ্রহণ করেন তাকে ভালো বলে মেনে নিও।

না, ভগবানে সমর্পণ করা হলে তখন কি আর ব্যক্তিগত ইচ্ছা কিংবা বাছাবাছি করার ক্ষমতা বাড়াবার দরকার থাকে? ওগুলো কি বাধাস্বরূপ হয় না?

উত্তর: ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও পছন্দ থাকা তাদের পক্ষেই দরকার যারা সাধারণ অজ্ঞানতা ও মোহের মধ্যে বাস করে। কিন্তু ভগবানে সমর্পণ করা হলে তখন ঐসব ছাড়তে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকে যারা বলে যে তারা ভগবানে সমর্পিত, তারা তথাপি নিজেদের অহংকে বেশ সক্রিয় করে রাখে, তাই তারা ভগবৎ ইচ্ছার কথা জানতে পারেনা; ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও পছন্দকে ছেড়ে দিতে গিয়ে অসংযত ও খেয়ালী হয়ে ওঠে।

প্রথমে চাই ঐকান্তিক হওয়া, যাতে নিজের কাছে নিজেকে প্রতারণা করা না চলে, তারপর দেখতে হবে যে প্রকৃতই তুমি ভগবৎ ইচ্ছাতে পরিচালিত হচ্ছ।

২২-১২-১৯৬৯

২৪৮—জগতের মানুষ দুইরকম আলো ধরে চলে—কর্তব্য আর আদর্শ। কিন্তু যে গেছে ভগবানের দিকে তার পক্ষে ওগুলি ঘুচে গিয়ে সে চলে তার বদলে ভগবৎ ইচ্ছাতে। তাতে কেউ যদি তোমাকে গালি দেয় তো সেটা গ্রাহ্যই করবে না; হে দিব্য যন্ত্র, তুমি চলবে বায়ুর মতো, সূর্যের মতো, পালনও করবে ধ্বংসও করবে।

২৪৯—লোকের প্রশংসা কুড়োবার জন্য ভগবান তোমাকে তাঁর সৃষ্টি করেননি, তিনি তোমাকে সৃষ্টিতে নিয়েছেন তাঁরই কাজ নির্ভয়ে করবার জন্য।

২৫০—জগৎটাকে ভগবানের রঙ্গালয় বলে মেনে নাও; আর অভিনেতার মুখোস পরে তোমার মাধ্যমে তাঁকেই অভিনয় করতে দাও। তাতে যদি লোকে তোমার সুখ্যাতি বা নিন্দা করে, জেনো যে তারাও সব মুখোস; ভগবানই সেখানে দর্শক ও সমালোচক।

উত্তর প্রথম দরকার হলো ভগবৎ ইচ্ছাকে জানা, সেখানে তোমার আপন ইচ্ছা বা কামনা কিছু থাকবে না। আর তার জন্য শ্রেষ্ঠ উপায় হলো তোমার সমস্ত আশ্বাকে ভগবৎ-পূর্ণতার দিকে জাগিয়ে রাখা, বিনা ব্যতিক্রমে ঐদিকেই নিজেকে সমর্পিত রাখা, তাহলে বাকি যা দরকার তা ওরই ফলে আপনা হতে হয়ে যাবে।

২৩-১২-১৯৬৯

২৫১—কৃষ্ণ যদি একাই থাকেন একদিকে, আর অন্যদিকে থাকে জগতের সমস্ত লোকলস্কর ও অস্ত্রশস্ত্রাদি, তবু সেই একের দিকটাই বরণ ক'রে নেবে। লোকলস্করে সেই সব অস্ত্রশস্ত্রাদিতে তোমার দেহকে ছিন্নভিন্ন করে পায়ের চাপে তোমাকে দলিত মথিত

ক'রে পথের ধারে ফেলে দেয়, তবু জানবে যে তোমার মন ছিল অবিশুদ্ধ আর দেহটা ছিল জড়পিণ্ড। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও আত্মা তোমার জয়ী হবে।

উত্তর একথা বলার অর্থ হলো যে সমগ্র জগতের বিরোধিতা সত্ত্বেও যেখানে কেবল মন ও দেহের জোর কাজ করে, সেখানে একা ভগবৎ সত্যের শাশ্বত শক্তিই জয়ী হবে।

২৬-১২-১৯৬৯

২৫২—যদি মনে করো যে শেষে তোমার পরাজয় ঘটবে, তাহলে নিজের শক্তি বেশি থাকলেও সেখানে লড়তে যেও না। কারণ ভাগ্য কেউ কিনে নিতে পারে না, আর শক্তিও সুনিশ্চিত বাঁধা থাকেনা। তবে পরাজয়ই শেষ কথা নয়, তাও একটা সূচনা বা দরজা মাত্র।

২৫৩—তুমি বলো তুমি পরাজিত। বরং বলতে পারো যে ভগবান তাঁর একটা উদ্দেশ্যকে নিয়ে তোমার চারদিকে ঘোরাঘুরি করছেন।

২৫৪—জগতের কাছে হেরে গিয়ে তুমি ভগবানকে আঁকড়াতে যাও। জগৎ যদি তোমার চেয়ে বেশি শক্তি ধরে, তবে ভগবান কি তার চেয়ে কম শক্তিধর? বরং তাঁর ডাক দেওয়া কামনা করো আর চাও যে তাঁর শক্তি যেন পূর্ণতা এনে দেয়।

না, ভগবান কেন উদ্দেশ্য নিয়ে ঘোরাঘুরি করবেন? ইচ্ছা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সব কিছু অনায়াসে সফল করতে পারেন, তাহলে সব কিছুই তো সহজ হয়ে যায়।

উত্তর শ্রীঅরবিন্দ এমন কথা বলেননি যে ঘোরাঘুরি করাই তাঁর প্রয়োজন হয়, কারণ তিনি সর্বশক্তিধর, কিন্তু যেমন ভাবে মানুষ তা বোঝে সেই ভাবে নয়।

এ কথা বুঝতে হলে জানতে হবে যে সমগ্র বিশ্বে এমন কিছু নেই যা তাঁর সর্বজ্ঞ ইচ্ছার অভিব্যক্তি নয় আর সে কথা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হতে পারলে তবেই জানা যাবে, যা মনের ভিতর দিয়ে জানা নয় কিন্তু চেতনা ও দৃষ্টির ভিতর দিয়ে একপ্রকার জানা। মানুষের সাধারণ চেতনাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলেও মানুষ এই সৃষ্টির সম্বন্ধে কণিকামাত্রই জানতে পারে, সুতরাং এর কোনো কিছু বুঝতে কিংবা বিচার করতে সে আদৌ সক্ষম হয় না।

আর আমরা যদি আমাদের জগতের রূপান্তর ঘটা ত্বরান্বিত করতে চাই তাহলে সব চেয়ে ভালো কাজ হবে যিনি সর্বজ্ঞ তাঁর হাতে নিজেকে নিঃশেষে অবারিতভাবে সমর্পণ ক'রে দেওয়া।*

২৮-১২-১৯৬৯ —শ্রীমা

---

* অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

১১ নভেম্বর, ১৯৫৩

(মা তাঁর Quelques Paroles থেকে পড়ে শোনাতে শুরু করলেন)

এর প্রথম অংশটি লেখা হয়েছিল ১৯১২ সালে, তখন তোমরা অনেকে জন্মাওনি। প্রায় বারো জনকে নিয়ে একটা দল ছিল, সপ্তাহে একদিন মিলিত হতো। একটি করে প্রশ্ন দেওয়া হতো, প্রত্যেক ব্যক্তি পরের সপ্তাহে তার জবাবটি লিখে আনতো। আমিও জবাব লিখে এনে সেটি পড়ে শোনাতাম। এর প্রথম অংশে তাই আছে, দুটি মাত্র জবাব। অন্যগুলো প্রকাশিত হয়েছে Words of Long Ago বইখানিতে।

মিটিং হয়েছিল চারটি। প্রথম মিটিংএ প্রশ্ন ছিল কোন লক্ষ্যতে পৌঁছনো চাই, কোন কাজ করা চাই, কেমন ভাবে? আমার উত্তর ছিল :

(৭ মে, ১৯১২ তারিখ) সাধারণ লক্ষ্য ক্রমবর্ধিত বিশ্বসংগতির অভ্যুদয় হোক।

অর্থাৎ যার নামে অতিমানস।

সে সময়ে আমি শ্রীঅরবিন্দকে জানতাম না, তিনিও তখন এই নিয়ে লেখেননি।

প্রশ্ন "যিনি অচিন্তনীয়, পৃথিবীতে তাঁর তিনটি স্বরূপ, সাতটি লক্ষণ, ও দ্বাদশ গুণের প্রতিনিধিস্বরূপ হওয়া এই পৃথিবীতে" সেগুলি কি কি?

উত্তর : এখন তা স্মরণ নেই। তিনটি স্বরূপ হলো প্রেম, আলো, জীবন—যার সঙ্গে মিলে যাবে সৎ-চিৎ-আনন্দ। আর সাতটি লক্ষণের তালিকা একটা কোথাও আছে। প্রবাদে বলে যে জগৎ সৃষ্টি সাতবার করা হয়েছে, অর্থাৎ প্রথম ছয় বারের সৃষ্টি স্রষ্টার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। তাকেই বলে প্রলয়। শেষ বারের সপ্তম সৃষ্টিতেই আমরা রয়েছি, এই সৃষ্টি স্থায়ী হবে, এটি সামঞ্জস্যযুক্ত সৃষ্টি। এই সামঞ্জস্যের উদ্দেশ্য নিয়ে ছয় বার সৃষ্টি হয়েছিল, উদ্দেশ্য অপূর্ণ হওয়াতে পরে পরে আবার নতুন ক'রে সৃষ্টি হয়েছিল, প্রতিবার উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিয়ে একটা নির্দিষ্ট ধারাতে। প্রবাদে বলে যে এবারকার সৃষ্টিটি শেষ সৃষ্টি, সদ্গতিরূপার আদর্শে। তার মানে জগতে আর প্রলয় হবে না, এ সৃষ্টি উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে যাবে, সদ্গতি এর মূল কথা।

সুতরাং এখন এর মধ্যে ভালো আর মন্দ বলে কিছু নেই, কেবল সামঞ্জস্য আর অসামঞ্জস্য, সদ্গতি আর অসদ্গতি। তারই উপর এর স্থিতি।

আর দ্বাদশ রকম গুণের কথাও লেখা হয়েছিল। জগৎকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঐ দ্বাদশ গুণের দ্বারা সব কিছু সামঞ্জস্যযুক্ত হবে। তাহলে জগৎ উত্তরোত্তর সুসংগতভাবে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে, এর আর ধ্বংস হবে না।

প্রশ্ন "জগৎকে আবার দিতে হবে সেই শাশ্বত বাক্য, বর্তমান মনের পক্ষে উপযোগী ক'রে, যাতে থাকবে সকল মানবীয় জ্ঞানের সংশ্লেষণ"—কী সেই শাশ্বত বাক্য?

উত্তর ওর মানে যা শাশ্বত সত্য। একটিই সেই শাশ্বত সত্য আছে যা প্রকাশ পায় বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে, তার বিকৃতিও হয়। সুতরাং সেই সত্যের মূলে পর্যন্ত যেতে হবে, যা নাকি মূল শাশ্বত বাক্য, সকল বাক্যের যা আদি। যে শাশ্বত বাক্যের দ্বারা জগৎ সৃষ্ট, যা তাবৎ সকল কথা ও সকল চিন্তার মূলে।

প্রশ্ন: "লক্ষ্যে পৌঁছনোর" কথাটা বুঝতে পারিনি।

উত্তর কী বলেছি ওতে? পৃথিবীতে সঙ্গতির কথা নয় কি?

প্রশ্ন ওতে আছে "পৃথিবীতে মানব-ঐক্য স্থাপনা, সকলের মধ্যে অন্বিতীয় ভগবানের অস্তিত্বকে জাগ্রত করা। তার জন্য প্রয়োজন হবে—(১) প্রত্যেকের নিজেকে জানা এবং সকলের মধ্যে একই ভগবানের উপস্থিতি জানা।"

উত্তর হাঁ, ওকথা বুঝলে না? পঞ্চাশ হাজার বারই ঐ কথাই বলেছি। এবার বুঝলে? (হাস্য)

প্রশ্ন (২) সত্তার এমন অবস্থা যা ইতিপূর্বে কখনো মানব-চেতনাতে আসেনি, যার দ্বারা পৃথিবীতে এক বা একাধিক বিশ্বশক্তির সংস্পর্শ ঘটবে, এতাবৎ যা আটকে ছিল।"

উত্তর তার মানে চেতনার এমন এক পরাচেতন নতুন অবস্থা আসা যা পৃথিবীতে এতাবৎ অভিব্যক্ত হয়নি, তাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন অতিমানস। কথাটা একই। তার মানে সৃষ্টির গভীরে বা উপরে সেই অবস্থাতে পৌঁছে যাওয়া যা এখনই অনভিব্যক্ত এবং চেতন হয়ে তাকেই অভিব্যক্ত করা। শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেছেন অতিমানস, তাকেই আমি বলেছি চেতনার অনভিব্যক্ত অবস্থা (মানুষ যা কখনো জানেনি)। সেই অবস্থাকে বাহ্য চেতনাতেও এনে এখানে ক্রিয়াশীল করা। তারপর বলেছি সেই অবস্থাকেই এখানে এনে ফেলা চাই, যদিও আমি তখন আদৌ জানতাম না যে শ্রীঅরবিন্দও ঠিক এমনি কথাই বলবেন।

প্রশ্ন (৩) "জগতের কাছে বর্তমান মনের উপযোগী ক'রে নতুন ভাবে শাশ্বত বাক্যটি বলা"।

উত্তর অর্থাৎ সেই পরম সত্য, সুসংগতি। শ্রীঅরবিন্দ সেই কাজই বারবার ক'রে গেছেন, আর পৃথিবীতে তার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, যদিও ঐ কথাটা আমি বলেছি ১৯১২ সালে। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ১৯১৪ সালে, অর্থাৎ তার দুই বছর পরে।

প্রশ্ন (৪) "সম্মিলিতভাবে কোথাও এমন এক আদর্শ সমাজ গড়ে তোলা যেখানে ভগবানের পুত্রেরা এক নবজাতির অভ্যুদয় ঘটাবে।" মা, আপনি এই আশ্রম গড়ে তোলার সংকল্প কোনখানে করেছিলেন?

উত্তর কোনখানে? আমি কোনো সংকল্পই করিনি। কেবল ঐ কথাই বলেছিলাম যে অমন হওয়া চাই। আশ্রম সম্বন্ধে কোনো ধারণাই ছিল না, তবে ভারতে আসার সম্বন্ধে খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু ওরূপ সংকল্প কখনো করিনি, শুধু বলেছিলাম যে অমন হওয়া দরকার।

অতঃপর অন্য প্রশ্ন: মায়ের "কথাবার্তা" থেকে "সমাজে দুই জাতের মানুষকে তফাৎ ক'রে দেখা হয়—বদান্য আর লোভী, মুক্তহস্ত ও কৃপণ। কৃপণকে সবাই নিন্দা করে, আর বদান্যের উদারতার জন্য সবাই তার প্রশংসা করে। কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দুজনকে একই স্তরে দেখা হবে; বদান্যতা ও কৃপণতা দুইই একই উচ্চতর সত্যের বিকৃতি। একরূপ দিব্যশক্তি চায় তার সকল সম্পদকে সকল দিকে মুক্তহস্তে ছড়িয়ে দিতে, বাস্তবের থেকে আধ্যাত্মিকের স্তরে পর্যন্ত। বদান্য ব্যক্তির আত্মার ঐরূপই ধারা, সে তাই তদনুসারে ঐ শক্তির ক্রিয়ার পক্ষে সহায়তা করে, চারিদিকে ভিতরণের শক্তিও সে পায়। অন্যপক্ষে আর একরূপ দিব্যশক্তি চায় সঞ্চয় আহরণ, সংবরণ। সে সকল দিক থেকে সব কিছু গুটিয়ে এনে আপন অধিকারে জড়ো করতে চায়। যাকে তুমি লোভী ও কৃপণ বলে নিন্দা করছ সেই ঐ শক্তিরই যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করে। সামগ্রিক দৃষ্টিতে দুইই দরকার, একদিকে যেমন ছড়ানো অন্যদিকে তেমনি গোটানো।"

মা, "আত্মার ধারা" বলতে কি বোঝাবে।

উত্তর: কোথায় বলেছি? (পড়ে দেখে) ও হাঁ! অর্থাৎ যার আত্মার যেমন ধাঁচ ধরন, প্রবণতা। যেমন আমরা বলি বিভিন্ন রকম পশুদের বিভিন্ন রকম ধারা, তেমনি মানুষের বেলাতেও আছে বিভিন্ন ধারা। তাকেই আমি বলেছি তার আত্মার ধারা। এই ধারা ক্রমাতিব্যক্ত, অবিনশ্বর। একে ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের একরূপ ধর্ম বলা যেতে পারে, সেটাই তার কাছে সত্য।

প্রশ্ন: বদান্যতাও কি সত্যের বিকৃতি?

উত্তর: হাঁ, মানবদের সব গুণই কোনো সত্যের বিকৃতি। তোমরা যাকে দোষ-গুণ বলো তার পিছনে যে সত্য আছে তা দোষও নয় গুণও নয়। আগেই বলেছি যে বদান্যতার পিছনে যে সত্য আছে তা দোষও নয় গুণও নয়। আগেই বলেছি যে বদান্যতার পিছনে আছে বিতরণকারী শক্তির ক্রিয়া। কিন্তু কোথাও একত্রে জড়ো করা থাকলে তবেই তো তার বিতরণ হবে। এ কাজ হয় নাড়ির গতির মতো, একবার গোটানো একবার ছড়ানো, আবার গোটানো আবার ছড়ানো। কারণ কিছুই জড়ো না করে কেবল যদি তুমি

বিতরণই করতে থাকো, তাহলে শীঘ্রই তোমার সম্বল ফুরিয়ে যাবে। সকল শক্তির বেলাতেই এই কথা। আমি বলেছি (কিংবা লিখবো) যে অর্থও একটা শক্তি, তা ছাড়া কিছু নয়। এ শক্তি কারো অধিকারের জিনিস নয়। যেমন, আলোকে যদি শক্তি বলো, তাহলে বলতে পারোনা যে এই আলোটা আমার জিনিস, আমি একে নিজের ঘরে রাখবো, কাউকে দেবোনা। অর্থের বেলা লোকে মোহগ্রস্ত হয়ে ভাবে যে এটা আমার ব্যক্তিগত অধিকারের জিনিস। আমি কাগজে জমিয়ে রাখার কথা বলছি না, যেমন কেউ আলোকে ল্যাম্পের মধ্যে ভরে রেখে বলে এটা আমার আলো। তুমি নোট কিংবা টাকা জমিয়ে রেখে ভাবছ যে এটা আমার টাকা, কিন্তু তা শুধুই টাকা নয়, তার পিছনে রয়েছে লেনদেন করার শক্তি, সেটাই তার অর্থ যা কারো সম্পত্তি নয়। সে শক্তি যত কাজে ঘুরবে ততই তা জীবন্ত হবে। জমিয়ে ঘরে রেখে দিলে তার ক্ষয় হবে। কলসীতে জল যদি খরচ না ক'রে বরাবর একভাবে তাকে রেখে দাও তাহলে সে জল কিছুদিন পরে পচে যাবে, অর্থের বেলাতেও সেই কথা। লোকে এই কথাটি বোঝে না। এ নিয়ে আমি লিখবো। চিরদিন এমন চলতে পারে না।

প্রশ্ন বাস্তব পদার্থের জন্য যে লোভ...

উত্তর সকল কিছুর জন্যই লোভ ও কৃপণতা, এমন কি আধ্যাত্মিকের বেলাতেও হয়। এমন শক্তিকৃপণ আছে যারা শক্তি পেয়ে নিজের মধ্যে আটকে রেখে দেয়, কাউকে সে শক্তি দান করতে চায় না। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে জমা ক'রে রাখার শক্তিও দরকার যাতে বিতরণের শক্তি কাজ করতে পারে। যদি ওর মধ্যে একটিমাত্র শক্তিই তুমি রাখো তাতে ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাতেই কৃপণতা বাড়ে, অপচয় ঘটে। দুই তরফেরই সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্রিয়া চাই, তবেই ভারসাম্য থাকবে। দুই দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখাই হলো আসল কথা, বুদ্ধ যাকে বলেছেন "মধ্য পথ"। এমনি দুদিক সামঞ্জস্য রেখেই কাজ করতে হবে, যেমন কেউ দড়ির উপরে পা দিয়ে চলবার সময় লাঠির উপর ভার রেখে তবে চলে।

যে ব্যক্তি খুবই বদান্য তার যদি গোড়াতে কিছু সম্বল না থাকে তাহলে সে ইচ্ছা থাকলেও কিছু দিতে পারে না। সুতরাং সে যদি আগে নিজে কিছু না জমায় তখন অন্য কেউ তার হয়ে জমাবে। কারণ তার নিজের পকেটে কিছু না থাকলে কিছুই সে কাউকে দিতে পারবে না! সুতরাং দেবার বা বিতরণের শক্তিও যেমন দরকার, সঞ্চয় বা জমাবার শক্তিও তেমনি দরকার। আর এই দুই শক্তির মধ্যে যদি অহং থাকে, তখনই তা হয়ে পড়ে বিকৃত, তার আর মূল্য থাকে না।

—শ্রীমা

পথের কথা

৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

আসন্ন ২১ ফেব্রুয়ারির বাণী—"পূর্ণ ঐকান্তিকতা বাস্তব ক'রে তুলতে হলে মূল প্রয়োজন হলো চৈত্যসত্তাকে ঘিরে সবগ্র আধার ঐক্যবদ্ধ ক'রে ধরা।"

শ্রীমা

আমি লক্ষ্য করেছি যে লোকেদের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব থাকে তার কারণ তাদের সত্তার এক অংশ একরকম আর অন্য অংশ অন্যরকম বলে। তাতেই তাদের আন্তরিকতা আসতে পারে না।

ভক্ত : কিন্তু চেতনাতে একটা স্থায়ী রকমের ভাব আনতে পারা তো কঠিন কথা, যাতে সব সময় চেতনা একই ভাবে কাজ করবে।

মায়ের উত্তর কিন্তু সত্তার সকল অংশগুলি একদিল হলে তা আর হবেনা গো ছেলে। আমার বেলাতে তা বরাবরই একরকম ছিল, বছরের পর বছর (সরল রেখা টেনে ভঙ্গী করলেন)। সেটা হয় চৈত্যসত্তা থেকে, বরাবর সমান।

অদিলের অবস্থার চেতনা কিছু কিছু পেয়েছি সম্প্রতি, কিন্তু অন্ততপক্ষে ত্রিশ বছর (বস্তুত ৬৫ বছর) তা ছিল না। চৈত্যসত্তা যেমনি সকল কিছুর উপর তার দখল রাখতে শুরু করলে অমনি সব অদিল পেয়ে গেল—তারপর থেকে এমনি সোজা সরল রেখা (ইঙ্গিত) বরাবরের মতো সেই একই ভাব। অর্থাৎ তোমার যেমন ইচ্ছা, তোমার যেমন ইচ্ছা। আর এই "তুমি" এমন কেউ নয় যে অনেক দূরের উপরের, যাকে কেউ জানে না। এই তুমি রয়েছেন সর্বত্র সব কিছুর মধ্যে। সমস্তই তিনি। সত্তার ভিতরেও তিনি—তাঁকেই আঁকড়ে থাকো, এই হলো একমাত্র উপায়।

এটা আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করলাম যে কেন মানুষ ঐকান্তিক হয় না। (ঐকান্তিক হবার চেষ্টা করলেও) তার কারণ তাদের এক অংশ, আবার অন্য অংশ, আবার তৃতীয় অংশ তা হতে দেয়না; যদি একটা অংশ ঐকান্তিক হয়, অন্যগুলো তাতে সায় দেয় না।

ভক্ত : হাঁ, তার মানে তাহলে চৈত্যকে ঢুকতে হবে দেহচেতনার মধ্যে।
মা : হাঁ, তাই।

ভক্ত : কারণ ওরই দ্বারা সব কিছু স্থায়ী হতে পারে।
উত্তর : হাঁ।

ভক্ত সাধারণ চেতনার মধ্যে চৈত্যের প্রবেশ করা চাই।
উত্তর হাঁ।

ভক্ত সে কিন্তু বড় কঠিন কথা।

উত্তর কিন্তু ছেলে, আমার তো তাই হয়ে গেছে ত্রিশ বছর আগে। চৈত্য চেতনাই আমাকে বরাবর পরিচালিত করেছে। সমস্ত ভাবগুলি তার সামনে ধরা হয়েছে (সার্চলাইটের সামনে ধরার মতো) আর সে কেবল নির্দেশ দিয়েছে। আর চৈত্য কেবল কান পেতে শুনেছে ভগবানের কি নির্দেশ। এই ভাবটি সর্বদাই ছিল এখানে আসার আগে, এই ভাব নিয়েই এখানে আমি এসেছিলাম। সে ভাবের নড়চড় হয়নি। কেবল সম্প্রতি পেলাম অমিলের অনুভব, একদিন রাত্রে কয়েক ঘন্টার জন্য, সে মারাত্মক ব্যাপার। আমাকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে অন্যান্য সকলের বেলা কেমন হয়, যখন চৈত্য সত্তা উপস্থিত না থাকে।

দেহটা কেবল শুনছে, শুনছে, কান পেতে শুনছে (উপরে ও ভিতরের দিকে ইঙ্গিত), কিন্তু ভগবৎ আদেশ বাক্যের দিকে নয়, ইচ্ছা রূপে তার প্রকাশের দিকে (অবতরণের ইঙ্গিত)।

ভক্ত আপনি বললেন সমগ্র সত্তার ঐক্য স্থাপনের কথা।
উত্তর : হাঁ, তার মানে দেহ সমেত।

২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২

২৯ ফেব্রুয়ারির বিশেষ দিনের বাণী—"অতিমানস যখন দেহমানসে অভিব্যক্ত হবে কেবল তখনই তার উপস্থিতি স্থায়ী হবে।" শ্রীমা

এটি হলো আসলে শ্রীঅরবিন্দের বাণী, যদিও ওরা বলে এটা আমার বাণী। এটি লিখেছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, আমি কেবল বলেছি যে শ্রীঅরবিন্দ ওখানে permanently শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

ভক্ত কিন্তু মা, এ অনুভূতি তো আপনারই, সুতরাং...
(মা হাসলেন, তারপর নীরব থেকে বললেন)

উত্তর : কিন্তু কাজটা যখন হবে তখনই ও-কথা বলা ভালো ! যখন তা স্থায়ী হবে তখনই...কিন্তু আপাতত (এদিক ওদিক হেলে ভঙ্গী করলেন)

ভক্ত : দেহাত্মক মনের শিক্ষা...কোনদিক দিয়ে শুরু করি জানিনা। দেখছি খুবই কঠিন।

উত্তর : খুবই কঠিন। শুরু করতে হবে ইচ্ছামাত্রে নীরব হওয়া দিয়ে। যে-কোনো মুহূর্তে যেন তুমি নীরব হতে পারো। এই হবে শিক্ষার সূত্রপাত।

ভক্ত : কিন্তু সেটা খুব কঠিন নয়, এক সেকেণ্ড চেষ্টা করলে নীরব হওয়া যায়। যতটুকু একাগ্র থাকবো ততটুকু নীরব থাকবো। কিন্তু একাগ্রতাতে একটু ঢিল পড়লেই তা হয়ে গেল...(না হাসলেন) তখন মন এদিক ওদিক সরে যায়।

উত্তর : মন এখন আর ছুটে বেড়ায় না। এই অভ্যাসটি ছাড়া চাই।

ভক্ত কেমন করে তা হবে ?

উত্তর বলতে পারবো না, কারণ আমার বেলাতে তা আপনা হতেই হয়েছে। কেবল যখন কেউ আমার কাছে আসে কিংবা কোনো কিছু এসে আমাকে নাড়া দেয়... তা ছাড়া আপনা হতেই ওটা থাকে ঐদিকে (উপরের দিকে ইঙ্গিত)। হয়তো সেটাই হলো উপায়, উপরের দিকে মন রেখে এই ভাবে ভগবানকে স্মরণ করা।

(হেসে নীরব হলেন)

হাঁ, সেই স্বাভাবিক অবস্থা। আশ্চর্য্যের কথা, এটা দেহচেতনাতে তর্জমা হয়ে দাঁড়ায়, দেহ যেন একটা শিশুর মতো তাঁর ক্রোড়াশ্রিত হলো, ভগবান যেন এই দেহকে জড়িয়ে রাখলেন। (ইঙ্গিত করলেন)

(নীরব থেকে)

ঠিক মনে নেই, দুই তিন দিন আগে যখন খুব কষ্টবোধ করছিলাম, তৎক্ষণাৎ মনে হলো যেন আমি কোলের আবেষ্টনের মধ্যে আবৃত হলাম, শিশুর মতো ভগবানের কোলে আশ্রয় পেলাম, ঠিক এইরকম। কিছুক্ষণ পরে কষ্ট থেমে গেল। দেহ যদিও তা চায়নি তবু কষ্ট চলে গেল। কিছুটা সময় লাগল, কিন্তু তারপর চলে গেল। অসাধারণ কথা, আমি এই দেহে ভগবানের কোলে আশ্রয় পেলাম ঠিক শিশুর মতো (ইঙ্গিত)।

(নীরব থেকে)

কিছু সময়ের জন্য এইভাব চলে..."তোমার যেমন ইচ্ছা, তোমার যেমন ইচ্ছা।" তারপর তাও থেমে যায়। (হাত প্রসারিত ক'রে নিবেদনের ভঙ্গী)

ভক্ত : একাগ্রতার ধারা বদলানো দরকার।

উত্তর : হাঁ।

ভক্ত : কারণ যখন দেহমানসের ধারা অনুসরণ ক'রে এদিক ওদিক সরে যাই তখন কিন্তু মনের মধ্যে একাগ্র হয়ে নীরবতা আনতে পারি, সুতরাং মনের ধারাই তখন গ্রহণ করি। কিন্তু মন যেমন একটু শৈথিল্য পায় তখনই মুশকিল...উপরের কিছু নেমে অধিকার করা চাই।

মা শিশুর মতো সরল অসহায় হওয়া বুঝলে : কোনো কিছু "ভেবেচিন্তে" নয়, "ইচ্ছার" জোরে নয়, আপনা হতে সহজে ঐ অবস্থায় যাওয়া চাই (মা হেসে হাত খুলে দেখালেন)। যতক্ষণ তুমি নিজে ইচ্ছা করছ, নিজে চেষ্টা করছ ততক্ষণ বৃথা (হাসলেন)।

(মা ধ্যানস্থ হলেন)

ভক্ত : ভগবান কি আমাদের দিকে দেখছেন না ?

উত্তর (হেসে) হাঁ, আমার তো তাই মনে হয় ! (ভক্তের হাত ধরে) তুমি কি তাঁকে অনুভব করোনা ?

ভক্ত : করি না।

মা আ।

৮ মার্চ, ১৯৭২

একটি দুর্ঘটনা সম্বন্ধে।

এমনিই হয়। অমোঘ আদেশের মতো। সোজা পথে চলো, নতুবা সব বিগুড়ে যাবে।

ব্যাপার মারাত্মক হয়ে উঠেছে। একটা যেন নিদারুণ চাপ পড়ছে উন্নতি আনার জন্য। আমার দেহে সেটা আমি বোধ করি। কিন্তু দেহ তাতে ভীত নয়, সে বলে (হাত খুলে ধরেন) "বেশ, এবার যদি আমার শেষ হয় তবে তাই"। প্রতি মিনিটে সেই কথা, হয় সত্যবস্তু হোক নতুবা নিঃশেষ (টেবিলের উপর মুষ্টিপাত)।

কিছু একটা নেমে এসেছে, আমি জানি, বলেছিও সে কথা, শীঘ্রই একদিন তা আমরা জানতে পারবো। সেই লেখাটি তুমি কি পড়োনি ?

ভক্ত হাঁ, ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে।

মা ঠিক তাই। আধাআধি নয়, আপস টাপস নয়...একেবারে নির্ঘাত পুরো (মুষ্টিপাত)। দেহের বেলাতেও তাই, প্রতি মিনিটে ঐ কথা, হয় জীবন নতুবা মৃত্যু। কত কত শতাব্দী ধরে যা চলে আসছে, ভালোও না মন্দও না, কেবল একটা আপোস, তা আর নয়। দেহ জানে যে এই ভাবে অতিমানসিক দেহ গড়ে উঠবে ; সম্পূর্ণ

ভগবৎ প্রভাবের মধ্যে থেকে, কোনো আন্দাজ করা নয়, "আসছে" বলা নয়, একেবারে অমোঘ সুনিশ্চিত ইচ্ছা (মুষ্টিপাত)

কিন্তু...দ্রুত অগ্রগতির পক্ষে এই মাত্র পন্থা।

(নীরব হলেন)

ভক্ত : কিন্তু আমি যখন রূপান্তরের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা বুঝতে শুরু করি এবং তার জন্য কিছু করতে যাই, তখন দেখি যে দেহবস্তুতে আঘাত লাগলেই তখন সে কথাটা স্মরণ হয়, যখন দুই একদিন জোর আস্পৃহা থাকে, তার পরেই তা ঢিলা হয়ে যায়।

মা : ঠিক, ঠিক।

ভক্ত : তখন যেন চেষ্টার দিকের অক্ষমতা।

মা : অক্ষমতা নয়, মন্দ ইচ্ছা। যাকে আমরা অহং বলি, তাই,—জড়দেহের অহং। যে বশ মানতে চায়না। তা আমি জানি। এই আমার দেহটাকে তাই সব সময়ে ধরছি, টানছি, সর্বত্র। দেহে তার চিরেতেতালা চালে চলতে চায়।

ভক্ত তাতেই আস্পৃহার ও চেষ্টাতে শৈথিল্য আসে।

মা হাঁ, তাই হয়।

ভক্ত : তাহলে কি করা? প্রত্যেক বার তাকে টেনে রাখতে হবে নাকি?

মা : হাঁ। কিন্তু তা স্থায়ী হবেনা যদি ভগবানের সঙ্গে তার সত্যিকার সংযোগ না থাকে। এইরকম ক'রে যদি থাকো (উপরদিকে মুঠো ক'রে দড়ি আঁকড়ে ধরার ভঙ্গী) তাহলে চরম মুহূর্তে তা আপনা হতেই সঠিক দিকে চলে যাবে। হাঁ, সেটা আপনা হতেই হবে। যেন তুমি বোধ করছ যে তুমি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে এসে পৌঁছেচ, সেই মুহূর্তে তুমি ঠিক সঠিক ভাবটাই গ্রহণ করবে, তোমার সেই বিশেষ অংশটি ঠিক দরকারের দিকেই গিয়ে পড়বে। সহজে ও স্বাভাবিক রীতিতে সেটা হয়ে যাবে। আশ্চর্যের কথা। কিন্তু এ বড়ো কঠিন ব্যাপার, সর্বদাই যেন বিপদের মুখে মুখে থাকা। বলা যায় না, দিনের মধ্যে হয়তো একশো বার ঐরূপ ভাব দেখা দেবে : জীবন (কোষগুলির) কিংবা বিনাশ। আর যদি কোষগুলি গুটিয়ে না যায় তাহলে সবই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কোষদেরও এইভাবে শিক্ষা হচ্ছে (হাত খুলে দেখালেন)...সবই ঠিক হয়ে যাবে।

দেহকে যেন জোর ক'রে চিরন্তনতার শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। প্রকৃতই আশ্চর্যের কথা। আর আমি দেখি যে বাহ্য ঘটনাগুলো ভয়াবহ হচ্ছে—সাধারণ ভাবে।

(মা ধ্যানমগ্ন হলেন)

আর কিছু কি বলবার আছে?

ভক্ত : না, কেবল আমি আমার মুশকিলের কথাটা বলছিলাম।

মা : ও।

ভক্ত : খুবই মুশকিল হয়। একবার, দুবার, দশবার চেষ্টা করি নিজেকে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু বুঝতে পারি যে ঠিক কাজ হচ্ছেনা, অন্য কোনো উপায়ে যদি,..যদি কোনো উচ্চশক্তি আমার হয়ে ক'রে না দেয়, তবে নিজের চেষ্টায় কিছু হবার নয়।

মা হাঁ, তাই বটে। কিন্তু শত শত অনুভূতি আসতে পারে যদি তুমি সঠিক মনোভাবটি গ্রহণ করতে পারো, তাতেই হয়ে যায়। আমরা নিজেরাই তাতে বাধা দিই, যেন নিজেরাই উচ্চশক্তির আসাতে এবং কাজ করাতে বাদ সাধি, এই জিনিসই হয়। অর্থাৎ আমাদের খুলে রাখা চাই (হাত খুলে ইঙ্গিত)।

(নীরব হলেন)

বোধ করি অবচেতনা মনে করে যে তার প্রভুত্বটা না থাকলে সব কিছুই বিগ্‌ড়ে যাবে, তাই আমার ধারণা। সে বলে খবরদার, সাম্‌লে থাকো (হাত খুলে)।*

—শ্রীমা

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা বসু

(২৮)

দেহবশ্যতা থেকে মুক্তির প্রসঙ্গে প্রাণের বাসনা কামনা বা প্রাণের মুক্তির কথা অবধারিত ভাবেই এসে যায়। Release from the heart and the mind বলতে heart-এর জায়গায় তিনি Life বা প্রাণের প্রসঙ্গ করেছেন। প্রাণ চিত্ত বা অন্তঃকরণ এবং চৈত্য (Life, heart, psychic) তিনটিই সমগোত্রীয়, প্রাণভূমিরই ব্যাপার। ইন্দ্রিয়-সংবিৎ (sensation) ভাব (emotion), ভাবনা (thought) বাসনা এবং অহন্তা, এগুলি নিয়ে যে চিত্ত গড়ে উঠেছে অহংকে কেন্দ্র করে, সেই প্রাকৃত চিত্তকে ছাপিয়ে যেতে হবে। মূঢ় ও চঞ্চল ত্রিগুণাধীন চিত্ত জ্যোতির্ময় যোগচিত্তে রূপান্তরিত হবে।

দেহ-প্রাণ-মনের ত্রিপুটি নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের যে বিচার, তার সঙ্গে বৈদিক দর্শন ও আদি বেদান্তের সহজ সরল দর্শনের যথেষ্ট মিল রয়েছে। "মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং" এই প্রদীপ্ত ঘোষণায় নির্বাণষটক শিবোহহম্‌এর পরিচয় দিয়েছেন। সেখানে "এই দেহ নই" বলে দেহকে উপেক্ষার বস্তু করা হয়নি বা সে ভাবে মনে করলে চলবে না। এর আগে দেহকে ছাপিয়ে ওঠার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, তাতে পেলাম দেহীকে প্রধান করতে হবে, দেহকে নয়। উপনিষৎ বলেছেন "মনোময় প্রাণশরীর নেতা", কাজেই শুদ্ধমন ও শুদ্ধপ্রাণ নিয়ে শুদ্ধ দেহের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। চৈতন্যযুক্ত হয়ে অর্থাৎ চৈত্যপুরুষের নেতৃত্বে দেহপ্রাণমন নিয়ে চলাই পূর্ণযোগের সাধনা। উপনিষৎ এও বলেছেন যে এই প্রাকৃত দেহ প্রাণ মনের বন্ধনেই পুরুষ প্রকৃতিতে বাঁধা পড়েছেন। তাই প্রকৃতি-পুরুষ বিবেক দ্বারা পুরুষ প্রকৃতি থেকে বিবিক্ত হলে ঐ তিনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি হন শিব এব কেবলঃ। নেতি নেতি—আমি দেহ নই মন বুদ্ধি নই—এই বিচারে সাধনার যে ধারা, নির্বাণষটকে তা সুন্দর উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত। শ্রীঅরবিন্দ ঐ নিম্ন প্রকৃতির বন্ধনকে বলেন cleavage—প্রকৃতির গুণের ক্রিয়ায় পুরুষ আটকে পড়েছেন। সেই পুরুষ বা আত্মাকে "আমি দেহ নই প্রাণ নই মন বুদ্ধি অহঙ্কার নিয়ে চিত্ত বা অহং যাতে বাসনায় জড়িয়ে সঙ্কীর্ণ হয়ে আটকে রয়েছি তাও নই," এরকম নেতিবাচক ভাবনা দৃঢ় করে ধরেই প্রকৃতিবশ্যতা হতে মুক্ত হতে হবে। সাধনার শুরুতে পুরুষকে এ ভাবে প্রকৃতি থেকে আলাদা করতেই হয়। একথা শ্রীঅরবিন্দের যোগ প্রসঙ্গে পুনঃপুনঃ বলা হয়েছে। হৃদয় বহন করে প্রাণচেতনাকে, তা জড়ত্বের কঠিন বাঁধন থেকে মুক্তি দেয়। শুদ্ধ চৈত্য-সত্তা তো হৃদয়ের কেন্দ্রস্থলেই আসন নিয়েছেন, তাই দেহপ্রাণমনকে ঐ চৈতন্যময় বলে

ভাবতে শিখলে সাধনপথে সুবিধা হয়। দেহকে শুধু জড়দেহ না মনে করে দেহবোধ সম্বন্ধে সচেতন হবার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, একথাও পূর্বে আলোচিত হয়েছে। সাংখ্য দৃষ্টিতে দেখা যায় সবই প্রকৃতির গুণের ক্রিয়ায় উদ্ভূত। দেহ প্রাণ চৈত্য ও মন এগুলি সবই স্পন্দনের সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর ক্রিয়ায় উদ্ভূত। আবার গুণের দিক দিয়ে দেখলে দেহ তমোগুণ প্রাণ রজোগুণ আর মন সত্ত্বগুণের বাহন।

আমাদের চৈতন্য যখন দেহ ছাড়া আর কিছু বোঝে না, তখন তা জড় হয়ে যায়। তমোগুণ আচ্ছন্ন করলে নিদ্রা আলস্য প্রমাদ এই সব দেখা দেয়, যাতে পুরুষ নিরেট জড় হয়ে যায়। আবার রজোগুণের ধর্ম চাঞ্চল্য দেখা দিলে ওই নিরেট জড়ের মধ্যে একটা চটফটে ভাব এসে পড়ে, তাতে প্রাণের প্রকাশ হয়। শ্রীঅরবিন্দ এই প্রাণের ক্রিয়ায় স্পন্দনের তিনটি ধর্ম দেখিয়েছেন। প্রাণস্পন্দনে প্রথমে আসে বুভুক্ষা—যা কিছু বাহির থেকে আসছে, তা সব গ্রাস করতে চায়। "যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধা রূপেণ সংস্থিতা।" তাছাড়া আছে গ্রহণ ও বর্জন, প্রাচীন পরিভাষায় যার নাম হীন উপাদান। উপাদান সংগ্রহ, করে প্রাণ প্রয়োজনীয়কে গ্রহণ করে ও অপ্রয়োজনীয়কে বর্জন করে। এ থেকে রুচি গড়ে ওঠে এবং এই রুচি এলেই মনের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। সুরুচি কুরুচি, তারপর যাতে রুচি তা না পেলে অভাববোধ এবং তা থেকে দুঃখে অস্বস্তি চাঞ্চল্য এই সব হচ্ছে প্রাণেরই দুর্গতি। তার মূলে রয়েছে বাসনা। বাসনা অবিদ্যা হতেই উদ্ভূত, চাই চাই করা তার স্বভাব। অথচ চাওয়াটা তার কাছে স্পষ্ট নয়। বুভুক্ষা ও বাসনা এদুটি মূলা-বৃত্তি অবর প্রাণেরই ধর্ম, তাই বাসনাচ্ছন্ন মনই যত কষ্টের দুর্বিপাকের কারণ। ইন্দ্রিয়-সংবেদন থেকে মনের কাছে তর্পণের উপাদান সে জুটিয়ে আনে, আর সেই প্ররোচনার সঙ্গে মন যখন জড়িয়ে যায়, তাকেই বলা যায় ইন্দ্রিয়-মানস (sense mind)। ইন্দ্রিয় মানসের জোটানো উপাদানকে আস্বাদ করে ভাব মানস (emotional mind)। সুখদুঃখ আশানিরাশা আগ্রহ ভাললাগা মন্দলাগা, এই সব তার বৃত্তি। ইন্দ্রিয়মানস ও ভাব-মানসের ওপরে আছে ভাবনা মানস (thought mind)। বিবেকবিচার স্মৃতি কল্পনা চিন্তা এ সব নিয়ে তত্ত্ব আহরণ করা তার স্বভাব। কিন্তু তার সে স্বভাব ওই প্রাণবাসনার সংস্পর্শে ও ক্রিয়ায় প্রাকৃত ভূমিতে শুদ্ধ থাকতে পারে না।

বাসনাচ্ছন্ন মন অহমাক্রিষ্ট প্রাকৃত জীবনকে দুঃখময় করে রেখেছে, যদিও সে দুঃখের সম্বন্ধেও আমাদের চেতনা স্বচ্ছ নয়। এই দুঃখময় প্রাকৃত জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ ও অচরিতার্থ তাই শুদ্ধ প্রাণমনের বিকাশকে সে দাবিয়ে রাখে এবং বাসনার অচরিতার্থতায়ও সে নিয়মান। আবার এই বাসনাই যখন সত্যের দিকে যায়—যোগবাশিষ্ঠ যেমন বলেছেন সতীবাসনা আর অসতীবাসনা পার্থক্যের কথা, এই সতীবাসনাই হল শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় অভীপ্সা আস্পৃহা—তখন তা আমাদের দিব্য জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। আর অসতী বাসনা কাকে বলি? "যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।" এই যে প্রমাদ তা আসে সঙ্কীর্ণ অহংএর

পরিতর্পণ কামনায়, তাকে চাপিয়ে তার ভাবনা বৃহতে ব্যাপ্ত হতে পারে না বা গভীরে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। যোগশাস্ত্র বলেন এই অহং-এর মূল রয়েছে অবিদ্যায়। অবিদ্যা থেকে অস্মিতা, তা থেকে রাগ-দ্বেষ এবং শেষ পর্যন্ত অভিনিবেশ (stupidity), এই রকম অবিদ্যা জীবনের মর্মমূলে জড়িয়ে রয়েছে। তার ওপর যদি বিদ্যার আলো পড়ে তখন তার রূপ বদলায়। প্রাণের বুভুক্ষা ও বাসনা যদি চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, চৈত্যপুরুষের অধীন হয়, তখন সব ধারাই উজানে বয় আর সেই বাসনাই সতী বাসনায় রূপায়িত হয়। তাই এই নিম্ন প্রকৃতিকে শুদ্ধ করতে হলে তার পরে প্রজ্ঞানের আলো ফেলে তাকে দেখতে হবে, তাকে চিনে নিয়ে তবে তাকে উদ্ধার করতে হবে। তার ধারাটি ঠিক পথে চালাতে পারলেই পূর্ণযোগের কৌশল আয়ত্ত হবে।

অনুরাগ-বিরাগের দ্বন্দ্ব প্রাকৃত চিত্তকে আচ্ছন্ন করে ফেলে আর তার ফলে চিত্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে। এই দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে চেতনাকে নিতে "প্রত্যাহার" সাধনার প্রয়োজন, তাতে চেতনা সব সময়ের জন্যই উন্মুক্ত থাকতে পারে এবং তাতে থাকে প্রধানত এক সমত্বের বোধ। সমত্ব কোনও কিছুতেই মুখ ফিরিয়ে থাকে না এই তার ধর্ম। যেমন আলো তেমনি আঁধার দুই-ই তার কাছে সমান। এই যে মূল্যবোধ, তার মূলে আছে আত্মবোধের গভীর প্রশান্তি। তখন দুচোখ খুলেই সে দেখে, দৃশ্যকে উপভোগও করে কিন্তু সুখদুঃখের দোলায় তরঙ্গায়িত হয় না। সে দেখা প্রসন্ন চিত্তের দর্শন যা কিনা আলোতেও যেমন আঁধারেও তেমন ভরে থাকে। তাই আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে তার স্থান। এক্ষেত্রেও প্রকৃতির ক্রিয়া কিন্তু সে প্রকৃতি অপরা প্রকৃতি নয়, পরা ও পরমা প্রকৃতি। তাই আত্মার এই প্রতিবোধ শক্তি জাগায়, তখন পুরুষ প্রকৃতির ঈশ্বর। তিনি দেখেন দ্বন্দ্বসঙ্কুল জগতের মূলে রয়েছে এক নির্দ্বন্দ্ব আনন্দেরই দোলা।

যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ গোড়াতেই এটা ধরিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা মনে করি এ দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে জড়িয়ে পড়ে অপরা প্রকৃতিতে বদ্ধ হয়ে আছি; কিন্তু এর আসল মালিক রয়েছেন এই বাঁধনের ওপরে সেই বিজ্ঞানময় আনন্দময় লোকে। সেখানে গেলে দেখতে পাব সেই পুরুষকে, যিনি "সদা জনানাং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ" তাঁরই বিজ্ঞান তাঁরই প্রজ্ঞান। সেই আলো যদি অপরা প্রকৃতিতে পড়ে তবেই তার রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। না হলে এই "কাঁচা আমি"তে পড়ে থেকে রূপান্তরের কথা বারবার বলে কোন লাভ হবে না। ঐ বিজ্ঞানলোকে আনন্দলোকে বিরাজিত সত্যপুরুষের দৃষ্টিপাতে অপরা প্রকৃতি আলোকিত হয়ে চেতিয়ে ওঠে এবং সানন্দে তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। তখন আর তাকে বর্জনের কথা ওঠে না। এই রকমটি হলে তবেই স্বভাবে স্থিতি হয় এবং চৈত্য-পুরুষ উন্মেষিত হতে থাকেন। এরই পরিপাকে আধারের চৈত্য-রূপান্তর সাধিত হয়।

কাজেই আমরা দেখলাম মানস-ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ করে রাখা নয়, তাদের বিশুদ্ধ ও উদ্দীপ্ত করাই লক্ষ্য। চিত্তবৃত্তি নিরোধ যোগের সাময়িক ও প্রাথমিক উপায় হলেও চরম লক্ষ্য যে তা নয়, গোড়া থেকেই আমরা সেটা বুঝে চলার চেষ্টা করব। পরমপুরুষের পরাপ্রকৃতি আনন্দময় চৈত্যসত্তা আড়াল হয়ে থাকেন চেতনার আবরণে ও বিক্ষেপে। সচেতন সমনস্ক হয়ে অন্তর্মুখীন চিত্তবৃত্তির সংযমে তাঁকে নিয়ে আসতে হবে চেতনার পুরো-

ভাগে। তাঁর প্রকৃতি পরম পুরুষে নিবেদিত ও উৎসর্গীকৃত, তাঁরই আলোয় প্রসন্ন মধুর। তাঁর সেই বোধেই মানস রূপান্তর শুরু হয়। ইন্দ্রিয়-মানস ভাবমানস আর ভাবনামানস এই ভাবে মনের তিনটি স্তর বিবর্তনের ক্রম অভিব্যক্তিতে পশু থেকে মানুষের মন পর্যন্ত ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়-মানসের কাজ হয় যখন ইন্দ্রিয়মুখে বাহিরের জগৎ দেখি। গীতার ভাষায় তা মাত্রাস্পর্শ; তখন কোনটা ভাল লাগে কোনটা ভাল লাগে না। আর রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি প্রাণনের বৃত্তিগুলি ঐ ইন্দ্রিয়মানসের ক্রিয়ায় মনকে অধিকার করে। তাতে প্রাণবৃত্তিতেও একটা বাছাই করার কাজ চলে, আর সেটা হয় ভাব-মানসে। তখন আত্মচৈতন্যে রসভোগের তৃষ্ণা এসে গেছে। পশুদের মধ্যেও ভাব-মানসের ক্রিয়ার প্রাথমিক আবেগ (emotion) দেখা যায়। মানুষের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক ভাবমানসে ও ইন্দ্রিয়মানসে থাকে। তাদের মধ্যে রজোগুণ অথবা তমোগুণের প্রাধান্য দেখা যায়। ভেবে-চিন্তে কিছু কাজ সেখানে হয় না। অনেকে যা বলে যে ভাবে চলে, সেই গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে চলা, একে উন্নততর এক পশুজীবনই বলা চলে। এরপর ভাবনা-মানস। ঠিকভাবে তা জাগলে ঐ ভাবমানস ও ইন্দ্রিয়মানস তাকে মেনে চলবে। কিন্তু প্রাণবাসনায় জালবদ্ধ মন সহজে যুক্তির ক্রিয়া মেনে নিতে পারে না। সাধারণ ভাবে মানুষের মন এই দশাতেই থাকে। বেশীর ভাগ লোক ঐ প্রাণের বাসনা কামনা বুভুক্ষার তাড়নায় সংস্কারে ও আবেগে নিম্ন প্রকৃতির বশীভূত হয়ে চলে। তাদের চিন্তাগুলিও সব বাঁধাধরা ছকে ফেলা, যদিও তারা মনে করে যে তাদের চিন্তা স্বাধীন। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ একবার বলেছেন যে তিনি চিন্তায় ভাবে ও ভাবনায় যে নবীনতা এনে দিতে চেয়েছেন সেটা অনেকে ঐ সংস্কারে আবদ্ধ বলেই ধরতে পারেনি বা চিন্তা করতেই চায়নি। আমাদের সাধারণ মন ভাবনামানসের ক্রিয়ায় সহজে ধরা দিতে চায় না। চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বশে নিম্নগামী দৃষ্টিকে সহজে উন্নীত করতে চায় না। তাই খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করাই তার রীতি।

ভাবনামানস জাগলে চিন্তাধারা একটা পথ ধরে চলতে শেখে। বিচার বিতর্ক বিবেক এগুলি সব ভাবনামানসের সম্পদ, এই পর্যন্ত মনের মননের সীমা। এরপরে বিজ্ঞানভূমির আলোয় সে মন হয় যোগীর মন, তার লক্ষণ হল চেতনার মুক্তি ও ব্যাপ্তি। আর সত্য চৈতন্য আনন্দ ও আনন্ত্য—এই হল যোগীমানসের ভিত্তি। অপরপক্ষে দেখলাম চেতনার সঙ্কোচে অহন্তার উৎপত্তি, দেহ প্রাণ মন বুদ্ধি নিয়ে তার কারবারও চলে। এগুলি সব একে একে চিনে নিয়ে ইন্দ্রিয়মানস ও ভাবমানস হতে প্রথমে মুক্ত হতে হবে।

তাহলে দেখছি যোগীর মন পেতে হলে প্রথমে চাই সাক্ষীচেতনার অনুশীলন, কি আছে আর কি দেখব? এরূপ দর্শনের প্রধান ধর্ম সমত্ব। ইন্দ্রিয় দিয়েই দেখছি ইন্দ্রিয়মানসের কারবারী সত্তা, ভাবমানসের সংস্কার—এরাই দেখছে, কোনটা ভাল লাগে কোনটা লাগে না। এই ভাললাগা মন্দলাগার জটলাগুলি সব নিজের মধ্যেই কেমন করে আমাকে পেড়ে ফেলছে এ পর্যন্ত সমস্তটাই অনপেক্ষ হয়ে দেখে যেতে হবে, এর ক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত যায়, তাও দেখে শিখতে হবে। যে দ্রষ্টা, সে মন সাক্ষী চৈতন্য নির্বিকার, সে ক্রমে দেখতে শেখে যে, আমার বলে মনে করি যে মনকে, সেও তো আমার একান্ত নিজস্ব নয়। বাহিরের

অভিঘাতে ছাপ পড়ে পড়ে তার সংস্কার উৎপন্ন হয়, সেও যান্ত্রিক আবর্তনের মধ্যে পড়ে যায়। তা থেকেও যখন নিজে আলগা হয়ে যেতে পারি, আমার বিশুদ্ধ চৈতন্য আমার কাছে তখন প্রতিভাত। তখনই দেখি আমার চিত্ত যেন একটি দর্পণ, তাতে কে যেন কত ছায়াই যে ফেলছে আবার সরিয়েও নিচ্ছে। কাজেই তখন তাতে বিচলিত হওয়া বা টলে যাওয়ার বিভ্রম আর পেড়ে ফেলতে পারেনা। ''আগমাপায়ী মাত্রাস্পর্শ'' তিতিক্ষা শুধু না, ঐ সঙ্গে দ্বৈতের দোলাতেও সহজস্বভাবে স্থিত থাকতে পারব। ''মনেরে তাই কহ যে, ভাল মন্দ যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে''।

ভালমন্দ (likes dislikes) বোধ নিয়ে মনের খুঁৎখুঁতে ভাবকে বেশি প্রশ্রয় দিলে শেষ পর্যন্ত ভরাডুবি হয়ে বসে। তাই গীতা অনাসক্ত যোগের উপদেশে দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা আর সুখে বিগতস্পৃহ হতে বলেছেন। তিতিক্ষার সীমা এই পর্যন্ত। সুখ-দুঃখ মান-অপমান জয়-পরাজয় এই দ্বৈতবোধের উর্দ্ধে অবস্থিত হতে পারলে তবেই সত্যকে সহজে নেওয়া যায়। কিন্তু আমরা অনুরাগে উচ্ছ্বসিত হই আবার বিরাগে গুটিয়ে যেতে চাই। এরকম বেসামাল হলে চলবে না। কঠিন দুঃখেও বিচলিত না হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সামাল দেওয়া যে তিতিক্ষার বীর্য এটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু গভীর সুখেও অনাসক্ত হতে হবে এই তিতিক্ষা ও অনাসক্তি নিয়ে যোগের পথে চলা নিরাপদ। মেয়েলি প্রবাদ যেমন বলে ''কয়জন বড়, না সয়জন বড়''। তিনবার সয়ে যাও, সয় তিনবার (শ ষ স) এই কথাই শেখায়—এ কত বড় কথা। এই সহ্যগুণ অভ্যাস করলে তিন সয়ে তিন গুণের পারে নিয়ে যাবে, আর টলে পড়ার ভয় থাকবে না। এই তিতিক্ষার পরিপাকে যে আত্মবোধ জাগে, তা প্রজ্ঞানে নিয়ে যায়। যে আমি আঘাতে আঘাতে বানচাল হয়ে পড়েছি, সেই আমিই স্থির শান্ত হয়ে যাই। প্রকৃতির স্রোত বয়ে চলে, সেই প্রবাহের মধ্যে থেকেও যোগী থাকেন অটল অনড় প্রস্তরখণ্ডের মত। এই আত্মবোধের জাগৃতিই ''উদাসীন গতব্যথ:'' করে দেয়। বেদান্তদর্শন উদাসীন হওয়ার অর্থ বুঝিয়ে দিতে গিয়ে বলেছেন যে কেউ যদি দক্ষিণহস্তে চন্দন লেপন করে আবার বামহস্ত ছুরিকাবিদ্ধ করে কেটে ফেলে, দুটিকেই সমান ভাবে নিতে পারা চাই। শ্রীঅরবিন্দের যোগদৃষ্টিতে ঔদাসীন্যের মূলে থাকে সমত্বের বোধ। উদাসীন কিছু দেখেও দেখেন না। সর্বদা তাঁর আসন উর্দ্ধে। কিন্তু সমত্বের বোধ কোন কিছু থেকেই মুখ ফিরিয়ে থাকে না। কোন ব্যথাই তখন আর তাকে বিদ্ধ করতে পারে না। আলো ও আঁধার দুই-এর মূল্যবোধ তার আত্মবোধকে প্রশান্ত করে তোলে। তাঁর দৃষ্টি গভীরে চলে যায়, চিত্ত প্রসন্ন থাকে, বুদ্ধি হয় স্থির। গীতা বলেন ''প্রসন্ন চেতসোহ্যাশু বুদ্ধি পর্যবতিষ্ঠতে।'' এই প্রসন্নতা যত গভীর হতে থাকে তার পরিপাকে বিশুদ্ধ রসচেতনায় স্থিতি হয় আর এই রস লাভ হলে পুরুষ হয় আনন্দময় ও সহজ।

এইভাবে ভূমানন্দে একরসে স্থিত হতে পারলে ভাবমানসও রূপান্তরিত হয়। তখন সুখ ও দুঃখ যে দোলা দিয়ে যায় তাতে আনন্দেরই স্ফূর্তি, চিত্তে কোন গ্লানি নেই। চৈত্য-সত্তার উন্মোধনে চিত্তের এই সদা প্রসন্নতা সহজ হয়। তখন সংসারে নেমে বহুভোজী পিপ্পলাদ আত্মাই যে রসগ্রহণ করছেন তাকে চিনতে ও বুঝতে আর বাকী থাকে না। আমাদের সাধনশাস্ত্রে এ দিকটা সেভাবে পরিশীলিত হয়নি বলে রসশাস্ত্র থেকে আমরা এগুলির

শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আসল কথা আনন্দের বোধ প্রসন্নতা—এগুলি সাধনার অপরিহার্য ফল। আনন্দেই দুঃখ রূপান্তরিত হয়। শুধু 'নেতি নেতি' বা শূন্যতায় চিত্তের অনুভব শেষ হতে পারে না। বৌদ্ধ সাধনশাস্ত্র আনন্দের চরম অনুভবকে সহজানন্দ নাম দিয়েছেন। এই সাধনার ধারা মধ্যযুগে নরনিয়াদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত ছিল। অন্তঃসলিলার মত জাতির চেতনাকে আজও ঐ সহজ সাধনার ধারাই পুষ্ট করে যাচ্ছে। আনন্দে উল্লাসের মত্ততা এলে অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে তা একটা প্রবল বাধা হয়ে পড়ে, এতে সন্দেহ নেই। তাই সহজ আনন্দের রসিক হলে আর সে মত্ততা থাকে না। শাস্ত্র থেকে শুধু নয়, সন্ত বাউল এদের জীবনদর্শনেও এই সহজ হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যায়।

দিব্যজীবনের প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ ঐ সহজ আনন্দের ধারা ধরিয়ে দিয়েছেন এই বলে যে, মানুষ জীবনকে শুধু দুঃখময় দেখতে অভ্যস্ত। কিন্তু এত সহজ সুখ প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে রয়েছে চেতনাকে স্পর্শ করে যাচ্ছে, আমরা সে দিকটা কিছুতেই দেখছি না ও মানছি না। যদি দেখতে পেতাম তাহলে এই অকূল সংসারে সুখ দুঃখ আঘাতের অভিঘাতের মধ্যেও জীবনের উল্লাস ধরা পড়ত। রবীন্দ্রনাথ কত বড় কবি, কিন্তু তিনিও মহাকাব্য আর রচনা করলেন না, তাঁর বীণায় রচিত হল গীতিকাব্য। জীবনের ছোট ছোট সুখ দুঃখ হাসিকান্না এ সবকে তিনি হীরেমুক্তার মত উজ্জ্বল করে দেখে সেই মণির মালা গেঁথে তুলেছেন তাঁর কবিতায়, তাঁর কাব্যে তা গান হয়ে ফুটেছে। কথা হয়ে গেছে সুর, সেই সুরের গুনগুনানি থেমে গেলেও তার গুরুরণ সমস্ত সত্তাকে ঝঙ্কৃত করে উদাস করে তোলে। উর্ধ্বের ঐ অগাধ লোকে চেতনাকে টেনে নেয়, চিত্ত ভেসে চলে। তাই তাঁর নির্দেশ হল "ওরে মন সহজ হবি"। সহজ হলে পরে তবেই তাঁর সহজ সুরটি জীবনে ধরতে পারা যায়।

প্রাত্যহিক জীবনের রাগদ্বেষের গণ্ডী না পেরোতে পারলে সহজ সুখের আস্বাদ মেলে না। এই সহজ হবার দর্শনটি সিদ্ধ হলে তবেই শ্রীঅরবিন্দ-যোগের মর্মোদ্ধার করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। বোধিমানসের ক্রিয়ার দিকও সহজিয়াদের মধ্যে পাওয়া যায়, গুহ্য-বিদ্যাসাধনেও তার সন্ধান মেলে। বৈদিক দর্শন ও সহজ সমাধির প্রসঙ্গে আমরা দেখেছি তাতে যে সাধারণ জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় তা নয়। আর একটি যে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাদের মধ্যে রয়েছে যার ব্যবহার আমাদের কাছে লুপ্ত, তার দ্বারগুলি খুলে যায়। তখন যা কানে শুনি চোখে দেখি সে সবই সত্য, সবই চিন্ময় আনন্দময়। বেদমন্ত্রে বলা হয়েছে "ভদ্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবা..." ইত্যাদি, তাতে দর্শন শ্রবণ যেমন আছে, তেমনি আছে দেবহিত আয়ুর কথা। ওই আয়ুষ্কাল বা এই পার্থিব জীবন আগাগোড়াই দিব্য। তাই এভাবে যুক্ত সাধনপথ গ্রহণ করতে পারলে পূর্ণযোগের সহজ পথটি ধরতে পারা যাবে। এই হল জীবনের চলাফেরার মধ্যে যোগ। এদিকে যদি সচেতন সমনস্ক থাকি, দেখব কতবার তিনি সহজভাবে আমাদের তাঁর পরশ দিচ্ছেন। তাঁর হাতখানি তিনি বাড়িয়ে দিচ্ছেন, সেই হাত ধরে কত আশঙ্কা কত বন্ধুর পথ পেরিয়ে চলে এসেছি সুবর্ণরেখার তীরে। যদি সেই সোনা কুড়িয়ে তুলতে পারি দেখব আমার সবই সোনা হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয়মুখে গ্রহণ ও বর্জনে সমন্ব রেখে উদাসীন হতে হবে। কিন্তু মধুভোজী আত্মা আবার যখন ঐ

পরিশুদ্ধ ইন্দ্রিয় দিয়েই রস গ্রহণ করেন, তখন আকাশ বাতাস বনস্পতি সিন্ধু সবই মধুক্ষরণ করছে এমনিতর বোধে বোধ হয়। পৃথিবীর ধুলিও হয়ে ওঠে মধুবাতা তাঁর পদরজ। ঋষি বলছেন এইভাবে দোহন করে মাধ্বী হয়ে উঠুক আমাদের একাদশ ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়-গুলিতো ব্রহ্মেরই দ্বারপাল। তাই এই ভাবনার বিনিয়োগে ইন্দ্রিয় মানস ব্যাপ্ত ও রূপান্তরিত হতে আরম্ভ করে। সেখানে চিত্তের বিক্ষোভ তরঙ্গের মত উঠছে পড়ছে কিন্তু সেগুলি আত্মাকে স্পর্শ করতে পারছে না। সে সবই যেন এক বৃহৎ সামের নূচ্ছনা। তারই গুঞ্জনের রেশে চারিদিকের পরিবেশ সহজ শান্ত হয়ে আসার সব রুক্ষতা ঢেকে দেয় যেন সন্ধ্যার ছায়ার মায়ায়। আর তখনই পাই ভূমাকে রাত্রিকে—ব্রহ্মের বৃহৎ রূপকে। প্রাত্যহিক জীবনের পটভূমিকায় এই সহজ সাধনার দিক আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি।

* * *

মনোময় পুরুষকে অন্ধ প্রাণবাসনার জাল থেকে যেমন মুক্ত করতে হবে তেমন ভাবনামানসকেও নিরাকৃত করার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। আমাদের সাধারণ চিন্তা-ভাবনায় বেদনা ও ভাবাবেগ জড়ানো থাকে। অনাসক্ত হতে পারলে ঐ প্রাকৃত অশুদ্ধি থেকে ভাবনাকে রক্ষা করা যায়। সাধনার প্রথম দিকে বাসনাকে দূর করতে হয় ভাবনা দিয়েই। বিবেক বৈরাগ্য অবলম্বন করেই বাসনা কামনার আবিলতা থেকে মুক্ত হতে হয়, কিন্তু বৃত্তির তরঙ্গ তার মধ্যে থেকে যায়। এগুলি আমার নয় বলে তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি না করে অনাসক্তির ভাব নিয়ে নৈঃশব্দ্যে অবগাহন—বলা যায় একেবারে ডুবিয়ে তলিয়ে যেতে পারলে ঐ তরঙ্গটা আপনিই সরে যায়। আবার কে যেন ঠেলে জাগিয়ে সব কিছু মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু তখন তো মনের ইচ্ছাকৃত ভাবনা কিছু ছিল না, আমিও ছিলাম না। এই পথ ধরে ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যায়। 'বোধ' মাত্র থাকে, শুধু অস্তিত্বের বোধ। তা কিন্তু ভাবনা মন বুদ্ধি এসব কিছুই নয়। নির্মল নিঃশব্দ সত্তা যার বোধ অভিন্ন।

শ্রীঅরবিন্দ দেখিয়েছেন যে ভাবনা থেকে সংবেদন সরে গেলে বিশেষ থেকে সামান্য ভাবনা এসে পড়ে, তা হল বিমূর্ত (abstract) ভাবনা। ইন্দ্রিয়সংবিৎ থেকে ভাবনা অতীন্দ্রিয় বোধে চলে যায়। তখন এক বিশ্ব মনের আধারে ভাবনা বৃহৎ হয়ে যায়। অহংবোধ তাতে স্তিমিত হয়ে যায় এবং এরই অভ্যাসে সঙ্কীর্ণতার বন্ধন খসে পড়ে। এটা কিন্তু মোটেই সাধারণ চিন্তাধারা নয়। এতে ভাবনামানসের ক্রিয়ায় মন হয় আকাশবৎ। ভূমার বোধে ব্যক্তির নিজস্ব মন হারিয়ে যায় আর মিশে যায় সেই বিশ্বমনের মাঝে, যেখানে সকলের ভাবনা বিরাজিত। এ যে বিশ্বযোগ, এ তো আমার একার যোগ নয়। এইভাবেও মনটা শূন্য হয়ে গেলে সেই অমনীভাবের আধারে নেমে আসে নীরবতা। বিশাল নিথর সেই নীরব ভূমিতে তখন বোধিবৃত্তি সজাগ হয়ে ওঠে, সেই ধৃতচ্ছন্দে মনের সব আঁধার সব বাধাই মিলিয়ে যায়। জ্যোৎস্না রাতের বা আঁধার রাত্রির অবসানে উষার প্রকাশ যেমন সহজ ঠিক তেমনি করেই বিশুদ্ধ আত্মবোধ আধারে সহজ হয়ে প্রকাশ হয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। "অস্তীত্যুপলব্ধব্য" বলে সেই বোধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এ বোধ কিন্তু ভাবনা নয় ভাব নয়, অখণ্ড সমগ্র উপলব্ধি। তাতে প্রতিভার উদয় হয়, পূর্বে যাকে বলা

হয়েছে পাতিভসংবিৎ। তখন ভাবনাগুলি সুসংবদ্ধ সুসজ্জিত আকারে ঊর্ধলোকে থেকে আসে উদ্দীপ্ত অথচ শান্ত আকারে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন "মা যেন হাত ঠেলে দেন" ভাবনা চিন্তা বাক্য সবেরই জোগান দেন তিনি নিজে।

এই রকম করে ভাবনা ভাব ইন্দ্রিয়সংবিৎ—যেগুলি সব মনের সাধারণ বৃত্তি, বোধি-মানসের উদ্ভাসে সেই মনোবৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ উদ্ভান হয় বা উল্টে যায়, তাদের রূপান্তর শুরু হয়ে যায়। তার জন্য প্রয়োজন হল মনের নীরবতা। মন বলতে তখন কিছু থাকে না, আসে অমনীভাবের শূন্যতা। কিন্তু নীরবতারও একটা ক্রিয়া চলে। ঐ শূন্য নিথর নীরবতায় না যেতে পারলে মানস প্রকৃতির ওপর অধ্যক্ষতা আসে না। প্রকৃতির ঈশান হতে পারলে তখন ওই ইন্দ্রিয়মানস ও ভাবমানসকে যন্ত্রের মত ব্যবহার করা সম্ভব হয়। সে হল দিব্য রূপান্তরের পর্ব, ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হলে ঐশী শক্তির বলে তার ভূত ভব্যের ঈশান হওয়া যায়।

হৃদয়ের অনুরাগ মূল্যবান বস্তু। ভাবনার ঝামেলা থেকে তখনই মুক্তি মেলে যদি শান্ত অনুরাগ হৃদয় আকাশ ছেয়ে থাকে। বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রে রসোল্লাসের প্রেমবৈচিত্ত্যে এই দিকটা পরিশীলিত। কিন্তু ভক্তিতে ও প্রেমে ভাবাবেগের রূপান্তর হওয়া চাই, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে সে আবেগ রঞ্জিত প্রশান্ত, তার ভিত্তি বৈরাগ্যে। জ্ঞানের সাধনা প্রেমের সাধনা তখন এক সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাবে। বোধিমানসে নিরাকৃত হলে ব্যক্তি বা বিশেষের পশ্চাতে বিশ্বমন উদ্ভাসিত হয়। আর তখনই আবার অতিমানস অবতরণের জন্য প্রস্তুত হয়। এই বিশ্ব বা ব্যাপ্তি চেতনায় অধিদেব ও অধ্যাত্ম দৃষ্টি মিলে গেলে তবেই অধিভূত দৃষ্টিতে দিব্য রূপান্তর খুলে যায়। ওই বোধিনন দিব্যজীবনের উত্তম রহস্যকে উন্মুক্ত করে দেয় সিদ্ধ সাধকের কাছে। চিত্তবিমুক্তি সম্ভব তখনই যখন ভাব ও ভাবনা চিন্ময় আনন্দময় হয়ে যায়। এই জন্য বোধিবৃত্তিকে সক্রিয় করে তোলা শ্রীঅরবিন্দ-যোগের সাধনায় উত্তম কৌশল। শূন্য চিত্তের আসন পূর্ণ হয় চৈত্যপুরুষের প্রতিষ্ঠায়, তিনি তখন দেহ প্রাণ মনের ঈশান হয়ে আনন্দময় সত্তার জাগৃতি ঘটিয়ে তোলেন। তাই কিশোর চিত্ত রসে টলমল অথচ শান্ত সহজ ভঙ্গীতে জীবন-দর্শন রূপায়িত করে নির্মল আনন্দে ইন্দ্রিয়সংবেদনগুলি জ্ঞানে কর্মে চৈতাময় সরস হয়ে ওঠে; প্রত্যেকটি যেন তাঁর ছোঁয়ায় অঙ্গের আভরণ মণিমুক্তার মত শোভা পেতে থাকে। এ সবই ঘটে চলে প্রাণের আধারে মনোময় প্রাণশরীর নেতাকে নিয়ে। সেই অনুভূতি বোঝাতে গিয়েই বাউল গাইলেন,

"চোখে দেখি কানে শুনি ধুলা আর মাটি
প্রাণরসনায় চাইখ্যা দেখি রসের সাঁই খাঁটি॥"*

(ক্রমশ)

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি

শ্রীঅরবিন্দ

সাহিত্য

৫

দেখা গিয়েছে, আমিও বারংবার বলে এসেছি, যে ভারতীয় মনের প্রধান সুর, যে-নেশায় তার সমস্ত সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে এবং দর্শন ধর্ম শিল্প ও জীবনে সৃজনশীল কর্মের বেশির ভাগের জনক ও ধারক তা আধ্যাত্মিক বোধিগত ও চৈত্যিক তবে এই মূল প্রবণতা বহিষ্কার না করে প্রবলভাবে সাহায্যই করেছে একটা সবল ও সমৃদ্ধ বুদ্ধিগত ব্যবহারিক প্রাণিক কর্মধারাকে। ধর্মনিরপেক্ষ ক্লাসিকাল সাহিত্যে এই ক্রিয়া অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, প্রকট বৈশিষ্ট্যেই ও সেই আদি ভাবটি খানিকটা পেছনে সরিয়ে রাখা। তার অর্থ নয় যে ভাবটিই বদলে গিয়েছে, হারিয়ে গিয়েছে অথবা এ-সময়ের ধর্মনিরপেক্ষ কাব্যে চৈত্যের ও সম্বোধির লেশমাত্র নেই। বরং মনের যে সব ধরন এখানে প্রতিফলিত তা পরিচিত ভারতীয় চরিত্রেরই সকল পরিবর্তনের মধ্যে অটুট, ধর্ম-দার্শনিক, ধর্ম-নৈতিক, ধর্ম-সামাজিক—সকল অতীত অভিজ্ঞতা অন্তরালে ধ'রে, সামনে অতিস্পষ্ট না থেকেও তাকে ধারণ ক'রে; তখনকার চিত্রকলার ক্ষেত্রে যেমন কল্পনা এখানেও তেমনি; অর্থপূর্ণ প্রতিমা, প্রতীক ও জনশ্রুতির ফ্রেম সেই সব অতীত থেকে এসেছে পরিবর্তন ও নবস্ফূর্তির প্রকোপে যার পরিপূর্ণ অবয়বটি পুরাণে, তাদের আবার রয়েছে প্রবল এক চৈত্যিক ব্যঞ্জনা। পার্থক্য এই যে, তারা মৌলিক আধ্যাত্মিক সৃষ্টির চেয়ে এই কবিদের হাতে বেশি নিয়েছে বুদ্ধির সুগম্য ও উপজীব্য একটা ঐতিহ্যের রূপ, বুদ্ধিই প্রধান এখানে, এই রূপাধারে ও ধরনে প্রতিষ্ঠিত ভাব ও বস্তু সব গ্রহণ ও পালন করে, তারই সমালোচনামূলক অথবা পুনরাবৃত্তিমূলক নিরীক্ষণ এবং সম্মতিকে বলিষ্ঠ রেখায় ও সুশোভন উপস্থাপনা এবং কারুকার্যের প্রতিমায় সমৃদ্ধ বর্ণসম্ভারে জীবন্ত করে ধরে। সেই মৌলিক শক্তি, সেই বোধির দৃষ্টি প্রবলতমভাবে সক্রিয় এখন জীবনের বাহ্যিক স্নায়বিক নির্ব্যক্তিক, প্রাণিক নানা অঙ্গে, এবং এ যুগে এগুলিই পূর্ণতররূপে গৃহীত, প্রস্ফুটিত আর ধর্মের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রসারে নির্ভরের খুঁটি খানিয়ে তোলা।

সংস্কৃতির এই বিবর্তনের মর্ম আরো পরিষ্কার ফুটে ওঠে নিছক সাহিত্য-সীমানার বাহিরে সমসাময়িক দার্শনিক রচনায় এবং পুরাণ ও তন্ত্রের ধর্মকাব্যে। এই দুই ধারার মিশ্রণ এবং অচিরে পূর্ণাঙ্গ একটিই হয়ে ওঠা ক্লাসিকাল যুগের সবচেয়ে জীবন্ত ও স্থায়ী আলোড়ন, তাই রেখেছে জাতীয় মনে সর্বাপেক্ষা ধ্রুব পরিণাম, শক্তির সৃষ্টি সে এবং পরবর্তী জনপ্রিয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশেও একান্ত প্রত্যক্ষ। জন্মগত প্রবণতা, যোগ্যতা,

গভীর আধ্যাত্মিক বুদ্ধি ও জাতীয় মনের অনুভূতির জাজ্বল্য প্রমাণ তো এতেই যে এ-যুগের দার্শনিক চিন্তা রেখে গিয়েছে এমন বিরাট প্রভাব; এখানে বুদ্ধি উচ্চতম কঠোরতম পদবীতে। যে-ধারায় শুরু পূর্বতন কালে এবং যা গড়েছে বৌদ্ধ জৈন ধর্ম এবং দর্শনের মহা মহা ভাবধারা, বোধিদীপ্ত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা দ্বারা আবিষ্কৃত যাবতীয় সত্য যুক্তির কাছে নীতিবদ্ধ করে ধরার জন্য তাত্ত্বিক বুদ্ধির শ্রম, তাদের ন্যায়সঙ্গ এবং কঠোর তর্ক-বিচারের অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে নেওয়া এবং তাদের ভিতর থেকে চিন্তার পক্ষে সম্ভাব্য সব কিছু আবিষ্কার করা, তা ষষ্ঠ ও ত্রয়োদশ শতাব্দির মধ্যে, বিশেষ করে দক্ষিণী চিন্তাবীর শঙ্কর রামানুজ মধ্বের রচনার দ্বারা চিহ্নিত, অপর্যাপ্ত দার্শনিক রচনায়।

পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা, বিশ্লেষণ ও প্রবল যুক্তিগত সংগঠন ও বিধিবদ্ধকরণের, বিস্তারিত ও সতর্ক বিচারের শীর্ষ ক্ষমতায় উঠেছিল। সেখানেই তার শেষ হয়ে যায় নি, সেই তার স্বর্ণযুগ ছাড়িয়েও আমাদের কালে পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে—প্রচলিত ধারায় সূত্র ও সমালোচনার অনন্ত স্রোতের মধ্যে কখনো সখনো মহৎ সৃষ্টিশীল চিন্তার এবং প্রায়শ সূক্ষ্ম অভিনব দার্শনিক ভাবনার অভ্যুত্থান ঘটিয়ে। এখানে কোনো অবনতি নেই, আছে জাতীয় মানসে তত্ত্বপ্রবণতার অপ্রতিহত বীর্যবত্তা। এখানে ছিল দার্শনিক বুদ্ধি প্রসারণের কাজটি সুসম্পন্ন করা, যার ফলে—এই জাগ্রত হবার দরুণ—গড়পড়তা ভারতীয় মন পর্যন্ত সূক্ষ্মতম গভীরতম সব ভাবের আহ্বানে বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে সাড়া দেয়। একথা উল্লেখযোগ্য যে, পুরানো হোক বা নূতন হোক, এযাবৎ কোনো হিন্দুধর্মই একটা সুস্পষ্ট দার্শনিক অর্থ ও ব্যঞ্জনার অবলম্বন না নিয়ে গড়ে ওঠেনি।

পদ্যে রচিত দর্শন সাহিত্যপদবী দাবি করে না এখানে প্রকট সমালোচনার দিক, তার কোনো সুজনক্ষম সুগঠিত আকৃতি নেই অবশ্য, কিন্তু এমন অন্য ধরনের রচনাও আছে যেখানে সম্পূর্ণ চিন্তার অধিকতর সুসংগঠিত প্রকাশের প্রয়াস এবং সেক্ষেত্রে সাধারণত যে সাহিত্যরূপ গৃহীত তা দার্শনিক কাব্য। এই সাহিত্যাধারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব গীতা উপনিষদের ধারা থেকে প্রাপ্ত। এদের খুব উঁচু দরের কাব্যের আসন দেওয়া চলে না বাক্যে বোধিদীপ্ত যথার্থের পরিবর্তে বুদ্ধিগত যথোপযুক্ততার চিন্তা-ভাবনায় তারা এত পীড়িত যে সুজনক্ষম কবিমানসের অপরিহার্য গুণ প্রাণের স্পন্দন ও অনুপ্রেরণার প্রবেগ সেখানে স্থান পায় না। অবলোকন ও উন্মোচনের দৃষ্টি নয়, সেখানে তার্কিক ও আত্তিক বুদ্ধি। আত্মদর্শন ভগবদর্শন ও বিশ্বদর্শনের যে দ্রষ্টা ও উদ্‌গাতা সেই আত্মার মহাকাব্যোচিত মহত্ত্ব, যে বিদ্যুৎপ্রভা দিয়েছে উপনিষদের তেজ, তা এখানে নেই, নেই গীতার কাব্যিক মহত্ত্ব রচনা করেছে যে অন্তরাত্মার জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে সোজা বের হয়ে আসা প্রত্যক্ষ চিন্তা, নিখুঁত দৃঢ় ব্যঞ্জনাপূর্ণ বাক্য এবং ছন্দময় গতির সৌন্দর্য সে-সব। প্রসঙ্গত, মহৎ কাব্য না হলেও এ-কাব্যের কিছু কিছু অংশ প্রশংসনীয় সাহিত্য তো বটেই যাতে মিলন ঘটেছে পরম দার্শনিক প্রতিভার সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যক্ষমতার, নব নব সৃষ্টি নিশ্চয় নয়, তবে দক্ষতাপূর্ণ ও এমন মহান সব গঠন যা ধরেছে যথাসম্ভব উচ্চ চিন্তা, তার ছন্দের সামঞ্জস্য ও রাজকীয় গরিমা ফুটিয়ে চমৎকার প্রয়োগ করেছে ক্লাসিকাল সংস্কৃতভাষার সংহত ও সংযত ধরন। শঙ্করাচার্যের রচিত বলে পরিচিত 'বিবেকচূড়ামণি'র মত কাব্যে এসব গুণের শ্রেষ্ঠ

প্রকাশ. এখানে নিতান্ত তত্ত্বপরায়ণতা সত্ত্বেও গীতার ভাবের ও ঔপনিষদ কণ্ঠের বুদ্ধিময় প্রতিধ্বনি পাই। এসব কাব্য পূর্বতন ভারতীয় রচনার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের চেয়ে নিকৃষ্টতর হলেও অন্য যে-কোনো দেশের এ-ধরণের সৃষ্টির কাব্যিক রীতি ও ভাবসমুচ্চতার অন্তত সম পর্যায়ে, এবং রচয়িতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে উপযুক্ত বলেই টিঁকে গিয়েছে। যুগপৎ দার্শনিক চিন্তা ও কাব্যিক সৌন্দর্যের অন্তঃসারস্বরূপ এখানে-ওখানে শ্রুত দার্শনিক গানের এক আধটা কলির উল্লেখ করতে ভুললে কিন্তু চলবে না. কিম্বা সেই মন্ত্রসাহিত্যের প্রাচুর্য্য, যার বহুলাংশ তাদের বীর্যবত্তা ও ব্যাকুলতায়, তাদের ছন্দমাধুর্যে ও প্রকাশ সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠায় আমাদের পরবর্তী আঞ্চলিক সাহিত্যে অনুরূপ অথচ বৃহত্তর সৃষ্টির জন্য প্রস্তুতি এনে তুলেছে।

ভারতের দার্শনিক রচনা য়ুরোপের তত্ত্বভাবনার প্রধানাংশের থেকে এই হিসাবে আলাদা যে যখন তারা বুদ্ধিগত রূপ ও পদ্ধতি একান্ত করে নিয়েছে তখনও তার আসল পদার্থ কিন্তু বুদ্ধিগত নয়, দর্শন ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুর ওপর ব্যাপৃত একটা সূক্ষ্ম ও অতি গভীর বুদ্ধিমত্তার ফল। ভারত যে দর্শন ধর্ম যোগের মধ্যে একটা নিত্য ঐক্য রাখতে পেরেছে এ তারই ফল। দর্শনটি হল ধনীয় মন ও তার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রথম চাওয়া যে সত্য তারই বোধিগত বা বুদ্ধিগত রূপরচনা, যা সত্যকে ভাবের কাছে আবিষ্কৃত এবং ন্যায়-বুদ্ধির কাছে প্রমাণ করেও—যদিও চমৎকারভাবে তা হয়েছে—কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়, বরং লক্ষ্য যার আত্মার জীবনে সিদ্ধি, যোগের উদ্দেশ্য। এই যুগের চিন্তা-ভাবনা—মানস-সৌকর্যের দিকটাকে এত প্রাধান্য দেওয়া সত্ত্বেও—ভারতীয় মনোভাবের এই অবিরাম দাবি থেকে সরে যায়নি। তার কাজ চলে আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধির নিপুণ ও শ্রমসাধ্য নিরীক্ষা ও আত্মসমীক্ষার ভিতর দিয়ে এবং আবার বুদ্ধিগত অবধারণা থেকে পিছনে ও ভিতরের দিকে নতুন আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভপ্রাপ্তির অভিমুখে। বিশ্লেষণ ও স্বীয়প্রিয়তার দিকে এখানে একটা প্রবণতা অবশ্যই রয়েছে. উপনিষদের সেই মহান পূর্ণ সত্য ইতিমধ্যেই তো নানা ভাবনার শাখায় খণ্ডিত এবং পরে তারাও আবার অধিকতর দুর্বোধ্য শাখায় বিখণ্ডিত; কিন্তু এই প্রত্যেকটি খণ্ডিত ক্ষেত্রেই লাভ হয়েছে একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ অথবা তীব্র অনুসন্ধান এবং মোটের ওপর, চূড়ায় যদি প্রসার কমে গিয়েও থাকে, ক্ষতিপূরণ হয়েছে গ্রাহ্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কিছু বিস্তৃতি দিয়ে। আত্মা ও বুদ্ধির মধ্যে এই আদানপ্রদানের এমন ছন্দ, আত্মার বিভাগন, বুদ্ধির অনুসন্ধান ও লক্ষ্যসিদ্ধি এবং নিম্নতর জীবনকে অন্তরাত্মার নির্দেশ গ্রহণে সাহায্য দান যা অন্য কোনো দেশে দেখা যায় না ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে এমন এক আশ্চর্যতর তীব্রতা নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব দিয়ে আপন কর্তব্য পালন করেছে। যুগপৎ যারা যোগী মূলত এই সেই দার্শনিকদেরই কীর্তি অধঃপতনের আসন্ন অন্ধকারের মধ্যেও ভারতের আত্মাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

অধিকতর স্থূল ভাব রূপ প্রতিমার—সাধারণ্যের কল্পনা, আবেগ, নৈতিক ও রূপরসিক বৃত্তির কাছে যার আবেদন অকুণ্ঠ, যা অংশত হয়েছিল উচ্চতর আধ্যাত্মিক সত্য

এবং অংশত প্রচলিত ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক মতিগতির মধ্যে অতিক্রমণের সেতু—বিপুল অংশটির সহায়তা ছাড়া এরূপ ঘটা সম্ভব ছিল না। এ দাবি মিটিয়েছিল তন্ত্র ও পুরাণ। পুরাণ হল এ যুগের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ধর্মকাব্য কারণ, সম্ভবত প্রাচীনকালে এ রূপটি থাকলেও এখনই তার ঘটল পূর্ণ সমৃদ্ধি, ধর্মপ্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্যময় এবং মুখ্য সাহিত্যিক অভিব্যক্তি, এবং পৌরাণিক রচনাবলীর জন্য—সমস্ত সারপদার্থের জন্য অবশ্য নয়, কিন্তু প্রধান অংশ ও বর্তমান আকারের জন্য—আমরা দায়ী করব এই যুগকেই। আধুনিক কালে পুরাণের বিস্তর বদনাম ও নিন্দা রটনা হয়েছে, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের বর্ণে রঞ্জিত আধুনিক ভাবধারার উদ্ভব এবং পুরাতন সংস্কৃতির নানা পূর্বতন মৌল ভাবের দিকে নব নব প্রবৃত্তির বশে প্রত্যাবর্তন থেকে। এই নিন্দার অনেকটারই হেতু এই মধ্যযুগীয় ধর্মসাহিত্যের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি এবং অর্থটি ভুল বোঝা। একমাত্র ভারতীয় ধর্মকল্পনার ধারা এবং তার সাংস্কৃতিক বিবর্তনে এ সব রচনার স্থানটি বুঝতে পারলেই তাদের মর্মও বুঝতে পারব।

বস্তুত আমাদের আত্মা ও অতীত সম্বন্ধে যে বৃহত্তর জ্ঞান ফিরে আসছে তাতে প্রতিভাত, পৌরাণিক নানা ধর্ম প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা, দর্শন এবং ধর্ম-সামাজিক সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সত্যেরই একটা নূতন রূপ ও সংযোজন। প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যে এরা প্রাচীন কাল থেকে প্রবাহিত ভারতীয়দের বিশ্বোৎপত্তি, প্রতীকী উপকথা ও রূপাধার, ঐতিহ্য, ব্রত ও সাময়িক নিয়মের জনপ্রিয় সারসংক্ষেপ। মৌলিক কোনো পরিবর্তন নেই, আছে আধারের। বৈদিক যুগের সেই সত্যের রূপক অথবা অনাবৃত মূর্তি অপসৃত কিম্বা পরিবর্তিত ও ক্ষীণতর অর্থ নিয়ে অধস্তন পরিকল্পনায় স্থানচ্যুতি; তাদের স্থান নিয়ে এল যারা তারা স্পষ্টতই উদ্দেশ্যে বিরাট, বিশ্বব্যাপী, সর্বগ্রাহী, জড়বিশ্ব থেকে গৃহীত ধারণা থেকে নিঃসৃত নয়, বরং একান্ত আমাদের অন্তরস্থ চৈত্যজগৎ থেকে উৎসারিত। বৈদিক দেবদেবীরা পামর সাধারণের কাছ থেকে স্থূল রূপের আবরণে তাঁদের আধ্যাত্মিক গরিমা ঢেকে রাখেন। বিপরীত পক্ষে, স্থূল মন ও কল্পনার কাছে পৌরাণিক ত্রিমূর্তির এবং তাঁদের শক্তিরূপিণী প্রতিবাদের কোনো অর্থ নেই, তাঁরা বরং বিশ্বপ্রকাশ ঈশ্বরের ঐক্য ও নানাত্বের দার্শনিক ও চৈত্যিক ধারণা ও মূর্তরূপ। পুরাণের আচার পদ্ধতি বলা হয় বৈদিক ধর্মের অধঃপতন, কিন্তু বোধহয় ন্যায়সঙ্গতভাবে বলা চলে, সারাংশে নয়—তা তো বরাবরই এক রয়েছে, বাহ্যিক আন্দোলনে একটা প্রগতি ও প্রসারই। অপপ্রয়োগ যত কুসংস্কার ও বাহ্যাচারেই নিয়ে যাক না কেন, মূর্তিপূজা মন্দিরধর্ম ও অপর্যাপ্ত অনুষ্ঠান যে নিশ্চিত অধঃপতন এমন নয়। বৈদিক ধর্মে মূর্তির প্রয়োজন ছিল না, কারণ তার দেবতাদের প্রত্যক্ষ চিহ্ন স্থূল প্রকৃতিরই নানা মূর্তি এবং তাদের চাক্ষুষ আবাস ছিল এই জড় জগৎ। পৌরাণিক ধর্ম আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবানেরই নানা স্থূলরূপের পূজা করেছে এবং অন্যোন্যপায় হয়ে বাহিরে তাকে প্রকাশ করেছে বিবিধ প্রতীক-প্রতিমার সাহায্যে, স্থাপনা করেছে এমন মন্দিরে মন্দিরে যার স্থাপত্যধর্ম একটা বিশ্বতাৎপর্য। এই বাহ্যিক অন্তর্মুখিতার জন্যই দরকার হয়েছে বাহ্য প্রতীকের প্রাচুর্য যাতে স্থূল কল্পনা ও দৃষ্টির কাছে এই সব আন্তর জিনিসের জটিলতা প্রমূর্ত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় রূপরুচি বদলেছে, কিন্তু ধর্মের অর্থ

শুধু মনস্তত্ত্বের ও ফ্যাশানেই হেরফের হয়েছে—অন্তঃসারে নয়। আসল পার্থক্য এই হল যে প্রথম যুগের ধর্ম সেই উচ্চতর মিষ্টিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার অধিকারীদের হাতেই গড়া যাঁরা বাস করেছেন এমন জনারণ্যে যাঁরা প্রধানত জড় জগতের প্রাণের দ্বারাই অভিভূত উপনিষদ এই স্থূল আবরণ খুলে ফেলে সৃষ্টি করেছে একটা মুক্ত তুরীয় ও বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা এবং পরবর্তী যুগে জনমনকে তাই প্রকাশিত হয়েছে বিরাট দার্শনিক ও বুদ্ধিগত অর্থবহ রূপাধারে যার কেন্দ্রবাসী অধিষ্ঠাতারা হলেন ত্রিমূর্তি এবং বিষ্ণু ও শিবের নানা শক্তি; বুদ্ধি ও কল্পনার কাছে এই আবেদন পুরাণে আরো টেনে চলেছিল এবং চৈত্যিক অভিজ্ঞতা, বহুধারা আবেগ, রূপরসের বোধ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের কাছে জীবন্ত করে ধরেছিল। যোগী ঋষিদের আবিষ্কৃত আধ্যাত্মিক সত্যগুলি মানুষের গোটা প্রকৃতির কাছে পরিপূর্ণ অর্থবহ হৃদয়গ্রাহী ফলদায়ক করার নিরন্তর একটা চেষ্টা, এমন একটা স্থূল উপায় এনে দেওয়া যাতে সাধারণ মন—একটা সমস্ত জাতিরই মন—আকৃষ্ট হয় তাদের দিকে প্রথমিক পরিচয়ের জন্য—ভারতীয় সংস্কৃতিরই ধর্ম-দার্শনিক বিবর্তনের এইটিই হল মর্মার্থ।

এটা দ্রষ্টব্য যে পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে উচ্চতর সব আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সত্য, পণ্ডিতের তর্কে যেমন তেমন খণ্ডবিখণ্ডিত এবং পরস্পরবিরোধীরূপে বাস্ত নয়, পরন্তু একটা নিশ্ছিদ্র, সম্বদ্ধ ও শ্রেণীবদ্ধনে এমনভাবে এক সমন্বয়ে গ্রথিত যা ভারতীয় মন ও অন্তরাত্মার ঔদার্যের একান্ত অনুবর্তী। কখনো তা করা হয়েছে প্রকটভাবে, তবে প্রায়শ এমন আকারে যা তার কিছুটাও জনকল্পনা ও লোকানুভূতির কাছে পৌঁছে দেয় উপকথা, কাহিনী, প্রতীক, রূপকথা, দৈবঘটন ও রূপকের সাহায্যে। মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার এক বিপুল ও জটিল অঙ্গ তন্ত্রের মধ্যে মূর্তিমান, দর্শনীয় রূপবিন্যাস তার নির্ভর এবং যোগাভ্যাসের বিবিধ অবয়বে তা সুসংবদ্ধ। এ জিনিস পুরাণেও পাওয়া যায়, তবে আরো শিথিলভাবে এবং পারম্পর্যের ন্যূনতর কাঠিন্যে তা চালাই। আসলে এ পদ্ধতি তো বৈদিক পদ্ধতিরই জের টানা, তবে ভিন্ন আধার এবং মনোভাবের এক পরিবর্তন দিয়ে। প্রত্যেকটি পুরাণ স্বীয় বৈশিষ্ট্যময় চৈত্যিক তাৎপর্যের উপযোগী বাহ্য প্রতিরূপ ও আচার অনুষ্ঠানের ধারা গড়ে তুলেছে। যেমন গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ত্রিবেণীসঙ্গমের পবিত্রতা এক আন্তর সঙ্গমের রূপক এবং যোগসাধনার চৈত্য-দৈহিক পদ্ধতিতে একটা চরম অভিজ্ঞতার নির্দেশক, আর অন্য অর্থও এখানে আছে—এরকম রূপক প্রয়োগের নিত্যব্যাপ্তিতার যা সুলভ। পুরাণের তথাকথিত কিম্ভূতকিমাকার ভূগোল—পুরাণের মধ্যেই যা খোলাখুলি বলে দেওয়া হয়েছে—একটা বর্ণাঢ্য কাব্যিক রূপক, অন্তরে চৈত্যিক বিশ্বের প্রতীকাত্মক ভূগোল। কখনো কখনো জড়বিশ্বের পরিচয় ধরে এই বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব প্রকাশ করেছে, বেদের মতোই, একটা আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অর্থ ও ভিত্তি। এটা সহজেই পরিলক্ষিত কেমন করে পরবর্তী কালের ক্রমবর্দ্ধমান অজ্ঞতায় পৌরাণিক প্রতীকবিদ্যার অধিকতর শৈলীসংক্রান্ত অঙ্গগুলি আধ্যাত্মিক ও চৈত্যিক বিষয় সম্বন্ধে পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও কটু স্থূল ভাবনার হাতে আত্মসমর্পণ করেছিল। সে বিপদের ঝুঁকি তাদের জনতার বোধগম্যতার মধ্যে আনার সব প্রচেষ্টার সঙ্গেই, আর বিপত্তিতে দেখতে না পারলে চলবে না জনমনকে ধর্ম-মনস্তাত্ত্বিক ও অধ্যাত্ম-মনস্তাত্ত্বিক আবেদনে সাড়া দেবার এমন যে অনুশীলন তা উচ্চতর জিনিসের যোগ্যতাও

প্রস্তুত করে। ফলাফল চিঁকেই থাকে যদিও পৌরাণিক ব্যবস্থা ছাড়িয়ে যেতে হয় অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে সূক্ষ্ম তাৎপর্যগুলির কাছে কোমলতর আবেদন ও উজ্জীবন দিয়ে, আর এরকম অতিক্রমণ যদি সম্ভব হয় তবে তার জন্য পুরাণের কৃতিত্ব বেশ বৃহদাংশে দায়ী।

পুরাণগুলি মূলতঃ সত্যাকার ধর্মীয় কাব্য, ধর্মীয় সত্যের রুচিসম্মত উপস্থাপনার একটি শিল্পকলা। অবশ্য অষ্টাদশ পুরাণের সমস্ত ভাগই এই উচ্চাসন দাবি করতে পারে না অনেক আছে আবর্জনা অপদার্থ এবং নিরেট নিরস বস্তুরও কমতি নেই, তবে মোটের ওপর এক্ষেত্রে ব্যবহৃত কাব্যশৈলী সৃষ্টির ঐশ্বর্য ও শক্তি দিয়েই সমন্বিত। প্রাচীনতম কৃতিই শ্রেষ্ঠ—শেষের দিকে একটি ব্যতিক্রম নবরীতিতে, যা আত্মপ্রতিষ্ঠ ও অতুলনীয়। উদাহরণ স্বরূপ, দু'একটি উষর বিস্তার ছাড়া বিষ্ণুপুরাণ পুরাণো এপিক-রীতির অনেকটা প্রত্যক্ষ ওজস্ ও বীর্য বজায় রেখে বেশ উল্লেখযোগ্য ধরের সাহিত্যসৃষ্টি। এখানে রয়েছে বিচিত্র গতি, প্রচুর বীর্যবান ও কিছু পরমোৎকৃষ্ট এপিক রচনা, এখানে ওখানে স্বচ্ছ মধুরতা ও শ্রীর একটা লিরিক উপাদান, সুষ্ঠুতর উচ্ছ্বাস ও কাব্যাকৃতির সুস্পষ্ট সারল্যযুক্ত রূপের নানা আখ্যান বর্ণনা। শেষে উপস্থিত এবং অধিকতর জনপ্রিয় রীতি ও পদ্ধতি—তা তো পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও অধিকতর অলঙ্কৃত ভাষার সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত—থেকে অনেকটা সরে এসে ভাগবত সূক্ষ্মতা, সমৃদ্ধ ও গভীর চিন্তা ও সৌন্দর্যপূর্ণ আরো উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এখানেই পাই সেই আন্দোলনের সার্থকতা যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়েছে ভবিষ্যতে—ভাবাকুল ও রসোন্মত্ত ভক্তিধর্মের বিবর্তন। এই রকম ব্যাপার ঘটবার অন্তর্নিহিত প্রবণতাটি ভারতীয় ধর্মমানসের আদি রূপাবলির মধ্যেই ছিল, এবং ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল, তবে জ্ঞান ও কর্মের তপঃকাঠিন্যের এবং সত্তার শুধু উচ্চতম সব স্তরেই আধ্যাত্মিক উল্লাস সন্ধানের দিকে প্রত্যাপান্বিত প্রবণতার দ্বারা তা এ যাবৎ চাপা পড়ে ছিল, পূর্ণবিয়ব প্রাপ্তিও ব্যাহত ছিল। ক্লাসিকাল যুগের বহির্জীবনের দিকে বহির্মুখী গতি ও প্রবৃত্তি সাধন নিয়ে এল একটা নূতন অন্তর্মুখী গতি যার বৈষ্ণব ধর্মের পরবর্তী রসাস্পদ রূপটি হল পরিপূর্ণতম প্রকাশ। ধর্ম-নিরপেক্ষতা এবং বাহ্যিকে সীমাবদ্ধ এই প্রাণিক ও ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতার অনুপ্রবেশ নিয়ে যেতে পারত স্নায়ু ও বীর্যের শিথিলতায় এবং রসরুচির অবনতি ও উচ্ছৃঙ্খলতায়; কিন্তু ভারতীয় মন তার মুখ্য প্রবৃত্তি দ্বারা সর্বদা শাসিত জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আধ্যাত্মিক নামধামে চেলে গ্রহণ করে এবং তারই ফল একান্ত বাহ্য জিনিসেরও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার জন্য ভিত্তিতে রূপান্তর। আবেগাত্মক, ঐন্দ্রিয়িক, এমন কি অন্তরাত্মাকে আরো বেশি বাহিরের দিকে টেনে নিয়ে যাবার আগে সত্তার ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তিধারা পর্যন্ত, গৃহীত রূপান্তরিত হয়েছে একটা চৈত্যিক রূপে, এবং এমন পরিবর্তনে তারা হয়ে উঠেছে ভগবানকে হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের এক রহস্যময় মাধ্যমে অধিকারের উপাদানে, ভগবৎ প্রেম আনন্দ সৌন্দর্যের ধর্মে। তন্ত্রে এই সব নব উপাদান গৃহীত হল এবং তাদের স্থান নির্দিষ্ট হল একটা পূর্ণ চৈত্য-আধ্যাত্মিক ও চৈত্য-ভৌতিক যোগবিজ্ঞানে। বৈষ্ণব-ধর্মে তার সুপরিচিত রূপটি বালক কৃষ্ণের গ্রাম্যকল জীবনে রহস্যময় উপাখ্যান ঘিরে। 'বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণকাহিনী দৈব অবতারের বীরগাথা পরবর্তী পুরাণে দেখি রূপাত্মক রসাত্মক প্রতীকটির

সম্পূর্তি. ভাগবতে এর ঘটেছে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্তি এবং প্রস্তুতি এর পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক দার্শনিক তথা চৈত্যিক অর্থটি প্রকাশের এবং সনন্নরের কেন্দ্রটি জ্ঞান থেকে আধ্যাত্মিক আনন্দ ও প্রেমে সরিয়ে নিজস্ব ধারায় পূর্বতন বৈদান্তিক তাৎপর্যের নব রূপায়ণ। এই বিবর্তনের সর্বাঙ্গসুন্দর পরিণাম পাওয়া যাবে চৈতন্যদেব প্রচারিত ভগবৎ-প্রেমের দর্শন ও ধর্মে।

বেদান্ত দর্শনের পরবর্তী রূপায়ণ, পৌরাণিক ভাব ও কল্পনারাশি এবং ভক্তিধর্মসমূহের কাব্যিক ও রূপরসাশ্রিত আধ্যাত্মিকতা—জন্ম থেকে এরাই আঞ্চলিক সাহিত্যের প্রেরণা যুগিয়েছে। সংস্কৃতভাষা সাহিত্যের হঠাৎ সমাপ্তি ঘটল না। বিশেষত দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কাল পর্যন্ত ক্লাসিকাল ধারায় কাব্য চলেছিল এবং সংস্কৃত এখন এখানে দর্শনের ও সকল রকম পাণ্ডিত্যের ভাষা যাবতীয় গদ্যরচনা, সমালোচক মনের সমস্ত ভাষ্য এই প্রাচীন ভাষাতেই লেখা হয়। কিন্তু প্রতিভার দ্যুতি বড় তাড়াতাড়ি নিভে গেল, রচনা হয়ে পড়ল আড়ষ্ট, তারী ও কৃত্রিম, এবং শুধু পাণ্ডিত্যের খুরধারই থাকল তাকে বয়ে নিয়ে চলতে। প্রত্যেক প্রদেশে স্থানীয় ভাষা কোথাও একটু আগে বা কোথাও একটু পরে সাহিত্যের পদবীতে উঠে আসে এবং কাব্যসৃষ্টির বাহন ও গণসংস্কৃতির হাতিয়ার হয়। জনপ্রিয়-উপাদান বর্জিত না হয়েও সংস্কৃত মূলতঃ এবং শ্রেষ্ঠার্থে বহৎ অভীপ্সা এবং মহান রীতির প্রয়োজন অনুসারে একটা সমুচ্চ আধ্যাত্মিক, বুদ্ধিগত নৈতিক ও রূপরসাক্ত সংস্কৃতির পোষক ও ধারক এক অভিজাত ভাষা—যা এ-ভাবে শুধু সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পক্ষেই সুগম এবং এই সংস্কৃতিকে সে প্রভাব ও অন্তঃপ্রণালীর নানা ধারায়, বিশেষ করে ধর্ম শিল্পকলা আর সামাজিক ও নৈতিক বিধিনিয়মের দ্বারা, জনসমক্ষে পৌঁছে দিয়েছে। সংস্কৃত লেখকরা তিনটি সর্বোচ্চবর্ণের অন্তর্গত, প্রধানত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, পরবর্তীকালে তাঁরা হলেন এমন পণ্ডিত যাঁদের রচনা অতিশয় সুধী সংস্কৃতিবানের জন্য; বৌদ্ধ রচয়িতারাও প্রধানত দার্শনিক, ভিক্ষু, রাজা, প্রচারক—কখনো লিখেছেন নিজের জন্য, কখনো অধিকতর জনপ্রিয়রূপে জনসাধারণের জন্য; কিন্তু আঞ্চলিক ভাষার কাব্য নিঃসৃত হয়েছে জনহৃদয় থেকে এবং তার রূপকার এসেছে ব্রাহ্মণ হ'তে নিম্নতম শূদ্র ও অস্পৃশ্য এই সকল শ্রেণী থেকে। এক-মাত্র উর্দুতে এবং কিছু অল্প পরিমাণে দক্ষিণী ভাষায়ই—যেমন তামিলে, যার সুবর্ণ যুগ ক্লাসিকাল সংস্কৃতেরই সমকালীন, তার পরবর্তী রচনা দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন অথবা অর্ধস্বাধীন রাজসভায় বা রাজ্যে অব্যাহত ছিল—দেখা গিয়েছে পণ্ডিতী বা ক্লাসিকাল নেজাজ ও অভ্যা-সের প্রবল প্রভাব; কিন্তু এখানেও জনপ্রিয় উপাদানের প্রাচুর্য, যেমন শৈব সন্ত ও বৈষ্ণব আলবারদের গানে। এ ক্ষেত্র এত বিস্তীর্ণ যে সবটার সম্বন্ধে ধারণা ও ব্যাখ্যা সম্ভব নয়, তাহলেও এই পরবর্তী সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্য সম্বন্ধে কিছু বলতেই হয় যাতে দেখতে পাই সহস্তর কালের তুলনায় এই যে ভাবা হয় বাধানিষেধের ও অধঃপতনের যুগ সেখানেও ভারতীয় সংস্কৃতি কত প্রাণবন্ত ও অদম্য সৃজনশীল হয়ে রয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্য যেমন শুরু হয়েছে বেদ উপনিষদ দিয়ে এই সব পরবর্তী সাহিত্যের যাত্রারম্ভ সন্ত ভক্তদের অনুপ্রাণিত কাব্য নিয়ে: কারণ, ভারতবর্ষে চিরকাল একটা আধ্যাত্মিক আন্দোলনই জন্ম দিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে নব নব ভাব ও সম্ভাবনার রূপায়ণে, সূত্রপাত

করেছে জাতীয় জীবনের নানা পরিবর্তনের। আধুনিক যুগের আগে এই সমস্ত অধিকাংশ ভাষার সৃজনশীল উদ্যমে এই ধরনটাই প্রায় বরাবর আধিপত্য করেছে, যেহেতু এই ধরনের কাব্যই সর্বদা জনসাধারণের মন ও হৃদয়ের নিকটতম ছিল . এবং যেখানে রচনার সুর অধিকতর মর্তপ্রয়াসী সেখানে পর্যন্ত ধর্মীয় প্রবণতা প্রবেশ করেছে ও কাঠামোটি গড়ে দিয়েছে, ধরে দিয়েছে সুরের অথবা প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যটির খানিকটা। প্রাচুর্যে, কাব্যোৎকর্ষে, উদ্দেশ্যের স্বতঃস্ফূর্ত সৌন্দর্য ও সাঙ্গীতিক পাটবের মিলনে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোনো সাহিত্যে এ-কাব্যের তুলনা মেলে না। সৌন্দর্যের এমন উষ্ণ ভঙ্গির কাব্য রচনার পক্ষে শুধু ভক্তি-অনুভূতির নিষ্ঠা থাকলেই যথেষ্ট নয়, খ্রীষ্টীয় য়ুরোপে এ ধরনের কাব্যে বক্তব্য যেমন প্রধান, এর জন্য প্রয়োজন গভীর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি। সাহিত্যের আর এক অংশ ব্যাপৃত রামায়ণ-মহাভারত কাহিনীর নূতন কাব্যরূপ কিংবা প্রাচীন কিম্বদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠ রোমান্টিক উপাখ্যান ধরে সেই সংস্কৃতির নির্যাস কিছু জনপ্রিয় ভাষায় ফুটিয়ে তোলা; এখানেও আবার পাই যেমন একান্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিভার তেমনি কমদরের অপচ তবু উচচ সুরের অবদান। তৃতীয় ধারা জীবন্ত চিত্রিত করেছে জনপ্রবাহের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতি সব, রাজসভা শহর গ্রাম কুটীরের জীবনধারা, জমিদার বণিক শ্রমিক কৃষকের জীবনধারা। আঞ্চলিক ভাষায় রচনার বৃহদাংশ এর কোনো একটি বিভাগে পড়বেই, তবে কিছু বৈচিত্র্য দেখা দিতে পারে যেমন মহারাষ্ট্রে রামদাসের ধর্ম-নৈতিক এবং রাজনীতিক কাব্যবালা কিম্বা পরিকল্পনায় ধারণায় রূপায়ণের শক্তিতে এ যাবৎ এ রকম যা রচিত হয়েছে তার শ্রেষ্ঠ সেই তামিল সন্ত তিরুভাল্লুভরের উপদেশাত্মক সুভাষিতাবলী। এ সব ভাষার দু একটিতে একান্ত পার্থিব প্রেরণার বেশ গীতিমাধুর্যময় পরবর্তীকালের রসের কাব্যও আছে। এই সব প্রাদেশিক কৃতীদের যাবতীয় রচনায় অঙ্গরূপের নানা পরিবর্তনের ভিতরেও একই সংস্কৃতির আধিপত্য, কিন্তু প্রত্যেকে নিজস্ব স্বকীয় প্রকৃতি ও ধাতুর ধারা নিয়ে সৃষ্টি করে চলেছে—এবং তাতেই এসেছে স্বতন্ত্রতার ছাপ—এই সব অনুপম ও প্রচও সাহিত্যে ঐক্যের মধ্যে সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের উৎস।

এই রকমে ধাতুগত পার্থক্যের চাপে নানা প্রদেশে বৈষ্ণবকাব্য শ্রীমণ্ডিত নানা রূপ ধরেছে। প্রথম হল পুরাণসৃষ্ট চৈত্তিক প্রতীকের প্রয়োগ, বঙ্গদেশে তার একান্ত পরিপূর্ণ ও শ্রীময় আকৃতি এবং সেখানেই তার সুদীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের প্রবাহ। সেখানে ভগবানের জন্য অন্তরাত্মার তৃষ্ণাকে অনুরাগ সংগীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে রাধাকৃষ্ণের প্রতীক-প্রতিমায়, প্রকৃতি-আত্মা পরমাত্মার সন্ধানে রত, তাঁর রূপে মুগ্ধ বশীভূত, তাঁরই বাঁশির যাদুতে আকৃষ্ট, এই অনন্য অদম্য রসের জোয়ারে মানুষী ভাবনা ও কর্তব্য হারা, এবং রস-ভাবান্তরের ছন্দে প্রারব্ধ বাসনার ভিতর দিয়ে যাওয়া মিলনের আনন্দে, বিরহের দুঃখে, নিত্য আকাঙ্ক্ষা ও পুনর্মিলনে, ভগবানের জন্য মানবাত্মার প্রেমলীলায়। এখানে রয়েছে সুনির্দিষ্ট অঙ্গরেখা ও পৌর্বাপর্য, সূক্ষ্মভাবে সরল গীতিময় ছন্দ, হৃদয়স্পর্শী স্পষ্টতা এবং প্রায়শ তীব্র সৌন্দর্যের এক ঐতিহ্যময় কাব্যবাণী। এই অনবদ্য গীতিময় আঙ্গিক যেন জন্ম থেকেই নিখুঁত এই দুটি প্রতিভার অঙ্কে যাঁরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন—বিদ্যাপতি, শব্দ ও পদের নিপুণতম শিল্পী, আর সেই অনুপ্রাণিত গায়ক চণ্ডীদাস, যাঁর নামে চলে আসছে

অন্য যে-কোন ভাষায় রচিত প্রেমসঙ্গীতের সমকক্ষ মধুরতম নিবিড়তম গীতি। প্রতীকটির আশ্রয় হয়েছে এখানে মানুষী প্রবৃত্তির একান্ত স্থূল মূর্তি এবং তা এতখানি যুক্তিযুক্তভাবে যে অনেকেই এখন ভাবেন তার আর অন্য অর্থ নেই, কিন্তু চৈতন্যদেবের ধর্মাশ্রয়ী ভক্ত কবিদের দ্বারা ব্যবহৃত এই একই প্রতিমা প্রয়োগ তাকে সম্পূর্ণ খণ্ডন করে। ওই প্রতীকে বিধৃত যাবতীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্রমূর্ত ভাগবত প্রেম-মাধুর্যের প্রবক্তা ও প্রতিমায় এবং তার আধ্যাত্মিক দর্শনটি তাঁরই শিক্ষায় সুস্পষ্ট বিবৃত। যাঁর শিষ্যরা পূর্বতন গায়ক-দেরই কাব্যাদর্শ টেনে চলেছেন এবং প্রতিভা মাত্রায় নিচে নেবে এলেও রেখে গিয়েছেন আজিকে সর্বদা রূপময় এবং ভাবে প্রায়শ গভীর ও মর্মগ্রাহী বিরাট এই ধরণের এক কাব্য-সম্ভার। রাজপুত-রাণী মীরা বাঈয়ের অনিন্দনীয় গীতিবালা আর এক ধরন, যেখানে কৃষ্ণ প্রতীক আরও সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত গায়কের অন্তরাত্মা থেকে ভাগবত প্রেমিকের উদ্দেশ্যে উৎসারিত প্রেমসঙ্গীত ও অভিসার। বাংলার কাব্যে যে প্রকাশ অনুসৃত তাতে প্রতীক-মূর্তিটি কবি-নিরপেক্ষ এখানে কিন্তু ব্যক্তিগত সুরটি আবেগকে এনে দিয়েছে বিশেষ এক তীব্রতা। আরও নিবিড় এক সঙ্গ এনে দিয়েছেন এক দক্ষিণী মহিলা কবি যিনি নিজেকেই দেখেছেন কৃষ্ণের নববধূরূপে। এ প্রকৃতির বৈষ্ণব ধর্ম ও কাব্যের অপূর্ব শক্তি হল সকল মানুষী আবেগ ভগবৎমুখী করে তোলায়, তাদের মধ্যে প্রেমের প্রবেগকেই তীব্রতম এবং একান্ত চিত্তাকর্ষক বলে গ্রহণ করায়, এবং যদিও যেখানেই এই ভক্তিধর্মের প্রবল স্ফূর্তি ঘটেছে সেখানেই এ-ভাবের উদয় তবু ভারতীয় কবিদের রচনার মধ্যে যেমন শক্তি ও আন্তরিকতার সঙ্গে সৃষ্টি তেমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

অন্য বৈষ্ণব কাব্যে কৃষ্ণ প্রতীক ব্যবহার হয়নি তবে উদ্দেশ করা হয়েছে আরো স্পষ্ট ভাষায় বিষ্ণুকে কিম্বা কখনো কখনো তার কেন্দ্র অবতার শ্রীরামচন্দ্র। এ ধরনের সর্বাধিক পরিচিত রচনা তুকারামের গান। বাংলার বৈষ্ণব কাব্য বিরল ক্ষেত্র ছাড়া বুদ্ধিবাগীশ চিন্তা এড়িয়ে চলেছে এবং নির্ভর করেছে নিছক আবেগাপ্লুত বর্ণনার উপর, প্রাণাবেগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মূর্তি এবং অনুভূতির তীব্রতার উপর পক্ষান্তরে মারাঠি কাব্যে গোড়া থেকেই একটা প্রবল মানসিকতার সুর। আদি মারাঠি কবি একাধারে ভক্ত যোগী ও ভাবুক, সন্ত জ্ঞানদাসের কাব্য, যিনি জড়িত একটা দেশের জন্ম ও জাগরণের সঙ্গে, গীতিকাব্যের চড়া-পর্দায় তুলে ধরা প্রায় সমস্তটাই এক ধর্মীয় নৈতিক চিন্তা ; ভক্তিপূর্ণ হৃদয় থেকে উৎসারিত চিন্তার অন্তর্ভেদী সত্য ও উদ্দীপনাই গড়ে দিয়েছে তুকারামের গানের শক্তি ও মাধুর্য। ভক্ত কবিদের দীর্ঘ সারি তাঁরই তোলা সুরটি বাজিয়ে এসেছে আর মারাঠা কাব্যের বৃহত্তর ভাগ এঁদেরই রচনায় পূর্ণ। একই ধারা লঘুতর অথচ উঁচু পর্দায় সুর তুলেছে কবীরের কাব্যে। বঙ্গদেশে মুসলমান যুগের শেষে ভগবতী জননীর উদ্দেশ্যে রামপ্রসাদের গানে সেই একই উদ্দীপ্ত ভক্তির সঙ্গে ধর্মীয় চিন্তার নানা গভীরতা ও ভক্তীয় বিশ্বাস, যার সঙ্গে এখানে আরো যুক্ত এমন জীবন্ত কল্পনার খেলা যা পরিচিত জিনিসকে যথোচিত ও অর্থপূর্ণ রূপকে পরিণত করে এবং একটা অনুভূতির সুতীব্র স্বতঃস্ফূর্ততায়। দক্ষিণে গভীরতর দার্শনিক ভাষণ প্রায়ই ভক্তির সুরের সঙ্গে মিশ্রিত, বিশেষত শৈব কবিদের মধ্যে এবং প্রাচীন কবিদের মধ্যে, এবং প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে যেমন তেমনি একটা জীবন্ত বাক্য ও রূপকের

প্রবল তেজে প্রদীপ্ত, আরো উত্তরদেশে সমুচ্চ বৈদান্তিক আধ্যাত্মিকতা পুনর্জীবন লাভ করল সুরদাসের হিন্দী কাব্যে, অনুপ্রেরণা দিল নানক এবং শিখ গুরুদের। প্রাচীন সভ্যতার দু হাজার বছর ধরে প্রস্তুত ও নির্মিত করা আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি এই ভারতীয় জনতার মানস-ক্ষেত্র প্লাবিত করে ফেলেছে ও জন্ম দিয়েছে মহৎ নব নব সাহিত্যের এবং তারই প্রবাহপথে সেই কণ্ঠও নিরন্তর শোনা যায়।

ভাটি কয়েক মহান অথবা প্রসিদ্ধ রচনা বাদ দিলে এযুগের আখ্যানকাব্য কমই উল্লেখ-যোগ্য এবং মৌলিক। এসব অধিকাংশ ভাষায় একটা সাংস্কৃতিক প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল মহাভারতের সমগ্র মূল কাহিনীটি কিম্বা তার কোনো কোনো উপাখ্যান এবং অধিকতর ব্যাপকভাবে, রামায়ণের গল্পটি জানপদ ভাষায় বর্ণিত করা। বঙ্গদেশে রয়েছে কাশী-রামের মহাভারত, সেই প্রাচীন মহাকাব্যের সারাংশ স্বচ্ছ ক্লাসিকাল ভঙ্গিতে সহজভাবে পুনরাবৃত্তি, রয়েছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ—খরপ্রাণ মৃত্তিকার আরো ঘনিষ্ঠতায়, উভয় ক্ষেত্রেই অভাব এপিক ভঙ্গিমার কিন্তু তবু তারা রচিত একটা সরল কাব্যকৌশল এবং দ্রুত আখ্যানশক্তি দিয়ে। এই পরবর্তী কবিদের মাত্র দু'জন অবশ্য প্রাচীন কাহিনীটি জাগ্রত জীবন্তভাবে পুনরায় সৃষ্টি এবং একটি চূড়ান্ত মেরাশিল্প রচনা করতে পেরেছিলেন—কাম্বান, যে তামিল কবি তাঁর বিষয়কে দিয়েছিলেন একখানি মহৎ মৌলিক মহাকাব্যের রূপ, আর তুলসীদাস—যাঁর প্রসিদ্ধ হিন্দী রামায়ণে অসামান্য দক্ষতায় বিশ্রিত লিরিক তীব্রতা, রোমান্টিক সমৃদ্ধি এবং মহাকাব্যোচিত কল্পনার উদ্যুক্ততা এবং যুগপৎ ভাগবত অবতারের কাহিনী ও ধর্মভক্তির সুদীর্ঘ স্তোত্রগাথা। এ সাহিত্যের জনৈক ইংরেজ ঐতিহাসিক দাবি পর্যন্ত করেছেন যে বাল্মীকির মহাকাব্যের চেয়ে তুলসীদাসের কাব্য বড় এটা অত্যুক্তি এবং, গুণপনা যতই থাকুক, শ্রেষ্ঠের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর হয়না, তবে তুলসীদাস ও কাম্বানের স্বপক্ষে এমন দাবি যে উঠেছে তাতে অন্তত প্রমাণ কবিদ্বয়ের ক্ষমতা তার সংস্কৃতি ও জ্ঞানের কীর্ণমাণ পরিধিতে ভারতীয় মনের সৃজনশীল প্রতিভার অপহ্নব ঘটেনি। এসব কাব্য স্পষ্টই দেখায় যে প্রাচীনের উচ্চতা ও সমৃদ্ধির লোকসান কতকাংশে ক্ষতিপূরণ হয়েছে তীব্রতার লাভ দিয়ে।

এধরণের আখ্যান রচনার যেমন পুরাণে সূত্রপাত, অন্যটি তার প্রারম্ভিক রূপ ও প্ররোচনা পেয়েছে কালিদাস ভারবী মাঘের ক্লাসিকাল কাব্য থেকে। কিছু সংখ্যক শিল্পী পূর্বতন কাব্যের মতো তাঁদের বিষয় হিসাবে মহাভারত, অন্য প্রাচীন কিম্বা পৌরাণিক উপকথা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু ক্লাসিকাল ও এপিক রীতি অন্তর্হিত হয়েছে, অনুপ্রেরণা মনে হয় পুরাণের সমগোত্রীয় এবং জনপ্রিয় রসন্যাসের শিথিল সহজ সংবৃদ্ধিও দেখা যায়। এধারা পশ্চিম ভারতে বেশি সুলভ এবং এতে উৎকর্ষই গুজরাতকবিকুলশিরোমণি প্রেমানন্দের যশের কারণ। বঙ্গদেশে দেখি অন্য আর এক রকম আধ-রোমান্টিক আধ-বাস্তবিক আখ্যান যাতে প্রস্ফুটিত সমসাময়িক কালের ধর্মীয় মন, জীবন এবং পরিবেশের কাব্যচিত্র—যার প্রেরণার সঙ্গে রাজপুত চিত্রকলার লক্ষ্যের অধিকতর বহিরঙ্গের দারুণ মিল। সহজ সরল পাঁচালি কাব্যে রচিত চৈতন্যদেবের জীবন—আন্তরিকতা এবং ঋজুতার আবেদন তাতে কিন্তু কাব্যের আঙ্গিকে ন্যূনতা—একটা ধর্মান্দোলনের জন্ম ও প্রতিষ্ঠার অপূর্ব সমসাময়িক চিত্রকৃতি। অন্য দুটি কাব্য যে ক্লাসিকের মর্যাদা পেয়েছে, তব পেয়েছে দুর্গা বা চণ্ডীর—

শিব-শক্তির অধিকারিণী দেবী—মুকুন্দরামের "চণ্ডী", মনুচ্চ কাব্যশ্রীমণ্ডিত নিছক একখানি রোমান্স যার জনপ্রিয় উপকথার আয়তনে বিধৃত জনজীবনের রীতিমতো জীবন্ত আলেখ্য, এবং ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'—যেখানে প্রথম ভাগে পৌরাণিক দেবদেবীর কাহিনীর পুনরাবৃত্তি, তবে বাঙ্গালী গ্রামবাসীর নিজস্ব জীবনের ধাঁচে কল্পিত রূপে, দ্বিতীয় ভাগে একটি রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান এবং তৃতীয় পর্বে ভারতচন্দ্রের সময়কার একটি ঐতিহাসিক ঘটনা,—সমস্তখানির এই বিক্ষিপ্ত উপাদান একটি কেন্দ্রিয় উদ্দেশ্যে ক্রমবৃদ্ধি গড়ে তুলেছে, তাতে প্রস্তাবনার কল্পনাকুশল শীর্ষগামিতা না থাকলেও রয়েছে বর্ণনার অনতিক্রমণীয় সজীবতা এবং প্রাণরসের ও প্রত্যয়সূচক বাণীর শক্তি। এই সমস্ত কাব্য, মহাকাব্য ও পাঁচালী, গীতিকাব্য—যার প্রধান প্রতিনিধি রামদাস ও তিরুভাল্লুবরের প্রসিদ্ধ কুরাল, এবং অন্যান্য দার্শনিক ও ভক্তিমূলক গীতিকাব্য সংস্কৃতিবান শ্রেণীর দ্বারা বা তাদের প্রশংসার জন্য রচিত হয়নি, বরং ব্যতিক্রমের কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া একটা গণসংস্কৃতিরই প্রকাশ। তুলসীদাসের রামায়ণ, রামপ্রসাদ ও ভবঘুরে ভক্ত বাউল বৈষ্ণবদের গীত, রামদাস ও তুকারামের গান, তিরুভাল্লুভার ও মহিলাকবি অৌবৈর বাক্যাবলী এবং দক্ষিণী সন্ত ও আলবারদের আকুল গীতিকাব্যমালা সর্বশ্রেণীর কাছে সুপরিচিত, তাদের ভাবনা বা আবেগ জনজীবনের গভীরে অনুপ্রবেশ করেছিল।

সাহিত্যের ওপর এত সময় দিলাম কারণ অবশ্য পূর্ণ না হলেও এটিই ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বিচিত্র ও প্রাচুর্যময় স্বাক্ষর। অন্তত তিন সহস্র বৎসরব্যাপী এধরনের ও এত বহুৎ রচনা যে একটা বাস্তবিক ও অতীব উল্লেখযোগ্য সংস্কৃতির প্রমাণ তাতে সন্দেহ নেই। শেষ যুগে অবশ্য দেখিয়েছে একটা ক্রমাবনতি, কিন্তু অবনতিরও একটা ঐশ্বর্য লক্ষ্য করা যায়, বিশেষত: ধর্মীয় সাহিত্যিক ও সুশোভন সৃষ্টির অবিরাম প্রাণধারায়। এমন যখন মনে হয়েছে সমাপ্তি আসন্ন তখন প্রথম সুযোগেই সে জেগে উঠেছে, শুরু করছে আর এক বৃত্ত, প্রথমত: সেই তিনটি বিষয়ে যার স্থায়িত্ব ছিল দীর্ঘতম—আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্ম, সাহিত্য, চিত্রকলা—কিন্তু ইতিমধ্যেই সেই পুনরুত্থান জীবন ও সংস্কৃতির যে বহুধা কর্মে ভারত একদা মহান ও নেতৃস্থানীয় জাতি ছিল তাতে সঞ্চারিত হতে চলেছে।*

---

* Foundations of Indian Culture

সুন্দরের সন্ধানে

সর্বকালে সর্বদেশে সাহিত্যের আন্তরিক রসগ্রাহীরা সত্য-সুন্দরের অনুসন্ধান ও উপাসনা করে এসেছেন। প্রবন্ধে উপন্যাসে নাটকে কাব্যে নানা রূপে এই এক সার্বভৌম সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। প্রবন্ধে মনীষা সংবোধিতে অবগাহন করে তত্ত্ব ও সত্যের জ্যোতির্ময় অস্তিত্বকে প্রকট করে ধরে—পূর্ণ্রাহী ভাবকে বাস্তবিক করে তোলে। উপন্যাস তার সীমাহীন প্রাণতরঙ্গের মধ্যে এক সামঞ্জস্যের সুর জাগিয়ে দেয়, বহুধারাকে একটি আত্ম-স্থিতির কেন্দ্রে সমাহিত রাখে। নাটকে প্রস্ফুটিত বাস্তবের প্রবেগ—ঘাত-প্রতিঘাতে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার উপলাঘাতে সৃষ্টির অমোঘ প্রবাহ সেখানে প্রত্যক্ষগোচর। কাব্য ধরেছে সত্যের স্পন্দন, বাক ও ছন্দের যাদুর মধ্যে অরূপের অন্তরাত্মা। এই রকমে ধ্বনির কারুকার্যে, দৃষ্টির কল্যাণে, বাণীর কুশলতায় অবাঙমানসগোচর সৌন্দর্য-প্রতিমার তিলোত্তমা মূর্তিটি তিলে তিলে পূর্ণবিয়বে ফুটে উঠেছে।

Wonderful, gold like a moon in the square of the sun
where thou strayest
Glimmers thy face amid crystal purities...
(Ahana)

এই পরম সৌন্দর্যবরীর তপস্যায় অপেক্ষারত কবিচিত্ত ব্যগ্র ব্যাকুল—

তোমাদের বাসরকুঞ্জের বহির্দ্বারে
বসে আছি—কানে আসিতেছে বারে বারে
মৃদুমন্দ কথা, বাজিতেছে সুমধুর
রিনিঝিনি ঝুনুঝুনু সোনার নূপুর—
কার কেশপাশ হতে খসি পুষ্পদল
পড়িছে আমার বক্ষে, করিছে চঞ্চল
চেতনা-প্রবাহ। কোথায় গাহিছে পান।
তোমরা কাহারা মিলি করিতেছ পান
কিরণকণকপাত্রে সুগন্ধি অমৃত,
মাথায় জড়ায়ে মালা পূর্ণবিকশিত
পারিজাত—গন্ধ তারি আসিছে ভাসিয়া
মন্দ সমীরণে—উন্মাদ করিছে হিয়া
অপূর্ব বিরহে। খোলো দ্বার, খোলো দ্বার।
(চিত্রা)

কবি এখানে দিয়েছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গাঢ়বন্ধ ভাষায় ও ভঙ্গিতে অভীপ্সার চিত্র—বৈষ্ণব বিরহের আকুলতায়। ধর্মসাধনায় এ ত অন্তরতী ভাব। এরও পরে মাধুর্যের অবতারণা—

সৌন্দর্যের রসের আর এক স্তর। আন্তর অনুশীলন ও অধ্যায় প্রয়াসে মুমুক্ষুর পার হয়ে যাবার মতো শিল্পী-চেতনায় পর্যন্ত এক সময়ে এই রহস্যময় অভিসারিকার ভূমিকা অতিক্রম করে যেতে হয়।

সৌন্দর্যপসারী সত্যান্বেষু জনৈক আধুনিক সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জবানবন্দী এখানে লিপিবদ্ধ করছি। তিনি আপ্লুত সত্য-সুন্দরের অভিসারে বের হয়ে একাকী দূর-দূরান্তর দেশদেশান্তর অতিক্রম করলেন, বিদেশী সাহিত্যের বিচিত্র সপ্তসমুদ্র পার হলেন, কত সূর্যোদয়ের পর কত নিরন্ধ্র তামসী রজনী পিছনে ফেলে এলেন, কতকাল তাঁর বয়ে গেল। পার্থিব মাত্রায় হয়ত এ-ব্যবধানের এক পরিমাপ, কিন্তু রহস্যজগতের আর এক মাপে তা যুগযুগান্তর জন্মজন্মান্তর। প্রতীক্ষাবসানে এক নিভৃত নিশান্তে তাঁর সম্মুখের তিমির-দুয়ার খুলে গেল। তিনি দেখলেন মূর্তিমতী পরম সৌন্দর্যময়ীকে—অপ্রসাধনের অনির্বচনীয়তা তাঁর সর্বাঙ্গে, যেন কোনো স্বপ্নময় জগৎ থেকে সদ্যমাত্র মর্তে অবতীর্ণ, অলোকের এক সুরভি তাঁর আগমনী ঘোষণা করে চলে।

> Thou in the air, with a flame in thy hair, the whirl of the wonders watching,
> Holdest the night in thy ancient right, mother divine, hyacinthine, with a girdle of beauty defended.
> Sworded with fire, attracting desire, thy tenebrous kingdom thou keepest,
> Starry-sweet, with the moon at thy feet now hidden now seen
> the clouds between in the gloom and the drift of thy tresses.
>
> (The Mother of Dreams)

গীতাকার রহস্যোদ্ধার করে বলেছেন সর্বোত্তমের সেই নানাবিধ দিব্য নানাবর্ণাকৃতির শতশত সহস্রসহস্র রূপ (১১।৫) দেখতে হলে প্রয়োজন দিব্যচক্ষু। এই সূত্র ধরে বলা চলে শিল্পলোকে রূপোত্তম রসোত্তমের শ্রেষ্ঠ দর্শনও আর এক দর্শনেন্দ্রিয় ধরে—অন্তরাত্মার প্রতিভা বা অন্তশ্চক্ষু দিয়ে। সাহিত্যিক শিল্পী কত খাঁটি কত গভীর তার নিরিখ ভিতরে এই অন্তরাত্মার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা।

লীলায়ন

(সুদীর্ঘ পালাকীর্তন)

নিশিকান্ত

[যে অকৃতদার গৃহস্থভক্তের দিব্যদর্শন সম্পর্কিত জীবন-কাহিনী অবলম্বনে সুদীর্ঘ পালাকীর্তনরূপে এই "লীলায়ন" লেখা হয়েছে, তিনি হিন্দুধর্মের অবতারবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাস ছিল গতানুগতিক।

একদিন প্রবাসে তরুতলে ব'সে তিনি ভাবছিলেন তাঁর জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, তাঁর প্রাচীন কুলদেবতা মুরলীমনোহরকে কোথায় রাখবেন, কার হাতে সমর্পণ করে যাবেন, ইত্যাদি। সেই সময় একজন সন্ন্যাসী এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে সব বৃত্তান্ত জেনে তাঁকে বললেন, "তুমি প্রবাসে আসনি। এ যে ব্রজধাম, রাধারাণীর রাজ্য। চলো আমার আশ্রমে রাধারাণীর প্রসাদ পাবে।"

এই বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে তিনি দেখলেন, তাঁরই কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের মুরলীমনোহর বিগ্রহের পাশে শ্রীরাধার বিগ্রহ। যুগল বিগ্রহের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরিত হচ্ছে। সেই সমুজ্জ্বল দিব্যদর্শন লাভের পর তিনি সন্ন্যাসীর কাছে প্রার্থনা জানালেন, তাঁর কুল-দেবতা মুরলীমনোহরকে এই আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। সন্ন্যাসী সম্মতি দিলেন।

উক্ত দিব্যদর্শনের পর তিনি এমনই তন্ময় হয়ে গেলেন যে অবতারবাদ আর তাঁর কাছে গতানুগতিক রইল না। নিজেকে দর্শন করিয়ে 'মুরলীমনোহর' তাঁকে অন্যান্য অবতারদেরও দর্শন করালেন।

লেখক ইতিপূর্বে এই ধরণের জীবনকাহিনীমূলক গীতিকাব্য বা পালাকীর্তন রচনা করেননি, বহুশতাধিক গীতিকবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু লেখায় সুরদানের ক্ষমতা তাঁর নেই। তাঁর লেখায় সুর দিয়েছেন তাঁর গুণী বন্ধুরা। হয়তো ভবিষ্যতে তাঁর এই লীলায়নেও কীর্তনের সুর দেবেন তাঁর কোনো গুণী বন্ধু। —সম্পাদক]

প্রথম পালা

(সদ্য দিব্যদর্শনলাভের পর অনুভূতিময় উক্তি)

(১)

শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে :
বৃন্দাবন ধাম
করিয়া অভিরাম
ভাতিলে তুমি মোর দুনয়নে।
সন্ন্যাসীর বনে গোপনে ভর করি',
তাহারি কণ্ঠের কথার ধ্বনি ধরি'
তোমার কাছে নিলে,
রভসে রঙ্গিলে
আমার ম্রিয়মাণ প্রাণ-বনে।
হে অনুকম্পার
অমিয়-পারাবার,
নিয়েছ মোরে তব লীলায়নে।
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(২)

তব অধরে ধরা
মুরলী হ'তে ঝরা
ভুবনবিমোহন সুররাশি
গোপললনা-বলে
আনি' যমুনা জলে
আমারি মাঝে তোলে উদ্ভাসি'।
নিখিল-হৃদি-রাধা তব মিলনে বাঁধা,
দোঁহার গলে মালা মাধবী ফুলে গাঁথা ;
সুনীল কমলে কি
তোমারি মুখ দেখি' ?
দুলি রোমাঞ্চিত শিহরনে।

কেলিকদম্বের
কোমল কেশরের
পরশে নিলে তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর
মুরলীমনোহর
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৩)

আজো যে অঘটন
ঘটার শুভক্ষণ
আনিতে পারো তুমি অবনীতে,
আমার এ জীবন
তারি নিদর্শন
লভিল নয়নে ও সংবিতে:
ধাতুবিনির্মিত যুগল মূর্তি যে
ধরায় অমরার আলোক বিতরিছে,
দেউল-বেদিকায়
কুসুম-সজ্জায়
স্ফুরিছে বিদ্যুৎ-ঝলকনে।
চিরন্তন আর
চিরন্তনিকার
দীপন লভিলাম লীলায়নে।
শ্যামলসুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৪)

ধন্য-শিল্পী সে,
যুগলে আছে মিশে
শিল্প রচনার সাধনাতে।
তন্ময়তা তার
কোরেছে অধিকার
দুজনে কতদিনে কতরাতে?
গঠিত সুন্দরে শ্যামল সুন্দর,
মূরতি মনোহরে মুরলীমনোহর।

পরশি' তব পাণি
র'য়েছে রাধারাণী
পরমাসুন্দরী সুগঠনে।
আমি সে শিল্পীরে
স্মরিনু নতশিরে
যুগল মিলনের লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৫)

শ্যামল বিভাধর
স্নিগ্ধ দিবাকর,
যদি না দর্শন দিতে মোরে;
আমার অজাগরী
জীবন-বিভাবরী
হ'ত না জাগ্রত কোনো ভোরে।
মোর ভোরের পাখি জাগিয়া মেলি' আঁখি
ডাকিয়া উঠিত না গানে তোমারে ডাকি।
আমার ফুলগুলি
ধুলায় হ'ত ধূলি
নর্ত্ত্য তপনের প্রদাহনে।
আজি সে ফুলরাজি
তুলিয়া আনিয়াছি
তোমারি কিরণের লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৬)

দিয়েছ দর্শন
দিয়েছ প্রস্বন
আমার চেতনার মুরলীতে,
তাই তো মোর প্রাণ
লভিল অভিযান
মোহন কীর্তন-সঙ্গীতে।
শ্যামল যাদুকর, গৌরী যাদুকরী,
বেণুতে মনোহর, নূপুরে মনোহরী,
আমার কথা যত
গোপ-গোপীর মত
নিত্য নব সুরে-নর্তনে
হইয়া তন্ময়
দোঁহারে সাথি লয়
লিখিল মর্মের লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

দ্বিতীয় পালা

(দেবাদর্শনের পর স্মৃতিচারণে জীবনকাহিনী)

(১)

অখিলে আবরণ
আনে বিদায়-ক্ষণ,
সাঁঝের ছায়া আসে ঘনাইয়া!
ভবন-দেবতারে
সঁপিয়া যা'ব কারে
ভাবিয়া ক্রন্দন করে হিয়া।
এমনি গৃহী আমি, গৃহিণী নাই যার;

ছিল না আগ্রহ বিবাহ করিবার,
ছাত্র-জীবনের
পরে সংসারের
পেষণচক্রের ঘর্ষণে
ছিলাম অবিরত
অবক্ষয়গত।
নিয়েছ তবু তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে।।

(২)

জীবন সন্ধ্যাতে
মিলিব তব সাথে
করিনি কোনদিন কল্পনা
এ যে অচিন্তিত
এ যে গো অভাবিত,
এ যেন কাঙালের হাতে সোনা!
মরণ-ক্ষণী যবে গরলতায় ল'বে,
তখনি লভিলাম অমৃত-বৈভবে,
করিয়া সুধাপান
জাগে আবার গান
আমার প্রার্থনা নিবেদনে,
কাল-জলধি-কূলে
পলকে নিলে তুলে
যমুনাকূলে তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে।।

(৩)

হে গৃহ-বিগ্রহ,
নিয়তি নিগ্রহ
আমারে রাখে নাই গৃহবাসে।
তোমারে রাখি' দূরে
ঘুরেছি ঘুরে ঘুরে
অসার বাসনার শত কাজে ;
তব পূজার বেলা করেছি অবহেলা
তোমার লীলা ভুলে খেলেছি ভব-খেলা ;
ভবনে হে আমার
অর্চ্য-অবতার।
তোমারে সাধি নাই অর্চনে ;
তবু যে তুমি মোরে
রাখনি মোহঘোরে,
এনেছ তবু তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(৪)

আমি যে কিছুদিন
করিয়া কিছু ঋণ
কর্মক্রান্তির অবসরে
বজায় রাখি' ঠাট
কোরেছি পূজাপাঠ
বঙ্গদেশে মোর নিজ-ঘরে।
সেদিন বুঝি নাই, এখন বুঝিয়াছি :
নিয়মশৃঙ্খলে তোমারে পূজিয়াছি ;
পালন করি' ব্রত
ছিলাম অবিগত
গতানুগতিকের বন্ধনে।

সে ভব-বন্ধন
করিয়া খণ্ডন
রেখেছো মোরে তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে।।

(৫)

আবার পথ ভুলে
তোমার প্রতিকূলে
ভাসিয়া পার্থিব মদিরাতে
অশুভ তারকার
ইশারা করি সার!
ব্যবসাবুদ্ধির বাসনাতে
কালের কামনার কালো বাজারে যাই,
যতই আলো দেখি তত আঁধার পাই;
লোভের ললনা যে
ছলনা করিয়াছে,
লাভের কামিনীর কাঞ্চনে
ক্ষতির গহ্বরে
ছিলাম। তুমি মোরে
তুলিয়া নিলে তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে।।

(৬)

পূর্ব-স্বজনের
দেব-মন্দিরের
নিত্য পূজাপাঠে যবে ছিলে,
আকুলতার দানে
তাদের অভিযানে
কত যে পার্বণ রচিলে।

হায় রে, সে যে শুধু সুদূরাতীত কথা,
স্বরণে হরষেও মানসে আনে ব্যথা।
সে-ব্যথা ঘুচাইলে
আমারে তুমি মিলে
সুচির মতসের রঞ্জনে,
আমার মনোরথ
হ'ল যে অনাহত
অন্তহীন তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

তৃতীয় পালা

(প্রবাসে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও বিগ্রহ দর্শনে দিব্যদর্শন লাভ)

(১)

একদা পরবাসে
আমি হতাশ্বাসে
বসিয়াছিনু যবে তরুতলে,
সুজন সন্ন্যাসী
আমার পাশে আসি'
সহানুভূতিমাখা সুরে বলে :
"মনে তো হয় তুমি বঙ্গবাসী ভাই,
রাধারাণীর দেশে প্রবাসী কেহ নাই।"
চমকি ভাবিনাম
এই কি ব্রজধাম,
আমি কি আসিয়াছি ব্রজবনে ?
সন্ন্যাসীর ঘরে
দিবা দ্বিপ্রহরে
তোমারে হেরি তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(২)

সে দিনই বৈকালে
তিনক দিয়ে তালে
সে বৈরাগী মোরে বলে, "মিতা,
আমি তোমায় করে
সঁপিনু প্রীতিভরে
মোর শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা,"
বাজায়ে খঞ্জনী গান গাহিয়া গুণী
কণ্ঠে ভাসাইল সুরের সুরধুনী ;
আমি যে তারি সুরে
তোমারি ব্রজপুরে
আপনহারা হয়ে তারি সনে
সাধিয়া অভিসার
শ্রীমতী রাধিকার
তোমারে সাধি তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীবনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(৩)

বন্ধুবরে বলি,
এবার তবে চলি ;
এমন দীপ্তির মহিমাতে
দেখিনি ব্রজরাজে
আমার গৃহমাঝে !
আমার আবেদন আজি রাতে
নিবাসে ফিরে গিয়ে মুরলীবনোহরে
আনিব ব্রজধামে প্রতিষ্ঠার তরে।
শুনিয়া সন্ন্যাসী
বলেন মৃদুহাসি'
"প্রতিষ্ঠার নব প্রসাধনে
সাজায়ে তুমি তারে
আনো শুক্রবারে
শুভক্ষণে তারি লীলায়নে।"

শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ।।

(৪)

সন্ন্যাসীর সেই
আশ্রমে তো নেই,
চ'লেছি বৃন্দাবনে পথ-'পরে
তবু সেখানে যাহা
দেখেছি, দেখি তাহা
এখানে সেইরূপে রূপ ধরে :
শ্যাম-তমালে ঘিরে স্বর্ণলতা রাই
কত সোহাগভরে জড়ায়ে আছে তাই,
রাই-কমল-বন
শ্যামল সরোবর
প্রেমের ঢেউ তোলে সমীরণে ।
যা-কিছু দেখি, তা যে
দোঁহারি রূপে রাজে
রূপের বেণু বাজে লীলায়নে ।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ।।

(৫)

গাড়িতে উঠি যবে,
ক্ষণিক অনুভবে
বাড়ি ছাড়ার কথা মনে পড়ে :
সংক্রামক রোগ
করিনু যবে ভোগ,
আত্মীয়ের দল মোর ঘরে
কেহই রহিল না ; কহিল কবিরাজ,
"হয়তো শেষরাতে ছাড়িবে নাড়ী আজ" !
তখন তব নাম
নীরবে জপিলাম,
রাখিলে তুমি মোরে অমরণে ;

সুস্থ হয়ে, তবু
তোমায় ভুলি, প্রভু!
তবু যে নিলে তব লীলাবনে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৬)
বৃন্দাবন ছাড়ি'
চলে কলের গাড়ি,
বৃন্দাবন, হেরি তারি মাঝে:
ব্রজ-কিশোর পাশে
ব্রজ-কিশোরী হাসে,
হাসির সুরে তব বাঁশী বাজে।
বঙ্গে বহরমপুরে আমার ঘর,
স্মৃতির মায়াবাসা সুদূরে সে নগর॥
প্রভাতে পাড়ি দিয়ে
পর দিবসে গিয়ে
পৌঁছলাম গৃহ-প্রাঙ্গণে;
ভবন হ'তে আনি,
তব মূরতিখানি
ভাবিনু যাব তব লীলাবনে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

চতুর্থ পালা

(নিজ নিবাসের প্রাঙ্গণে বিগ্রহ স্থানান্তরণের উৎসব, পরে শোভাযাত্রা সহকারে যন্ত্রযানে বৃন্দাবনে গমন এবং মূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন ধার্য্য করা।)

(১)

ইন্দ্রজাল ঘটি'
নিমেষে গেল রটি'
নিরুদ্দেশী দেশে আসিয়াছে।
হরেন বাবু কহে
"ঘরের বিগ্রহে
বাহিরে আন কেন তরাসাঁধে?"
কেহ বা পরিচিত, কেহ অপরিচিত,
সকলে মোরে হেরি' হ'য়েছে বিচলিত।
শুধাল সমরেশ
"হায়, হেমাঙ্গেশ!
ছিলে নিরুদ্দেশ কি কারণে?"
আমি সবারে বলি,
নাধবে নিয়ে চলি
বৃন্দাবনে—তারি লীলাবনে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(২)

প্রতিবেশীর দল—
করিয়া কোলাহল
অযথা কত কথা মোরে বলে;
কেহ উল্লসিত
কেহ অকুণ্ঠিত
কণ্ঠে উপদেশ দিয়ে চলে।
জ্যেষ্ঠতাত সম বৃদ্ধ মোরে ক'ন,
"যেথা কৃষ্ণ রহে সেথা বৃন্দাবন,
বৃন্দাবনমালী
করিছে চতুরালী
শোভিছে সে তোমারি গৃহকোণে।"

বলি, জ্যেঠামশাই,
আমি যে যেতে চাই
কৃষ্ণজীবনের লীলায়নে,
শ্যামল সুন্দর
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(৩)

দশনে দিয়া বিলি
কহিল কাদুপিসী
"কোথায় ছিলি তুই হতভাগা।"
কহে ঘোষাল দাদু,
"মুখ সামাল্ কাদু,
দিস্‌নে নাতিটার প্রাণে দাগা।"
তখন পাড়াতুতো দাদুরে পাড়ি' গাল,
বচন-ঝঙ্কারে ঝাড়ি' রাগের ঝাল
পিসি কাদম্বিনী
হইয়া বিজয়িনী
রক্ত লোচনের হুতাশনে
তারে জ্বালিতে চায়,—
আমি বলি তোমায়,
কখন যাব তব লীলায়নে ?
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(৪)

প্রবীণ পুরোহিত
পরশি' উপবীত
সরোষে মোর পানে চাহি কয়,
"দেব-পূজার প্রথা
করো না অনাথা,
শোনো আমার কথা মহাশয়।
স্থানান্তরণের ক্ষণ-নিরুৎসবে
রাখিলে তোমারি যে অমঙ্গল হবে।"

পাড়ার মাতুলানী
নাদুলী দিল আনি'
আমারি মঙ্গল-রক্ষণে
সকলে বলে কথা,
আমার নীরবতা
ভাবে, কখন যাব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলী মনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৫)
আমি সুগম্ভীরে
কহিনু ধীরে ধীরে,
হবে না পূজাবিধি লঙ্ঘন,
মুরলীমনোহরে
নিতে দেশান্তরে
হবে উৎসবের আয়োজন।
ব্যয় বহন তরে ঝাড়িয়া ঝোর ঝুলি
বন্ধুদের হাতে দিনু 'মুদ্রা'গুলি।
সবে সমস্বরে
হরিধ্বনি করে
সম্মিয়া নন্দের নন্দনে;
কুপিত পুরোহিতও
হইয়া পুলকিত
বলে, "আমিও যাব লীলায়নে।"
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৬)
উৎসবের ক্ষণ
হ'ল যে সমাপন
আশীর্বাণী ফুল নিয়ে হাতে,
তোমার মূরতিরে
বন্দিয়া নতশিরে

সবার সাথে শোভাযাত্রাতে
বৃন্দাবন পানে চলি যন্ত্রযানে,
সকলে ধর সুর কৃষ্ণলীলা গানে।
যারা মোদের সনে
যাবে না ব্রজবনে,
তারাও যোগ দিয়ে এ-মিলনে
রেলগাড়ির কোলে
গান গাহিয়া দোলে
যেন—তারাও চলে লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে।'

(৭)

গাড়িতে মনে পড়ে,
বাড়ির পূজাঘরে
প্রসাদ দিয়ে মোরে পিতামহী
বলিয়াছিল, "দাদু,
একদা এক সাধু
অর্চা-দেবতারে বুকে বহি'
আনিয়া, আমাদের পূর্বপুরুষেরে
বলিয়া গিয়াছেন, "করিও পূজা এঁরে,
বহুদিনের পর
মুরলীমনোহর
যাবেন ফিরে নিজ নিকেতনে।"
সাধুর সেই কথা
লভিছে সফলতা,
চ'লেছ তুমি তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৮)

যে-সন্ন্যাসী মোরে
বাঁধিল প্রীতিডোরে,
তাহার সাথে সেই সাধুজীর
বয়স ব্যবধানে
কত যুগাবসানে
কত যে ঢেউ কাল-জলধির
অকূলে মিশিয়াছে, তাহা স্মরণে আজি
অসীম বিস্ময়ে তব শরণ যাচি।
বুঝায়ে দাও মোরে,
তুমি কেমন কোরে
তোমার কালহারা বিচরণে
আমার ঘর হ'তে
একদিনের স্রোতে
তোমারে নিলে তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৯)

টুটিয়া দিল মোর
স্মৃতি স্বপন-ঘোর
উচচকণ্ঠের ধ্বনিধারা
কিনিয়া নিন্ ক'টি
সঞ্জীবনী বটী
জীবনে সুখভোগ চান যাঁরা ;
এই মহৌষধে অবলা মহাবলে
বলবানের দলে আনে চরণতলে ;
রাখুন সবে শুনে
এই বটীর গুণে
বৃদ্ধ ফিরে যায় যৌবনে।"
শুনিয়া তারে বলি,
আমরা সবে চলি
চিরযৌবনের লীলায়নে।

শ্যামল সুন্দর,
মুরলীবনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(১০)

থামে গাড়ির বাঁশি ;
বৃন্দাবনে আসি'
আমরা সবে হই উপনীত :
ভূমিতে নামিতেই
দেখিনু সমুখেই
সন্ন্যাসীর মুখ বিহসিত ;
তাহারে অনুসরি' তারি আশ্রমের
পানে সবাই চলি ব্রজের কাননের
পুণ্যধূলি পথে
ফুল্ল মনোরথে
তোমারে নিয়ে আনাদের সনে ;
মনের গতি আর
দেহের যাত্রার
গতি যে এল তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীবনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(১১)

সুহৃদ-বৈরাগী
মূরতি তব রাখি'
শ্রীরাধিকার পাশে ; মোরে বলে,
"রাস-পূর্ণিমার
নেই তো দেরী আর
সে দিন শশী যবে লীলাচলে
উদয় হবে, সেই লগনে মনোহরে
পালনে পূজাবিধি চিরকালের তরে
রাখিব এইখানে
রসের অভিযানে
রাসের উৎসবাবর্তনে।"

শুনিয়া তার কথা,
আমার আকুলতা
সুধায় ভাসে তব লীলাবনে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(১২)

আমার ভবনের
আঁধার কক্ষের
বিজনতায় আর তুমি নাই;
দেখি নয়নভরি
পরি নীলাম্বরী
পীতাম্বর-পাশে রাজে রাই:
শ্যামলকান্তের সাথে হেমাঙ্গিনী
জলদে বিজলীর মতন বিনোদিনী।
শ্যাম দিগন্তে কি
রাধিকাশশী দেখি
সান্ধ্য-আরতির স্থলগনে।
তুমি একাকী ছিলে,
যুগলে রূপ নিলে
স্বধামে ব্রজধামে, লীলাবনে।
শ্যামলসুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

পঞ্চম পালা

(কৃষ্ণলীলা)

(১)

হে দেব, কংসারি !
সুদর্শনধারী,
দ্বাপরে অবতারী লীলা তব
এ ঘোর কলিযুগে
আমার সম্মুখে
হ'ল যে অপরূপ, অভিনব।
তুলিলে অঙ্গুলে গিরি গোবর্ধন,
কালীয়নাগ শিরে করিলে নর্তন,
বধিলে পুতনারে ;
বরিলে যশোদারে
স্নেহের ভাণ্ডার লুণ্ঠনে,
যশোমতীর কোলে
সোহাগ হিন্দোলে
তোমারে দেখি তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(২)

যুগে যুগান্তরে
গগন প্রান্তরে
অন্তরালে রাখি' আপনারে,
চরাও হে রাখাল,
আলোর ধেনুপাল—
দুলাও রবিশশী তারকারে।
ধরণীতলে রাখি' তাহারি প্রতিভাস
বৃন্দাবনে তব পূরিল অভিলাষ
পাঁচনি নিয়ে হাতে,
গোপবালক সাথে
বাঁশরী বাজাইলে গোচারণে,

দেখাতে অনাবিল
তব গোপাললীলা
আমারে নিলে তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৩)

বেণুর ধ্বনি শুনে,
যশোদা সকরুণে
বলে "বলাই, তুই বল্ মোরে,
সূর্য বসে পাটে
ধবলী এল বাটে,
এখনো কেন কানু নাঠে মোরে?"
রঙ্গভরে বলে, কিশোর বলরাম,
"কানুর বেণু বাজে সাধিয়া রাধানাম।"
সে দিন সন্ধ্যাতে
প্রথম সাক্ষাতে
মিলিত হলে তুমি রাধা সনে;
যমুনা জলে তার
কলসী ভাসে আর
কিশোরী ভাসে তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৪)

তুমি কুসুম সম
কোমল, অনুপম,
বজ্রসম তবু সুকঠোর!
হে নীল ভাস্কর
আনি' যুগান্তর
তুমি যে কালনিশা করো ভোর।

কৌরবের রণ অধর্মের পথে,
সারথি হয়ে তাই পাণ্ডবের রথে
রাখিলে তাহাদের সমর-বিজয়ের
অমর আলোকের বিভাসনে।
হে রাজ-অধিরাজ,
সারথি-রূপে আজ
আমারে দিলে দেখা লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৫)

অতীতে অধুনাতে
মিলায়ে একসাথে
আমার অনাগতে অনবধি
নিখিল নারীনরে
আছ নারীশ্বরে
হয়েছ শ্যামরাধা, শিবসতী।
আমার বাস্তব-অবলোকনে আর
দিব্যদর্শনে কোরেছ একাকার,
তাই, যে দিকে চাই, দোঁহার দেখা পাই,
যুগলরূপ রাগ-রঞ্জনে
মোর নয়ন-মন
লভিয়া অঞ্জন
চাহিয়া রয় তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৬)

বোলেছ ভগবান,
তুমি পরিত্রাণ
করিতে ধরণীরে কালে-কালে
আসিয়াছিলে আর
আসিবে কতবার
বিলাতে তব বিভা ভব-ভালে।
"সম্ভবামি"-বাণী আজো যে শুনি তব,
তোমারি অবতার দেখায়ে নব-নব
জীবন হ'তে মোর
ঘুচায়ে তমঘোর
চেতন দিলে তুমি অচেতনে,
দয়াল হে ঠাকুর,
শুনায়ে তব সুর
আমারে নিলে তব লীলায়নে॥
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

ষষ্ঠ পালা

প্রাচীন যুগের অবতার বাণী

(১)

মৎস-কূর্মেও
নাই তো সন্দেহ,
বরাহরূপে হই তন্ময়!
অবিশ্বাসী রিপু
হিরণ্যকশিপু
নখরাঘাতে যা'র হত হয়,
নরসিংহ সে যে, কেশরশিখারাশি
দুলায়ে প্রহ্লাদে তুলিল উদ্ভাসি',
বালক ভক্তরে
রাখিল সমাদরে
আলোক-রসনায় আলেহনে;

সমুখে তাহা দেখি'
দেখেছি তোমারে কি
অনাদি-অতীতের লীলায়নে ?
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ।।

(২)

পাতালপুরে যা'র
সিংহাসন আর
সাম্রাজ্য যা'র ত্রিভুবন,
বিভব-গরিমায়
মানে না বিধাতায়,
দানের গতি যার অবারণ ;
ত্রিপাদ-ভূমি দান যাচি' তাহারি কাছে,
করিলে হতমান তুমি সে বলিরাজে
রাজসভায় তারি,
তুমি দর্পহারী ।
সে দর্পীর শির বিদলনে
বামন-অবতারে
দেখালে আপনারে
অতল পাতালের লীলায়নে ।
শ্যামল সুন্দর
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ।।

(৩)

নভিলে অম্বিকা
ক্ষত্রতেজশিখা-
নির্বাপণে হও সক্রিয়
হয়ে পরশুরাম
হও যে উদ্দাম,
বিশ্ব করো নিঃক্ষত্রিয় ;

সে অবতরণের রুদ্র-অভিযান
রামাবতারে আসি' করিলে অবসান
ধরি' হরিত তনু
ভাঙিয়া হরধনু;
নিজ-অঙ্গীকার লঙ্ঘনে
জানদগ্ন্য তার
করাল সে কুঠার
সঁপিয়া দিল তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৪)

খুলি প্রাচীন দ্বার
গুহা-অন্ধকার
প্রাচীর চিত্রের মাঝে আমি
নীরব বন্ধনে
জপিনু মনে মনে
'বুদ্ধ শরণং গচ্ছামি'।
দাক্ষিণাত্যের পথে যখন যাই,
মহা সন্ন্যাসীর পদচিহ্ন পাই!
হরি, তোমার হর
বুদ্ধ-শঙ্কর
বিকাশী-বিভারাশি বিতরণে
বিশ্ব-বন্দিত,
নিত্যনন্দিত
তোমারি সাথে তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৫)

পূর্ব-পর ভুলি'
চিরন্তনে দুলি'
স্বভাব সখী মোর রঙ্গিতা ;
যমুনা-জলে তাই
সরযূ নদী পাই,
কৃষ্ণরাধা হয় রামসীতা।
কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামের রথে ;
যাই শ্রাবস্তির শ্রমণসঙ্ঘেতে ;
দেব-শঙ্করের
মঠের শৃঙ্গের
ত্রিশূল দেখি আমি ত্রিভুবনে ;
তুমি বিশ্বপতি,
নিলে আমার গতি
বিশ্বময় তব লীলারনে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন লীনক্ষনে ॥

সপ্তম পালা

(আধুনিক যুগের অবতারমালা)

(১)

ভাগীরথীর কূলে
কে নাচে দুলে-দুলে !
কার প্রেমের নদী নদীয়ার
পথে তরঙ্গিল
প্লাবন আনি দিল,
রুধিতে পারে না কে গতি তার।

ফুকারে শচীমাতা "নিমাই আয় ফিরে"।
বিষ্ণুপ্রিয়া শুধু ভাসে নয়ননীরে!
নিতাই কার সাথে
নামানন্দে মাতে—
নর্তনের তালে কীর্তনে
জপিয়া হরে রাম,
হরেকৃষ্ণ-নাম
তব নবদ্বীপ-লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(২)

শ্রীচৈতন্য সে
প্রেমে অনন্য সে,
তোমারি অনুরাগী অবতার
অদ্বৈতবাদী
যবে তর্ক সাধি'
অচেত-বিদ্যার বাসনার
সোনার রথে চলে, করে দিগ্বিজয়,
সহসা হার মানে, চৈতন্য হয়
তাহারি-সন্ধাশে,
সৌর প্রজ্ঞা সে
প্রেমল-কৌমুদী প্রমিলনে;
জ্ঞানের সবিতায়
প্রেমের শশী ভায়
তারি বিভায় তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৩)

রামের-কৃষ্ণের
মিলিত বিভাসের
হরিত-নীল-বিভা একাধারে
ধরিল গঙ্গার
তীরে কে অবতার!
সারদা দেবী সাথে দেখি কারে?
মাটি ও মুদ্রায় সমতুলা গণি
জাহ্নবীর জলে ফেলিছে কোন্ ধনী!
জানে না রীতি-নীতি,
মানে না পূজা বিধি
নিশারে পদ্মে ও চন্দনে
কালী-কৃষ্ণ জপে
মহাসিদ্ধি লভে
দক্ষিণেশ্বর-লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৪)

শ্রীরামকৃষ্ণ সে,
ভোগে বিতৃষ্ণ সে—
কামিনী-কাঞ্চন পরিহরি;
নারীতে ভগবতী
হেরিয়া করে নতি;
সর্বধর্মের অধিকারী।
সে অদ্বিতীয়ের দ্বিতীয় অবতারে
বিবেকানন্দ সে দূর সিন্ধুপারে
ধর্মসভাতলে
সূর্যসম জ্বলে,
হিন্দু-কেশরীর গর্জনে
বিশ্বজয় করে;
সে-গুরুশিষ্যরে
অর্ঘ দীপি তব লীলায়নে।

শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(৫)

পূর্ণ হয় কলি!
বসুন্ধরা দলি'
অসুর অবতার চলে যবে,
ধ্রুব-যজ্ঞে বসি'
ধরি ধর্মঅসি
কে তারে দিল বাধা বিপ্লবে?
কারে বন্দী লভি' রুদ্ধ কারাগার
লভে মুক্তগতি স্বাধীন সম্ভার?
স্বদেশ-মুক্তির
সাধনে কোন্ বীর
অসীম মুক্তির যোগাসনে
লভিল তব বাণী?
স্বাগিলে কারে আনি'
সাগরপারে তব লীলায়নে?
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(৬)

শ্রীঅরবিন্দ সে,
তবে অচিন্ত্য সে,
দেহে রূপান্তর-সম্ভোগী!
স্থির, নির্বিকার
নবযুগাবতার,
নর-মহেশ্বর, মহাযোগী;
তাই মহেশ্বরী নারীর তনুরথে
জননীরূপে আসি' অহারি যোগপথে
মর্ত্যশিশুদলে
রূপান্তরি' চলে
বিষয়-বন্ধন-বিমোচনে।

আমি যে হেরিলাম
পণ্ডিচেরী-ধাম
নূতনতর তব লীলাবনে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৭)

মুরলীমনোহর,
শ্যামল সুন্দর,
মোরে না দর্শন দিতে যদি,
তবে তো অবতার-
মালার মণিহার-
অলঙ্কৃত এই বসুমতী
আমার আঁখি পথে স্বর্গলোকে পশি'
স্বর্গ হ'তে কভু হ'ত না গরীয়সী;
অমরাকাঙ্ক্ষিত
চরণচিহ্নিত
মর্ত্য ধরণীর অঙ্গনে
তাই তো শিরে তুলি
অমৃতময় ধূলি
তব চিরন্তন লীলাবনে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

অষ্টম পালা

(বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার রজনী, রাসপূর্ণিমা)

(১)

রজনীগন্ধার
কোরক দোলে আর
সন্ধ্যামালতীর কলি ফোটে ;
শ্যামলী দিগ্বালা
ধরে সোনার থালা
সোনালী মুখে শশী হেসে ওঠে।
লভিয়া অভিষেক কালিন্দীর নীরে
হ'লে প্রতিষ্ঠিত আপন মন্দিরে
রাধারাণীর পাশে
নূতন পীতবাসে ;
ললাটে চন্দন চর্চনে
দাঁড়ালে বসুধার
অর্চা-অবতার
অখিলবাঞ্ছিত লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(২)

দোলে দুনিবার
রাসপূর্ণিমার
জোয়ার যমুনার নীলজলে ;
স্রোতের আলো-ছায়া
রচে মোহন মায়া,
সুনীলে কাঞ্চনে ঝলমলে।
কোথাও সলিলের ঘূর্ণি দুলিয়াছে,
প্রেমিক নটবরে ঘিরিয়া যেন নাচে
সুখে সমুচ্ছল
ব্রজবধূর দল
ভুলিয়া গুরুজন-গঞ্জনে ;

কোথাও দুটি তীর
ভাঙিয়া, গোপিনীর
দু'কূল ভাঙে তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৩)

আজি এ মধুরাতি
লভিছে মধুভাতি
অসীম মাধুরীর শশীমুখে,
আজি নন্দপুর—
চন্দ্র চালে সুর
মুরলীমন্ত্রণে মহীবুকে।
মুরলীমন্ত্রণে কৌমুদীর ধারা
নিখিল-চরাচরে করে আপনহারা:
মোহন তানে তার
শৈলকান্তার
মগ্ন হয় যেন কী স্বপনে।
আমি সে-স্বপ্নের
মাঝে নিসর্গের
স্বর্গ লভি তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(৪)

হেরিয়া তার পাখা
তোমার শিরে রাখা,
পুলকে লভি' তব দর্শন
করিয়া কেকারব,
কলাপ বৈভব
বিথারি' করে শিখী নর্তন।
চন্দ্রালোকে অলি তন্দ্রাহত হয়,

হরিণ পথহারা, গোধন তন্দ্রায়
ব্রজের কাননের
রাতের ভ্রমরের
চাঁদের আলোমাখা গুঞ্জনে ;
শুনি' সে-গুঞ্জনি ;
নাচে নকুলফণী
তোমার চন্দ্রিত লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(৫)

প্রেমের নাটিকায়
রূপালি পর্দায়
রাসপূর্ণিমার ছবিগুলি
রূপসমুদ্রাসে
সমুখে যেন আসে,
মধুর হিল্লোলে ওঠে দুলি' !
কেহ বা মালা গাঁথে, কেহ করে স্তব,
কেহ বা প্রকাশিতে আপন অনুভব
করিয়া কথকতা
কহে কৃষ্ণকথা
বসিয়া নদীকূলে কুশাসনে ;
কেহ মনের সাধে
পায়ে নূপুর বাঁধে,
নাচিতে সাজে তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(৬)

পাপিয়া গায় গান
চকোরী তায় তান
মিলায়ে তারি সাথে গান করে ;

লভিয়া মধুনিশা
তারা মিটায় তৃষা,
সুধাকরের সুধা পান করে।
পূর্ণ-সুধাকর চাহি' তোমার পানে
লভিয়া কোন্ সুধা কৌমুদীর তানে
কুমুদিনীর দলে
অর্ঘ দিতে বলে;
কি গান প্রবাহিত সমীরণে
প্রেরণা দিতে আসে
আমার প্রশ্বাসে,
গাহিতে বলে তব লীলাগানে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে।।

(৭)

আমার অন্তরে
শুনি গভীর স্বরে
সন্ত-কবীরের দোঁহারতি;
প্রেমিকা মীরা কহে,
"অন্য কেহ নহে,
গোপাল গিরিধারী মোর পতি,
ব্যাখানে ভাগবত ঋষি বেদব্যাস;
গাহে বিদ্যাপতি, ভণে চণ্ডীদাস;
কবি জয়দেবের
গীতগোবিন্দের
পদাবলীর মধু ভুঞ্জনে
কত শতাব্দীর
প্রেমের প্রগতির
পথিক হই তব লীলায়নে
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীমনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে।।

(৮)

অদূরে উছলে
অবতারের দল
বিশাল হাসি সম বিথারিত
দিগ্‌বধূর মুখে
অপার্থিব সুখে !
পূর্ণশশী নভে সমুদিত !
রচিয়া মণ্ডল অষ্ট সখী নাচে
কেন্দ্রে তব সাথে শ্রীমতী রাধা রাজে ;
দেউল-চত্বরে
ভক্ত নাহি ধরে।
বাঁশী ও শঙ্খের প্রস্বনে
মেশে রতসরোল,
বাজিছে মহাখোল
মহোৎসবে তব লীলাঙ্গনে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীবনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে ॥

(৯)

মন্ত্র পড়ে আসি'
বন্ধু সন্ন্যাসী
দ্বৈতলীলাবাদে অনুরাগী ;
উচ্চারণে তার
অবাধ অধিকার
কণ্ঠে দেবভাষা ওঠে জাগি ;
পিতলঘন্টিকা বামপাণিতে তার
নৈশারতি সাথে বাজিছে অনিবার ;

তার দলিন করে
তানুখালি পরে
প্রদীপমালা মৃদু সমীরণে
দুলায়ে শিখারাজি
সমুজ্জ্বলে আজি
নিখিল-নিখিলার লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীবনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

(১০)

তব চরণ-রেখা
অলখে আছে লেখা
যমুনা-বাহিনীর বালুচরে;
আমার এ কাহিনী
রহিবে চিরদিনই
তেমনি অলখিত অক্ষরে।
পূর্ণিমায় আজি রাসের উৎসবে
আমি যা লভিলাম মর্ম-অনুভবে,
হে অন্তরযামী,
তাহা কি পারি আমি
রাখিতে লিখনের প্রকাশনে?
অপ্রকাশে মোর,
মোরে করি বিভোর
মিলায়ে রাখ তব লীলায়নে।
শ্যামল সুন্দর,
মুরলীবনোহর,
দিয়েছ দর্শন দীনজনে॥

Gram : Boxboard

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET,
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে

শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১-১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX Phone :

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

COMPLETE WORKS
OF
SRI AUROBINDO

Centenary Volumes

Rs. 1000.00
Rs. 750.00

SRI AUROBINDO ASHRAM PRESS

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্তিকা

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭২

শ্রীঅরবিন্দ মন্দির

বার্ত্তিকা

(২৪শে নভেম্বর, ১৯৭২)

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

শ্রীঅরবিন্দের জীবনধারা	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
সাবিত্রী	...
ঋগ্বেদ	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত
শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী	
মায়ের সঙ্গে কথা	শ্রীমা
পথের কথা	শ্রীমা
শ্রীঅরবিন্দের যোগ	সুধা বসু
যুগের সমস্যা শ্রীঅরবিন্দের সমাধান	রামেশ্বর শ'

বার্ত্তিকার নিয়মাবলী

২১শে ফেব্রুয়ারী, ২৪শে এপ্রিল, ১৫ই আগষ্ট এবং ২৪শে নভেম্বর প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৫ টাকা। বৎসরের যে-কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। চাঁদা ও চিঠিপত্র সম্পাদকীয় আপিসে কিংবা কলিকাতা শাখার ঠিকানায় প্রেরিতব্য। নূতন বৎসরের চাঁদা যথাসময়ে জমা না দিলে পত্রিকা ভি, পি, যোগে পাঠানো হয়।

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতি পৃষ্ঠা	১০০·০০	বার্ষিক	৩০০·০০
প্রতি অর্ধ পৃষ্ঠা	৬০·০০		২০০·০০
ভিতরের মলাট	১৫০·০০		৫২০·০০
বাহিরের মলাট	২০০·০০		৬০০·০০

শাখা :
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সম্পাদক :
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী

মূল্য দেড় টাকা

Edited by: **Nolini Kanta Gupta**
Published by: Sri Aurobindo Pathamandir
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta—12
Printed by: Amiyo Ranjan Ganguli
At Sri Aurobindo Ashram Press, Pondicherry—2

২৪শে নভেম্বর, ১৯৭২

যত রকম অভিরুচি, যত রকম সীমাবদ্ধ, সে সকলের ঊর্ধ্বে রয়েছে সম্মতির ক্ষেত্র, যেখানে সকলেরই স্থান রয়েছে, যেখানে ঘটে সকলের সমন্বয়—তা হ'ল ভাগবত-চেতনার অভিমুখে আস্পৃহা।

—শ্রীমা

শ্রীঅরবিন্দের জীবনধারা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

শ্রীঅরবিন্দের জীবনধারা অপরূপ—অসামান্য ও অভূতপূর্ব্ব। অন্যান্য দশজনের মত তা চিরাচরিত গতানুগতিক পথে চলে নাই। সাধারণ মানুষের জীবন চলে একটা নির্দ্দিষ্ট ধরাবাঁধা খাত ধরে, সকলেরই জীবন যেন একই ছাঁচে ঢালা, জীবনের ক্রমগতি ছন্দ লক্ষ্য একই প্রকারের। গোড়া থেকে পরিণাম একই রেখায় চলেছে, পূর্ব্বাপর অবস্থা আগে থেকেই নির্দ্দেশ করে দেওয়া যায়। "শৈশবেঽভ্যস্ত বিদ্যানাম্, যৌবনে বিষয়ৈষীণাম্"—কালিদাস রঘুদেব সম্বন্ধে যা বলেছেন আমরাও সেই ক্রম অনুসরণ করি (যদিও পরের দুটি নয়—পরের দুটি হ'ল বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি আর অন্তিমে যোগনিদ্রা)। আমরাও শৈশবে কৈশোরে স্কুলে কলেজে পাঠাভ্যাস করি, যৌবনের প্রারম্ভেই একটা বৃত্তি অবলম্বন করি, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপনা, সরকারী চাকরী—কেউ হয় বিত্তশালী, কেউ রয়ে যায় দুঃস্থ, তারই ভিতর দিয়ে আমরা জীবনযাপন করি যেন-তেন প্রকারেণ। ইতিমধ্যে বিবাহ, পুত্র-কন্যা, পৌত্র পৌত্রাদি লাভ এবং অন্তিমে মহাপ্রয়াণ। শ্রীঅরবিন্দের জীবনধারা সম্পূর্ণ অন্যধরণের, তাতে দেখা দিয়েছে ক্রমান্বয় আকস্মিক পরিবর্ত্তন, অভূতপূর্ব্ব দিক-পরিবর্ত্তন, তার ফলে অতীতের ধারা প্রায় মুছে যায়, দেখা দেয় জীবনের নূতন একটা প্রকৃতি ও ভঙ্গি; এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের আবার একটা বিশেষত্ব হ'ল এই যে প্রায়শঃই তা বাহির থেকে আরোপিত কিছু নয়, নিজের ইচ্ছাকৃত একটা সজ্ঞান নির্ব্বাচনের ফল।

অবশ্য সর্ব্বপ্রথম যে দিক্-পরিবর্ত্তন ঘটে তা হয়েছে তাঁর শৈশবকালে, এখানে বাহ্যতঃ তাঁর স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচনের কোন প্রশ্ন ওঠে না—তবুও নেপথ্যের আন্তরপুরুষের কথা রয়েছে। জীবনের প্রথম পদক্ষেপেই তাঁকে তাঁর পরিচিতকে, অতীতকে ঠেলে ফেলে দিয়ে একেবারে মুছে ফেলেই যেন চলে যেতে হ'ল দূরদূরান্তরে, সাত সাগরের পারে, অপরিচিত দেশে, অজানা লোকেদের মধ্যে। কথায় বার্ত্তায়, আকারে প্রকারে, আচার ব্যবহারে, শিক্ষায় দীক্ষায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন, প্রায় বিপরীত, বিদেশী এবং বিধর্ম্মী। আপন দেশের বলতে যা কিছু তাই এখন হয়ে উঠল অজানা অপরিচিত। এইভাবেই তাঁর জীবন কাটল চৌদ্দটি বৎসর। বিপরীত দিকের ভূ-খণ্ডের পরিচয় লাভে জ্ঞান অর্জ্জনে। তাঁর পিতৃদেবের আদেশ ও উদ্দেশ্যই ছিল এই রকমের, সম্পূর্ণ ইউরোপীয় মর্য্যাদা লাভ করে পুত্র যাতে দেশে ফিরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ করে; কারণ, সে যুগে বৃটিশের পূর্ণ রাজত্বকালে ভারতবাসীর পক্ষে সর্ব্বোত্তম শ্রেয় ও প্রেয় ছিল বৃটিশ শাসনের প্রধান অঙ্গ হওয়া, অর্থাৎ জেলার জজ বা

ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া। শ্রীঅরবিন্দের পিতা এবং আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা শ্রীঅরবিন্দের সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করতেন—তাঁর যা প্রতিভা তা নিশ্চয়ই তাঁকে জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পর্য্যন্ত পৌঁছে দেবে। কিন্তু এ মর্য্যাদা লাভ করতে হ'লে একটা বিশেষ পরীক্ষা দিতে হয়, অতি বিখ্যাত পরীক্ষা, ভারতবাসীর চক্ষে সেদিন তার মূল্য ছিল অপরিসীম—তার নাম দেবতাদের নামের মত পূজ্য ও স্মরণীয়—তিনটি অক্ষর তার—I. C. S. (Indian Civil Service)। শ্রীঅরবিন্দের আন্তর জীবনের পক্ষেও দেখা দিল এক পরীক্ষা—তিনি স্থির করলেন এ পরীক্ষা দেবেন না, কারণ এ পরীক্ষার অর্থ যে জীবন সে জীবন তিনি গ্রহণ করবেন না, ইংরেজদের দাসত্ব তিনি করবেন না, ইংরেজজাতির সেবা তিনি করবেন না। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের বন্ধুবর্গের বিশেষতঃ তাঁর পিতার পক্ষে এ হ'ল নির্ম্মম আঘাত কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি? নির্দ্দেশ এসেছে, পট পরিবর্ত্তন করতে হবে, ভিন্ন দিকে চলতে হবে।

এই হ'ল নূতন দিক-পরিবর্ত্তন, পুরাতন আবার মুছে গেল, শুরু হ'ল আর এক যাত্রা। তার ধর্ম্ম প্রকৃতি গতি লক্ষ্য অন্য ধরনের। আমরা জানি তিনি ভারতে ফিরে এসে বরোদা রাজ্যে কর্ম্মগ্রহণ করলেন। ইউরোপীয় সাজপোষাক, আচার ব্যবহার বিসর্জ্জন দিলেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার পরিবর্ত্তে আরম্ভ করলেন ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার অনুশীলন। বাহ্যতঃ তাঁর জীবন নামে বা কর্ম্মে খুব সমুজ্জ্বল হয়ে উঠল না—একরকমে তা হ'ল অজ্ঞাত অখ্যাত কর্ম্মচারী বা কেরাণীর জীবন। কিন্তু এ জীবন তিনি বেছে নিলেন, এই আত্মগোপনের জীবন, নিরালায় নেপথ্যে আত্মানুশীলনের জন্য। যে শিক্ষা যে বিদ্যা যে জ্ঞান ইউরোপীয় ধারায় চলে অসম্পূর্ণ ছিল তা সম্পূর্ণ করে চললেন। বাহ্যত তিনি ছিলেন মহারাজের সেক্রেটারী এবং স্থানীয় কলেজের শিক্ষক—এ ছিল শান্তির সহজ সাধারণ সাদাসিধা জীবন। এইভাবে চলল আবার চৌদ্দটি বৎসর। কিন্তু এ পর্য্যায়ের সীমা এল, কাল পূর্ণ হ'ল; তাঁকে আবার নূতন দিকে পদক্ষেপ করতে হবে, পুনরায় পট-পরিবর্ত্তন, অভিনব কর্ম্মক্ষেত্র—শান্তির পরিবর্ত্তে সংঘর্ষ, নিশ্চিতের পরিবর্ত্তে অনিশ্চিত, নেপথ্যের পরিবর্ত্তে প্রকাশ্য।

ভারতে প্রলয়ের যুগ আরম্ভ হয়েছে তখন। স্থিরপ্রতিষ্ঠ বৃটিশ সাম্রাজ্য আর নিবিষ্ন নয়, টলমল তা—ভারতবর্ষের দাবী হয়েছে ইংরেজমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা। শ্রীঅরবিন্দ ছুঁড়ে ফেলে দিলেন আর একবার অতীতের অভ্যস্ত জীবনধারা, ঝাঁপ দিলেন এই প্রলয়-পয়োধিজলে। দেশ-উদ্ধার ব্রতে কায়মনোবাক্যে নিজেকে নিযুক্ত করলেন, দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমুক্ত করতে হবে, মূল্য যাই হোক। মূল্য হ'ল অনিশ্চিত জীবন, উপার্জ্জন নাই, গৃহ নাই, আশ্রয়স্থান নাই, যাযাবরের জীবন; প্রবলপ্রতাপান্বিত বৃটিশরাজ যে কোন মুহূর্ত্তে ধরে বেঁধে কারাগারে পুরে দিতে পারে, গুলি করতে, ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে পর্য্যন্ত দিতে পারে। শ্রীঅরবিন্দ দেশের প্রাণে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন, মুক্তিকামী হয়ে উঠল নিপীড়িত দাসের জাতি। তাঁর কণ্ঠে তাঁর লেখনীতে যে বাণী ফুটে উঠল তাই শুনে কবিগুরু একদিন

বলেছিলেন 'বাণীমূর্ত্তি তুমি স্বদেশ-আত্মার'। কিন্তু কর্ম্মফল অব্যর্থ ভাবে এল। বৃটিশরাজ কর্ম্মক্ষেত্র হতে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে বেঁধে রাখল তাদের কারাগারের কুঠরিতে।

এইভাবেই এল শ্রীঅরবিন্দের জীবনধারায় আর এক বাঁক, আর এক দিক-পরিবর্ত্তন। বাহিরের কর্ম্মজীবন স্তব্ধ হয়ে গেল, তিনি প্রবেশ করলেন অন্তরের জীবনে; যে আন্তর-সিদ্ধি একদিন সমস্ত জগতের জন্য নিয়ে আসবে অন্তরের ও বাহিরের অভিনব পূর্ণ সিদ্ধি, তারই সূত্রপাত বৃটিশ কারাগৃহের অভ্যন্তরে। এই আন্তর অভিযান অতি বিচিত্র তাঁর, তার যৎকিঞ্চিৎ আমাদের কাছে প্রকাশ করে গিয়েছেন। এই আন্তরসিদ্ধির গোড়াপত্তন করলেন একটা দিব্যাসন প্রতিষ্ঠা গড়ে দিয়ে।

কারাগৃহে আর একটি সঙ্কট, বিষম সঙ্কটেরই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তবে এখানেও শ্রীঅরবিন্দের দিব্যদৃষ্টি বা দিব্যশক্তি তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। আমাদের মধ্যে কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ মিলে একটা গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হলেন, একটা অভিনব বিষম কর্ম্মকাণ্ড। সে যুগে আমাদের এই দলটি ছিল সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহী বিপ্লবী যুবসঙ্ঘ, যারা কার্য্যতঃ চেয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রাম এবং বাহুবলে তার উৎপাটন ও উচ্ছেদসাধন। সুতরাং তাদের করতলগত হয়ে নিঃসহায় বন্দী হয়ে, আমাদের সিদ্ধান্ত হ'ল যে আমাদের লীলার এই শেষ—আমাদের এখন শুধু গুলি করে ফেলা হবে আর না হয় চিরজীবনের জন্য কালাপানির পারে যেতে হবে। এই পরিণতি কখনও স্বীকার করা যায় না, তাই আমাদের নেতারা প্রস্তাব করলেন যে জেল ভেঙ্গে আমরা বেরিয়ে পড়ব—বরং এদিকে অন্যরকমের একটা সম্ভাবনা থাকতে পারে। তোড়জোড় চলতে লাগল জেলের ভিতরে এবং বাহিরে। বাইরে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকবে একদল, আমরাও ভিতর থেকে অস্ত্রশস্ত্রের সহায়ে ভেঙ্গেচুরে বের হয়ে পড়ব—মুক্ত অবকাশে, মাঠে ঘাটে। তবে কিছু করবার আগে শ্রীঅরবিন্দকে বলা প্রয়োজন, তাঁর আদেশ বা সম্মতি ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। সুতরাং একজন প্রতিনিধি গিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে এই প্রস্তাবের কথা জানাল। শ্রীঅরবিন্দ কোন দ্বিধা না করে সরাসরি বলে দিলেন, "না, আমি ওর মধ্যে নেই। আমি এই বিচারের শেষ পর্য্যন্ত দেখব, বিচারের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করব।" ফল কি হবে তা তিনি জানতেন, তবুও আমাদের মধ্যে সন্দেহের অনিশ্চয়তার অবকাশ ছিল। এই প্রসঙ্গে এখানে একটা কৌতুককর ঘটনা উল্লেখ করতে পারি। আমরা যখন জেলের কুঠুরিতে আবদ্ধ তখন আমাদের উপর নজর রাখতে মোতায়েন করা হয়েছিল দু-একজন ইউরোপীয়ান সান্ত্রীকে—তার মধ্যে একটি ছিল বোধহয় স্কচ। সে একদিন শ্রীঅরবিন্দের সেলের সামনে এসে রহস্য করে বললে "Abrindo must now be brooding over his good old Cambridge days." কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে সে আবার বললে "Abrindo, you are caught at last, you are caught at last." শ্রীঅরবিন্দ এবারে মুখোমুখি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়ে বসলেন রহস্যছলে—"And yet I will escape, and yet I will escape." পলায়নের এই

প্রস্তাবটি শ্রীঅরবিন্দ যে নাকচ করে দিলেন সরাসরি, তাতে একটা দারুণ দুর্যোগই কেটে গেল। সে দিক দিয়ে গেলে ঘটে যেত একটা বিপুল হত্যাকাণ্ড, একটি প্রাণও হয়ত রক্ষা পেত না। জীবনধারার এই একটা বামাগতি রুদ্ধ করে দিয়ে তিনি মুক্ত করে রাখলেন ভবিষ্যৎসিদ্ধির পথ, বাঁচিয়ে রাখলেন আপনার আরও সঙ্গীদের ভবিষ্যতের জীবন।

তিনি জেল থেকে মুক্ত হয়ে বাইরের জগতে ফিরে এলেন, কিন্তু তখন তাঁর দৃষ্টি ও কর্ম্ম-পদ্ধতির ধরণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে। রাজনীতির মধ্যে, দেশসেবার মধ্যে এসে গিয়েছে একটা আর এক জগতের নীতি আর এক ধরণের সেবাদর্শ। বাহ্যতঃ কিছুদিন চলল পরিচিত কর্ম্মধারা, দুটি পত্রিকা তিনি সম্পাদন করতেন, তাদের পৃষ্ঠা পূরণের ভার প্রায় সমস্তই একা তাঁর উপর ছিল—লোকেদের সঙ্গে দেখাশুনাও করতে হত; নির্দ্দেশ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে সকল রকম সংযোগ রাখতে হত, সাধারণের মধ্যে গিয়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়েও ভাষণাদি দিতে হ'ত—এ সকলই তিনি করতেন তবে নূতন প্রেরণায়, অভিনব নির্দ্দেশে।

কিন্তু একদিন আবার এল একেবারেই আকস্মিকভাবে, অপ্রত্যাশিতভাবে—একদিন অর্থাৎ এক সন্ধ্যায়—তাঁর দু'চারজন সঙ্গীদের নিয়ে বসে ছিলেন হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন "চল, আমি চলে যাচ্ছি।" দুইজন সঙ্গীকে নিয়ে তিনি উধাও হয়ে গেলেন, কর্ম্মাবলি যেমন ছিল, কর্ম্মীরাও যে যেখানে ছিল সব তেমনি রেখে তিনি প্রশান্তবদনে স্থির লক্ষ্যে ডুব দিলেন।

বেশ কিছু পরে জানা গেল যে তিনি পণ্ডিচেরীতে গিয়ে পৌঁছেছেন চন্দননগর হয়ে। তোমরা জান পণ্ডিচেরীর জীবন—শ্রীঅরবিন্দের জীবনের একটা নূতন অধ্যায় শুধু নয়, সম্পূর্ণ নূতন জীবনই। বাহ্যজীবনের ধরণ-ধারণও বদলে গেল। তিনি আর দেশপ্রেমিক এমন কি বিশ্বপ্রেমিক অরবিন্দ ঘোষ নন, তিনি হলেন ভগবৎপ্রেমিক শ্রীঅরবিন্দ। যাঁর কাজ এখন নূতন জগতের নূতন মানুষের গঠন বা সৃষ্টি। সকল কর্ম্মের, সকল প্রয়াসের, সকল আকাঙ্ক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে এই অভিযান, একটা অনন্যগতি ঋজু আরোহণ।

তবে এখানেও আবহাওয়া নির্ব্বিঘ্ন ছিল না, পথও সহজ সরল ছিল না। ফরাসী রাজত্বে হ'লেও শ্রীঅরবিন্দের এখানে অবস্থান বৃটিশের প্রীতিকর ছিলনা। ইংরেজেরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত, অনুভব করত যে সকল নষ্টের গোড়া হ'ল এই মানুষটি। এই মানুষটি কাছে কিনারায় যেখানেই থাকুক না, তাদের বিপদ ঘটাবে। ছলে-বলে কৌশলে অনেকবার চেষ্টা করেছে তারা তাঁকে এখান থেকে সরাবার জন্য, তাঁর স্থিরাসন নষ্ট করবার জন্য বা টলিয়ে দেবার জন্য। সেদিনে বৃটিশে আর ফরাসীতে ছিল মিতালি (entente cordiale); তাই ফরাসী সরকার থেকে একটি প্রস্তাব এল যে শ্রীঅরবিন্দের জন্য তারা একটি সুরম্যস্থান নির্ব্বাচিত করেছে—সেখানে থাকবে তাঁর নিজস্ব গৃহ, সম্পূর্ণ

নিজস্ব বিধি-ব্যবস্থা, স্বাধীনভাবে তিনি নিজের জীবন যাপন করতে পারবেন, নির্বিঘ্নে অনুসরণ করতে পারবেন তাঁর বিদ্যাচর্চা হোক্ আর যোগসাধনা হোক্ যথারুচি—শ্রীমা যেখানে বেশ কিছুদিন ছিলেন এককালে—উত্তর আফ্রিকায়, Algeria দেশে। শ্রীঅরবিন্দের কাছে যখন এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হ'ল এ ক্ষেত্রেও তিনি বিনা দ্বিধায় তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "অসম্ভব। আমি এখানে আছি, এখানেই থাকব।" সকলেই বিস্মিত স্তম্ভিত ক্ষুব্ধ পর্য্যন্ত। শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গীদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন নেতৃস্থানীয় দেশসেবক, বিপ্লবী কর্ম্মী। তাঁরা বিমূঢ় হলেন, ক্ষুণ্ণও হলেন। তাঁদের আশা ছিল ইচ্ছা ছিল বৃটিশদের নিত্যনৈমিত্তিক উৎপীড়নের অপ্রিয় হস্ত হতে উদ্ধারের এই হবে একমাত্র পন্থা। আজ আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি শ্রীঅরবিন্দ যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন একদিন, সুদূর অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে, তার অর্থ কি ছিল, সার্থকতা কি ছিল।

তারপরে এল একটা নিদারুণ সঙ্কট, যেখানে নির্দ্দিষ্ট হবে শ্রীঅরবিন্দের নিজের ভবিষ্যৎ জীবন, মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়তি। আমরা বলছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির কথা। একটা অপশক্তি সদলবলে নেমে আসছিল পৃথিবীর উপরে মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করতে, পৃথিবীর নিয়তি ব্যর্থ করতে। মানুষের ক্রমোন্নতি আর হবে না, দেবত্ব দূরের কথা, মানুষ মানুষও থাকবে না, হয়ে থাকবে পশু পিশাচ। অপশক্তিরা তাদের নিরঙ্কুশ রাজত্ব স্থাপন করবে এই ভূমণ্ডলে। শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন এ ভয়াবহ নিয়তি এবং যে বিপুল অপশক্তি সবেগে বীরবিক্রমে নেমে আসছিল পৃথিবীকে মানুষকে লক্ষ্য করে, তিনি তাকে ধারণ করলেন তাঁর অপৌরুষেয় আধারের মধ্যে, তাকে বিণ্ণ করবার জন্য ব্যর্থ করবার জন্য—নীলকণ্ঠের মত ধারণ করলেন এই হলাহল দেবতারা যাতে অমৃতের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে। অপশক্তির এই অভিযান সরে গেল তাঁর দেহে ক্ষতচিহ্ন রেখে, কিন্তু পৃথিবীর মানুষ বেঁচে গেল নবজীবনের জন্য।

এখন তাহ'লে শেষ অঙ্কের কথা বলি—সর্ব্বশেষ সঙ্কট অন্তিম পটপরিবর্ত্তন। শ্রীঅরবিন্দ দেখলেন, স্থূল জড়ের শরীর তাঁর যতখানি কর্ম্ম দিতে পারে তা সে দিয়েছে, তাঁর লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য আরও যে কর্ম্ম প্রয়োজন তার জন্য এই দেহধারণের আর আবশ্যকতা নাই। বরং দেহাতিরিক্ত হয়ে সেই কর্ম্ম আরও সুষ্ঠুতরভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হবে। তাই তিনি অপসৃত হ'লেন স্থূল বাহ্যান্তর হতে কিন্তু নেপথ্যে রইলেন আরও জাগ্রত আরও শক্তিময়।

শ্রীঅরবিন্দের জীবনধারার প্রকৃতি আমরা দেখলাম, তা হ'ল যেন কয়েকটি আমূল দিক্-পরিবর্ত্তনের পরম্পরা। এক একটি দিক্-পরিবর্ত্তন তার অতীতকে এক রকম মুছে দিয়েছে, একটা নূতন রকমের ধর্ম্ম এনে দিয়েছে। এই পরিবর্ত্তন পারম্পর্য্য ক্রমেই এগিয়ে চলেছে, স্ফুট হতে স্ফুটতর পরমসিদ্ধির দিকে যা হল মানুষী জগতের সম্পূর্ণ পরবর্ত্তন বা রূপান্তর। এই যে আকস্মিক এবং আমূল পরিবর্ত্তন তার একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে Intervention—অনুপ্রবেশ বা অভ্যাগমন বা সংক্রমণ। শ্রীমা এ বিষয়টি আমাদের

কাছে অনেক ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমানের পরিচিত পরিস্থিতি যখন চলেছে একই রূপে জাগতিক গতানুগতিক ধারায়, তখন তার মধ্যে কখনও কখনও নেমে আসে নূতন একটা প্রেরণা, চেতনা বা শক্তি, ঊর্দ্ধের আর কোনও স্তর হ'তে। এই অপ্রত্যাশিতের আগমনে পরিচিত হয়ে যায় অপরিচিত অর্থাৎ পায় নূতন আকার ও প্রকার। মানুষের ব্যক্তিগত ক্রমোন্নতি, জগতের সমষ্টিগত প্রগতিও নির্ভর করে ঠিক এই ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধশক্তির আবির্ভাব বা আগমনের উপর। নতুবা মানুষ-জগৎ চিরকাল থেকে যায় একই অবস্থায় স্থাবরের মত, মানুষ হয়ে পড়ে গাছপাথরের মত নতুবা রোমন্থনকারী পশুর মত।

এই যে ঊর্দ্ধশক্তির অবতরণ এবং জগতের মধ্যে মানুষের মধ্যে অনুপ্রবেশ তার উৎস যত ঊর্দ্ধে ততই তার ক্রিয়া আমূল পরিবর্ত্তনের দিকে, যতখানি তা ধ্বংসকারী অর্থাৎ অতীতের পক্ষে, ততখানি সে নবসৃষ্টিক্ষম, ভবিষ্যতের পক্ষে।

আমরা বলেছি শ্রীঅরবিন্দের যে শেষ অপসরণ তা হল একটা নবশক্তির অনুপ্রবেশ, পৃথিবীর পক্ষে একটা নব দ্বারোদ্‌ঘাটন। কিন্তু এই দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যু শুধু নয়, তাঁর জন্মও একটা নবশক্তির আবির্ভাব, পৃথিবীর মানুষের স্থূল দেহে একটা দিব্য-চেতনার অনুপ্রবেশ। তা ঘটেছে সৃষ্টির প্রয়োজনে, সময় হয়েছে বলে। যে বিধিলিপি পূরণ করবার জন্য এই মহাজন্ম তার ক্রিয়া উত্তরোত্তর ক্রমপরিণতির দিকে অব্যর্থ ভাবে চলেছে। আমরা সেই শতবার্ষিকীর অংশীদার হয়েছি, এই যে শতবার্ষিকী আর এক অভিনব অভূতপূর্ব্ব দিব্যতর শতবার্ষিকীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছে।

সাবিত্রী

দ্বিতীয় পর্ব্ব—নবম সর্গ

(২)

আত্মার মন্ত্রবলে অকস্মাৎ আবিষ্ট হয়ে,
দিব্য প্রাণাবেগের রসায়নে জারিত হয়ে,
বেদনা বাধ্য হয়ে আপনাকে পরিণত করে
আপনার শক্তিধর আনন্দে ;
ঘুচে যায় স্বর্গ-নরকের বৈপরীত্য।
জীবনের সমুচ্চ দর্শন যত মূর্ত্তি ধরে এখানে,
ভ্রাম্যমান আশা যত তার করে সিদ্ধিলাভ,
সোনালী মধুচক্র যেন
লগ্ন এখন মধুপায়ীর প্রলম্বিত জিহ্বাগ্রে ;
প্রজ্বলন্ত অনুমান তার সব আনন্দাপ্লুত সত্যে পরিণত এখন,
বিপুল তার বক্ষস্পন্দন স্তব্ধ নৃত্যহীন প্রশান্তির মাঝে,
মুক্ত এখন যত তার বাসনার স্তূপ।
পূর্ণ-সিদ্ধ হৃদয়ের আর ইন্দ্রিয়ের সেই স্বর্গরাজ্যে,
নিভৃতম কোন সুর ভাঙে না সেই তার
প্রদীপ্ত অক্ষত মধুরিমার অন্তহীন সম্মোহন ;
পদক্ষেপ তার সদা যথাস্থানে সুনিশ্চিত অন্তর্জ্ঞানে।
অন্তরাত্মা সুদীর্ঘ সংঘর্ষের বেদনা পার হয়ে
অবশেষে লভেছে প্রশান্তি আর স্বর্গের বিশ্রাম ;
শোকহীন কালক্রমের যাদুকর প্লাবনে
এই যোদ্ধৃর আধারে ক্ষতপূর্ণ অঙ্গ যত হয়েছে নিরাময়,
মাতৃক শক্তিরাজির বাহুপাশ আলিঙ্গনে
কলঙ্কের স্থান নাই যেখানে, ভয় নাই যাদের আপন আনন্দে।
দৃশ্যাবলী যত নিমিষ আমাদের বিবর্ণ ইন্দ্রিয়ের কাছে,
নিমিষ অলৌকিক সুরভি আর অপরূপ বর্ণাবলী—
তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ করে সে এমন রূপ
দৃষ্টিকে যা দিব্য করে তোলে,

এমন সঙ্গীত মনকে যা অমর করে ধরে,
হৃদয়কে অনন্তের মত প্রসারিত করে দেয় ;
শ্রবণে ধরে সে সেই অশ্রুত
ছন্দযত জাগিয়ে তোলে যারা নিভৃত শ্রবণকে,
অনির্ব্বাচ্য শুব্ধতা হতে নেমে আসে যারা,
শব্দশূন্য বাক্যের সৌন্দর্য্যে শিহরিত সে,
সঙ্গে আসে চিন্তা সব মহান গভীর, লভে না কণ্ঠ যারা—
তাদেরি বাসনা-প্রবেগ বিশ্বের এনে দেয় নবরূপ।
ইন্দ্রিয়েরা উঠে চলে সোপান বেয়ে অগ্নিময় পদভরে
অকল্পনীয় সুখভোগের তুঙ্গ শিখরে যত,
পুলকজ্যোতি নূতন করে গড়ে দেয় তার
আধারের সূক্ষ্ম আবেষ্টন,
দেহ তার দীপ্তি ছড়ায় আকাশের ঝিনুক যেন,
জগতে প্রবেশ-তোরণ তার ধুয়ে যায় আলোকের সাগরে।
পৃথিবী তার স্বর্গের সামর্থ্যে ভরপুর,
ধারণ করে শক্তি এমন—প্রয়োজন নাই আর
মনের দেহের রুদ্ধ সীমানা শুল্ক-মূল্য দিয়ে অতিক্রম করবার,
কিম্বা মানুষের মধ্যে দেবত্বকে চোরাপথে পার করে দেবার।
পশ্চাদ্‌পদ নয় সে আর সেই পরম ধাবী হতে
চায় যে পূর্ণানন্দের শ্রান্তিহীন সামর্থ্য
আর শক্তি এক চলে যেতে পারে যে আপন আনন্ত্যের অভিযানে,
সৌন্দর্য্যের চিন্তাবেগের অভিমুখে, অতলের প্রত্যুত্তর পানে ;
সুখসার একান্নতার মধ্যে নয় ভীতিকর নয় আর,
অন্য আর আত্মা আন্তর রভসে যুক্ত সেখানে,
রূপের আর অরূপের কলহ ঘুচে গিয়েছে।
দৃষ্টি হতে ধ্বনি হতে গ্রহণ করে সে অধ্যাত্মশক্তি,
ইন্দ্রিয় হয়ে ওঠে অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিবার পথ :
পুলকে শিহরে সে লোকাতীত যত প্রভাবের স্পর্শে
গড়ে তোলে যারা জীবনের গভীরতর মূল সত্তা।
পার্থিব প্রকৃতি দেখা দেয় নবজন্ম লয়ে স্বর্গের সহচর হয়ে
কালাতীত রাজন্যদের যোগ্য সঙ্গী সে এখন,
সূর্য্যমণ্ডলস্থ জীবন্ত দেবতাদের সঙ্গে সমান আসন,
অজাত সত্তাদের জ্যোতির্ম্ময় লীলায় অংশীদার হয়েছে,

শোনে সে চির-অদৃশ্য লীলাময়ের অস্ফুট বাণী,
শোনে সেই কণ্ঠ হৃদয়কে মুগ্ধ ক'রে
নিয়ে যায় বুকভরা ভাগবত বাসনার কাছে,
অনুভব করে সে, তারই মহানন্দের মধুরস
প্রবাহিত তার আপন ধমনীর ভিতরে
স্বর্গের স্রোতস্বিনী যেন.
দেহ হয়ে ওঠে পরাৎপরের অমৃত ভৃঙ্গার।
কখনও বা অকস্মাৎ বহ্নিশিখা এক উদ্ভাসিত করে ধরে সব
আবেগের সাড়ায় অর্দ্ধ অনাবৃত হয় সব যখন
উত্তীর্ণ হয় সে অজ্ঞাত মহাপুলকের সীমানায়,
ত্রস্ত হৃদয় তার লভে অপ্রত্যাশিত এক পরম স্পর্শ
স্মৃতিতলে জাগে পরমসুন্দরের আলিঙ্গন;
শুভ্র রভস হতে বেগে নেমে আসে ইঙ্গিত সব।
শাশ্বত দাঁড়াল নিকটে এসে প্রণয়ের ছদ্মবেশ ধরে
মহাকালের দেহের পরে রাখিল তার মধুহস্ত।
বৃহৎ বিপুল হতে নেমে আসে যৎসামান্য দান এক
কিন্তু জীবনের কাছে হয় তা অপরিমেয় আনন্দলাভ—
অমেয় সমগ্র অপর পায় প্রতিবিম্বিত সেখানে।
অজ্ঞেয় মহানন্দের বিরাট বিস্ফু এক
অভিভূত করে তার অঙ্গ সব আর তার অন্তরাত্মাকে ঘিরে হয়ে ওঠে
পুলকের অগ্নিময় মহাসাগর
ডুবে গেল তলিয়ে গেল সে মধুময় প্রজ্বলন্ত বিরাটের মধ্যে:
নিদারুণ আনন্দ এক বিদীর্ণ করে যে মর্ত্য তনু
যে পুলক দেবতারা পোষণ করে, বহন করে সে এখন।
অমৃতের সুখসাগর পরিশুদ্ধ করে তারে তরঙ্গ-অভিষেকে,
তার সামর্থ্যকে পরিণত করে মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিরূপে।
অমরতা অধিকার করে কালধারাকে, অমরতাই বহন করে জীবনকে।

———

ঋগ্বেদ

ঋষি অত্রির অগ্নিমন্ত্র

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

৫ম মণ্ডল—৮ম সূক্ত

ত্বামগ্ন ঋতায়বঃ সমীধিরে প্রত্নং প্রত্নাস ঊতয়ে সহস্কৃত।
পুরুশ্চন্দ্রং যজতং বিশ্বধায়সং দমূনসং গৃহপতিং বরেণ্যং ॥১॥

ত্বাম্—তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি
ঋতায়বঃ=ঋত যবঃ—সত্যসন্ধানীরা
সম্-ঈধিরে—সমিদ্ধ করেছে
প্রত্নম্—প্রাচীন (তোমাকে)
প্রত্নাসঃ—প্রাচীনেরা
ঊতয়ে—রক্ষার জন্য, অভিবৃদ্ধির জন্য
সহস্কৃত=সহঃ কৃত—বলের সৃষ্ট, বলদ্বারা সৃষ্ট
পুরুঃ+চন্দ্রম্—বহুল আনন্দময়
যজতম্—যজ্ঞকারীরা, যজ্ঞকৃত
বিশ্বধায়সম্—বিশ্বপ্রতিষ্ঠাতা
দমূনসম্—গৃহনিবাসী
গৃহপতিম্—গৃহপতি
বরেণ্যম্—বরণীয়, বরেণ্য

তোমাকে, হে অগ্নি, সত্য-সন্ধিৎসুরা প্রজ্বলিত করেছে, প্রাচীন তুমি, তারাও প্রাচীন, তাদের অভিবৃদ্ধির জন্য। বল তোমাকে সৃষ্টি করেছে, তুমি বহুল আনন্দময়, তুমিই যজ্ঞ করে চলেছ, বিশ্বকে প্রতিষ্ঠা করেছ, গৃহে নিবাস তোমার গৃহপতি হয়ে, বরেণ্য তুমি ॥১॥

ত্বামগ্নে অতিথিং পূর্ব্যং বিশঃ শোচিষ্কেশং গৃহপতিং নিষেদিরে।
বৃহৎকেতুং পুরুরূপং ধনস্পৃতং সুশর্ম্মাণং স্ববসং জরদ্বিষম্ ॥২॥

ত্বাম্—তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি
অতিথিম্—অতিথি (তোমাকে)
পূর্ব্যম্—আদিকালের, সনাতন
বিশঃ—মানুষেরা
শোচিঃ-কেশম্—জ্যোতির্ময় কেশ (তোমার)
গৃহপতিম্—গৃহপতি
নি—অন্তরে
সেদিরে—স্থাপন করেছে
বৃহৎ-কেতুম্—বৃহৎ জ্ঞানদৃষ্টি, বৃহৎ প্রজ্ঞা
পুরু-রূপম্—বহুল রূপ
ধন-স্পৃতম্—সম্পদের সংগ্রাহক
সু-শর্ম্মাণম্—পরম শান্তিময়
সু-অবসম্—সংরক্ষক
জরৎ-বিষম্—শত্রু সংহারক

হে অগ্নি, অনাদি অতিথি তুমি, জ্যোতি তোমার কেশভার, মানুষেরা তোমাকে গৃহপতি করে তাদের অন্তরে স্থাপিত করেছে। বৃহতের প্রজ্ঞান তোমার, রূপ তোমার বহুল, সম্পদ তুমি আহরণ কর, পূর্ণ শান্তিময় তুমি, পরম রক্ষক, শত্রুর নিহন্তা ॥২॥

ত্বামগ্নে মানুষীরীড়তে বিশো হোত্রাবিদং বিবিচিং রত্নধাতমম্।
গুহা সন্তং সুভগ বিশ্বদর্শতং তুবিস্বণসং সুযজং ঘৃতশ্রিয়ম্ ॥৩॥

ত্বাম্—তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি
মানুষীঃ—মানুষী
ঈড়তে—আরাধনা করে
বিশঃ—লোকেরা
হোত্রাবিদম্—আহুতিবিদ্, আহুতির জ্ঞান আছে যার তাকে
বিবিচিম্—সত্যবিবেচক
রত্নধাতমম্—আনন্দের পরম প্রতিষ্ঠাতা
গুহা—গুহার মধ্যে
সন্তম্—সর্বদা বর্তমান
সুভগ—হে পরম ভোক্তা
বিশ্ব-দর্শতম্—বিশ্বদ্রষ্টা
তুবি-স্বনসম্ = তুবিঃ—প্রভূত, বহুল
স্বনসম্—ধ্বনিময়
সু-যজম্—সুষ্ঠু যাজক, সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞক্রিয়া করে যে
ঘৃতশ্রিয়ম্—শুভশ্রী

হে অগ্নি, মানুষীজনেরা তোমাকে আরাধনা করে, আহুতির জ্ঞান তোমার, সম্যক বিবেচনা তোমার, আনন্দের পরম প্রতিষ্ঠাতা তুমি, তুমি রয়েছ গুহার অন্তরে, সকল ভোগ তোমার, বিশ্বদ্রষ্টা তুমি, কণ্ঠে তোমার বহুল ধ্বনি, শুভ শ্রীময় তুমি ॥৩॥

ত্বামগ্নে ধর্ণসিং বিশ্বধা বয়ং গীর্ভির্গৃণন্তো নমসোপ সেদিম।
স নো জুষস্ব সমিধানো অঙ্গিরো দেবো মর্ত্যস্য যশসা সুদীতিভিঃ ॥৪॥

ত্বাম্—তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি
ধর্ণসিং—সর্বধারক
বিশ্বধা—সর্বপ্রকারে
বয়ম্—আমরা
গীর্ভি—বাক্যের সহায়ে
গৃণন্তঃ—প্রকাশ করি
নমসা—প্রণতির সহায়ে
উপ+সেদিম—তোমার নিকটে আসন নিয়েছি
সঃ—সেই তুমি
নঃ—আমাদের
জুষস্ব—গ্রহণ কর, সঙ্গে সংযুক্ত থাক
সম্ ইধানঃ = সমিধান—সমিদ্ধ তুমি
অঙ্গিরঃ—হে অঙ্গিরা
দেবঃ—দেবতা তুমি
মর্ত্যস্য—মর্ত্যজনের
যশসা—মহিমার সহায়ে
সুদীতিভিঃ—প্রদীপ্ত শিখা সহ

হে অগ্নি, বিশ্বধারায় বিশ্বের ধারয়িতা তুমি, আমাদের বাক্যের সহায়ে তোমাকে আমরা প্রকাশ করি, প্রণতির সহায়ে তোমার সমীপে উপবেশন করি; সেই তুমি অঙ্গিরা নামে দেবতা, আমাদিকে গ্রহণ কর; তুমি মর্ত্যজনের শুভ্র মহিমা দিয়ে আর প্রজ্বলিত শিখারাজির সহায়ে সমিদ্ধ হয়ে চলেছ ॥৪॥

ত্বমগ্নে পুরুরূপো বিশেবিশে বয়ো দধাসি প্রয়থা পুরুষ্টুত।
পুরূণ্যন্নো সহসা বি রাজসি দ্বিষি: সা তে তিগ্মিষাণস্য নাধৃষে ॥৫॥

ত্বম্—তুমি	পুরূণি—বহুবিধ
অগ্নে—হে অগ্নি	অন্না—অন্ন
পুরুরূপ:—বহুরূপী	সহসা—তোমার বলের আশ্রয়ে
বিশে-বিশে—জনে জনে, মানুষে মানুষে	বি-রাজসি—আলোকিত কর, আলোকে ভরে দাও
বয়:—বৃহৎ প্রকাশ, বৃহৎ বৃদ্ধি	দ্বিষি:—দীপ্তি
দধাসি—স্থাপন করেছ	সা—সেই তে—তোমার
প্রয় থা—যেমন চিরকাল	তিগ্মিষাণস্য—দীপ্যমান, প্রদীপ্ত (তোমার)
পুরু-স্তুত—বহুল প্রতিষ্ঠিত তুমি	ন আধৃষে—কেউ ধর্ষণ করে না

হে অগ্নি, জনে জনে তোমার নানা রূপ, চিরকালের মত তুমি আমাদের বৃদ্ধি বিধান কর, বহুলভাবে স্থাপিত তুমি, আপন বলে তুমি বহুল অন্ন তোমার আলোকে পূর্ণ করে অধিষ্ঠিত, তুমি যখন দীপ্যমান, তোমার সেই দীপ্তি কেউ ধর্ষণ করে না ॥৫॥

ত্বামগ্নে সমিধানং যবিষ্ঠ্য দেবা দূতং চক্রিরে হব্যবাহনম্।
উরুজ্রয়সং ঘৃতযোনিমাহুতং স্বেষং চক্ষুর্দধিরে চোদয়ন্মতি ॥৬॥

ত্বাম্—তোমাকে	উরু-জ্রয়সম্—বিশাল তোমার গতিবেগ
অগ্নে—হে অগ্নি	ঘৃত যোনিম্—শুভ্র ধারায় জন্ম তোমার
সম্-ইধানম্=সমিধানম্—সমিদ্ধ করে	আহুতম্—আহুতির গ্রাহক তুমি
যবিষ্ঠ্য—যুবতম তুমি	স্বেষম্—তেজোময়
দেবা:—দেবতারা	চক্ষু:—চক্ষুরূপে
দূতম্—দূত	দধিরে—তোমাকে স্থাপন করেছে
চক্রিরে—করেছে	চোদয়ৎ-মতি—সুমতিকে প্রচালিত করে
হব্য-বাহনম্—হব্যবাহক তুমি	

তোমাকে, হে অগ্নি, যুবতম দেবতারা প্রজ্বলিত করেছে, হব্যবাহক দূতরূপে সৃষ্টি করেছে, বিশাল তোমার গতিবেগ, জন্ম তোমার শুভ্রতার স্রোতে, আহুতি তুমি গ্রহণ কর, তোমাকে স্থাপন করেছে তেজোময় চক্ষুরূপে সুমতি প্রচালনার জন্য ॥৬॥

ত্বামগ্নে প্রদিব আহুতং ঘৃতৈঃ সুম্নায়বঃ সুষমিধা সমীধিরে।
স বাবৃধান ওষধীভিরুক্ষিতোঽভি দ্যুমাংসি পার্থিবা বি তিষ্ঠসে ॥৭॥

ত্বান্—তোমাকে
অগ্নে—হে অগ্নি
প্রদিবঃ—স্বর্গ অভিমুখে
আহুতম্—তোমাকে আহুতি দেওয়া হয়েছে
ঘৃতৈঃ—স্বচ্ছতার ধারার সহায়ে
সুম্ন-যবঃ—সুখ যাদের কাম্য
সু-সমিধা—সম্যক ইন্ধন সহায়ে
সম্+ঈধিরে—সমিদ্ধ করে
সঃ—সে, সেই অগ্নি
ববৃধান—বৃদ্ধিলাভ করে
ওষধীভিঃ—ওষধীদের সহায়ে, উষ্ণতাধারক উপাদানদের সহায়ে
উক্ষিতঃ (অভি)—অভিষিক্ত হয়ে
অভি—সর্বতঃ, সর্ব দিক থেকে
দ্যুমাংসি—যাবতীয় গতিবেগ
পার্থিবা—পার্থিব
বি-তিষ্ঠসে—ব্যাপক হয়ে অধিষ্ঠান কর

হে অগ্নি, স্বর্গকে লক্ষ্য করে শুভ্রতার ধারায় তোমাকে আহুতি দিয়েছে, সুখের অন্বেষু সকলে সম্যক তোমাকে সমিদ্ধ করেছে সুষ্ঠু ইন্ধনের সহায়ে। সে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে উষ্ণতার ধারাসমূহের অভিসিঞ্চনে, তুমি পৃথিবীর যাবতীয় গতিবেগের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করে ধরেছ ॥৭॥

———

শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাকণা ও চুম্বকবাণী

(Thoughts and Aphorisms)

(নামের ব্যাখ্যা সহ)

২৫৫—কোনো তত্ত্বের সমর্থনে যতক্ষণ একটি আত্মাও শ্রদ্ধা বিশ্বাসে অটল থাকবে ততক্ষণ সে তত্ত্বের ধ্বংস হতে পারেনা।

২৫৬—তোমার যুক্তিতে তুমি বলবে যে তেমন শ্রদ্ধাবিশ্বাস টেঁকেনা। মূর্খ! যুক্তির দ্বারা যদি কিছু টিঁকতো তাহলে কেউ তোমাকে বিশ্বাস করতে বলতনা।

২৫৭—হৃদয়ে বিশ্বাস হলো ভিতরকার প্রচ্ছন্ন জ্ঞানের ম্লান ও প্রয়াশ বিকৃত প্রতিচ্ছবি।

বিশ্বাসী যে হয় সে অবিশ্বাসীর চেয়েও বেশি সন্দিগ্ধ হয়। সে বিশ্বাস করে আপন অবচেতনে প্রচ্ছন্ন জ্ঞানেরই জোরে। তার সেই অন্ধবিশ্বাস ও ধিকিধিকি জ্বলে ওঠা সন্দেহের ভিতর দিয়ে সেই ভিতরকার জ্ঞানই তাকে সুস্পষ্ট উপলব্ধির দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।

প্রশ্ন : না, যুক্তিশূন্য একটা "অন্ধবিশ্বাস" থাকা কি ভালো?

না লোকে যাকে অন্ধবিশ্বাস বলে তা এমন জিনিস যা স্বল্পবুদ্ধি ও সল্পজ্ঞানী লোকদের মধ্যে জন্মায় ভগবৎ কৃপাতে। অবশ্য সত্য জ্ঞানের স্থান তার চেয়ে উচেচ, তথাপি অন্ধবিশ্বাসও শ্রদ্ধার যোগ্য। ২৯-১২-১৯৬৯

প্রশ্ন : না, বিশ্বাস কোন স্তরের জিনিস—মনের না চৈত্যের?

উত্তর : পুরোপুরি তা চৈত্যেরই জিনিস। ৩০-১২-১৯৬৯

২৫৮—জগৎ ভাবে যে সে বুদ্ধিরই আলোতে চলে, কিন্তু সে চলে বিশ্বাস ও প্রবৃত্তির দ্বারা।

২৫৯—বিশ্বাস ও প্রবৃত্তি যে কথা বলে, বুদ্ধি তাকেই আপন যুক্তি দিয়ে মানিয়ে নেয়; তার জন্য সে প্রেরণা পায় অবচেতন থেকে, তাই ভাবে যে বুঝি বুদ্ধির জোরেই সব কিছু হচ্ছে।

২৬০—যুক্তির কাজ হলো ভিতরকার ধারণা ও বোধকে গুছিয়ে গাছিয়ে দাঁড় করানো। তাতে কোনো সাব্যস্ত করা বা আদেশ দেওয়া হয়না। যখন তেমনই সে তান করে তখন সে আপন মূল উৎপত্তিকে ঢেকে দেয়।

২৬১—যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রজ্ঞান না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত যুক্তিবুদ্ধিকেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ও তোমার বিশ্বাস ও প্রেরণার উদ্দেশ্য সাধনে লাগাও। ঐ সকল স্বাভাবিক বৃত্তিকে পরস্পরের বিরোধিতা করতে দিয়ে কি লাভ আছে?

প্রশ্ন: মা, সাধারণ ও আধ্যাত্মিক জীবনে বুদ্ধি বিশ্বাস ও প্রবৃত্তির শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য কি হবে?

উত্তর: সাধারণ জীবনে প্রত্যেকের প্রকৃতি ও লক্ষ্য অনুসারে তা বিভিন্ন। আর আধ্যাত্মিক জীবনে থাকে একটাই লক্ষ্য: যে কোনো উপায়ে ও বিশ্বাসের জোরে ভগবানকে জানা, তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়া; বিশ্বাস সেখানে গোড়া থেকেই সব চেয়ে বড়ো প্রবর্তক। ৩১-১২-১৯৬৯

২৬২—কেবল বুদ্ধিওয়ালা মস্তিষ্কের দ্বারাই নয়, কিন্তু আপন অনুভবের দীপ্ত আলোতে সব কিছু লক্ষ্য করবে এবং ক্রিয়া করবে। মস্তিষ্ক যখন ভগবানের কথা বুঝতে পারেনা তখন তাঁর কথা তিনি হৃদয়কে বলেন।

২৬৩—হৃদয় যখন বলবে অমুক সময়ে অমুক উপায়ে এই জিনিস হবে, তখন তার সে কথা বিশ্বাস কোরোনা। কিন্তু যখন সে ভগবানের শুদ্ধ ও উদার আদেশের কথা বলবে তখন সেটা শুনবে।

২৬৪—আদেশ পেলে তখন তা পালন করতে চেষ্টা করবে। তারপর যেমন তাঁর ইচ্ছা তাই হবে, লোকে থাকে বলে তোমার সুযোগ ও সুবিধা ও সৌভাগ্য।

মা: অবশ্য নীরব মনেই ভগবানের আদেশ মেলে, সকল বাক্য ও চিন্তার উপরে তা জানা যায়। যখন আসে তখন তা সুস্পষ্ট আদেশ বলেই জানতে পারো, পরে তাকে বাক্যে রূপান্তরিত ক'রে নিতে পারো। ১-১-১৯৭০

২৬৫—যদি তোমার লক্ষ্য হয় বড়ো আর উপায় থাকে সামান্য, তথাপি তাই নিয়েই কাজ শুরু করো; কাজেরই ভিতর দিয়ে তোমার উপায় বেড়ে যাবে।

২৬৬—সময় ও সাফল্যের দিকে চেয়ো না। তোমার যা করবার তা ক'রে যেতে থাকো, তা সার্থকই হোক অথবা ব্যর্থই হোক।

২৬৭—আদেশ আসতে পারে তিন রকমভাবে—তোমার ইচ্ছা ও বিশ্বাসের ভিতর দিয়ে, হৃদয় ও মস্তিষ্কের আদর্শের ভিতর দিয়ে, আর স্বয়ং তাঁর বা তাঁর দূতের কণ্ঠস্বরে।

২৬৮—সময় আসে যখন কিছু করা অনুচিত বা অসম্ভব ; তখন নির্জনে তপস্যা করো কিংবা আত্মার নিভৃতে অপেক্ষা ক'রে থাকো ভগবানের বাক্য কিংবা প্রকাশের জন্য।

২৬৯—কোনো কণ্ঠস্বর শুনেই লাফিয়ে উঠোনা, কারণ মিথ্যার শক্তিরা তোমাকে ঠকাবার জন্য প্রস্তুত থাকে, কাজেই আগে হৃদয়কে বিশুদ্ধ রেখে তার পরে শুনবে।

মা : সকল কণ্ঠস্বরকেই ভগবানের বলে না মনে করা বিশেষ দরকার, কারণ প্রবঞ্চকের দেওয়া আদেশও তাতে থাকতে পারে। নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে, এমন কি ভগবৎসেবার ইচ্ছাকেও ছেড়ে তখন নীরব থাকা চাই। তবেই সঠিক বিচারণা আসবে।
৩-১-১৯৭০

২৭০—সময় আসে যখন ভগবান অতীতকে মানেন ; যা ছিল আর যা আছে তার উপর চেপে বসে বলেন "আমি থাকলাম"। তখন তোমার অধ্যবসায় চাই, যদি জগৎ-প্রভুর বিরুদ্ধেও লড়তে হয়। কারণ এটি হলো তাঁর মোক্ষম পরীক্ষা।

২৭১—মানুষের দিক থেকে কোনো প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও তা ফুরিয়ে যায় না। কিন্তু আত্মা যদি প্রচেষ্টা ছেড়ে দেয় তখন তা ফুরিয়ে যায়।

মা : অর্থাৎ তিনি এই কথা বলছেন যে বাইরের চোহারাতে না ভুলে তোমার প্রচেষ্টা তুমি চালিয়ে যাও, এমন কি যদি দেখ কোনো ফল হচ্ছেনা তবুও।

জীবনে যা করণীয় বলে প্রকাশ পাবে তা তুমি ক'রে যাবে, অন্য লোকে বিদ্রূপ বা বারণ করলেও। কারণ অন্য লোকের মতামতের কোনো দাম নেই, কেবল ভগবানের ইচ্ছাই সত্য এবং তারই জয় হবে।
৪-১-১৯৭০

—শ্রীমা

মায়ের সঙ্গে কথা

(প্রশ্নোত্তর)

২৫ নভেম্বর, ১৯৫৩

প্রশ্ন আপনি "কথাবার্তাতে বলেছেন "ভগবানের উপর আমাদের যেমন আস্থা সেই অনুপাতেই ভগবৎ কৃপা আমাদের সাহায্যে কাজ করতে পারে।" কিন্তু কারো যদি তেমন আস্থা না থাকলেও বিপদে পড়ে তখন সে ভগবানকে ডাকে, তার বেলাতে কি হবে?

উত্তর : কেন সে ডাকতে যাবে? দুটো যে বিপরীত কথা হলো। যার কোনো আস্থা নেই সে ভগবানের কথা কখনো ভাববে না বা তাঁকে ডাকবে না। আস্থা থাকলে তবেই সে ডাকে।...তাহলে?

প্রশ্ন আপনি বলেছেন, "শত্রুর সামনে হাসলে তাকে নিরস্ত্র করা হয়।" এখানে "হাসির" অর্থ কি? সামনে শত্রুকে দেখে কারো তো হাসা উচিত নয়।

উত্তর উচিত নয়?...আমি ওটা বলেছি সাধারণ ভাবে, অভিজ্ঞতার কথা। কেউ যদি খুব মারাত্মক অনিষ্টের মতলব নিয়ে আসে আর তুমি তাকে দেখে স্মিতমুখে হাসতে থাকো, তাহলে সে আর তোমার কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। তবে সেতোর হাসি হাসলে হবে না, তা আন্তরিক জিনিস হওয়া চাই (হাস্য)। আমি হাসি বলেছি তার পুরো-পুরি অর্থে। অর্থাৎ তুমি তখন আত্মসংযত হয়ে এমন উচ্চ চেতনাতে থাকবে যে, সাধারণ চেতনাতে যাকে ভয়ংকর মনে হয় তাকেই তুমি দেখছ ছেলেখেলার মতো, তাই হাসছ। যদি তেমন উচ্চ চেতনাতে থেকে তুমি সব কিছুতেই হাসতে পারো (কারণ সব কিছুরই হেতু থেকে তুমি বুঝবে যে কিরূপ শক্তি সেখানে ক্রিয়া করছে) তাহলে সব কিছুই তখন পাল্টে যাবে। তাই সে হাসি তখন বাহ্য জিনিস বা লৌকিক হাসি নয়, সে হাসি হবে চৈত্যসত্তার হাসি।

প্রশ্ন : ভগবানকে না ডাকলে কি তিনি কোনো সাহায্য করেন না?

উত্তর কথাটা ঠিক ওরকম নয়।...ভগবৎ চেতনা সর্বদা সর্বত্র একই ভাবে কাজ করছে। ভগবৎ কৃপা সব অবস্থাতেই সমানে ক্রিয়াশীল। কিন্তু তুমি তোমার ব্যক্তিগত দিক থেকে এমন অবস্থা তৈরি করো যাতে তুমি তা গ্রহণ করতে পারো অথবা নাও পারো। এবং তোমার যে আস্থা ও বিশ্বাস তার প্রতি—সত্যের প্রতি, কৃপার প্রতি, তাঁর প্রজ্ঞার প্রতি—তাতেই তোমার মধ্যে এমন একটা গ্রহিষ্ণুতা এনে দেয় যে তখন তুমি

গ্রহণ করতে পারো। কিন্তু যদি তেমন আস্থা না থাকে আর তবু তুমি কিছু পেতে চাও—যেমন কেউ কেউ আস্ফালন ক'রে বলে "আচ্ছা দেখা যাক, আমার এই অনিবার্য অবস্থার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব হলেও যদি দেখি ভগবান আমাকে ওর থেকে বাঁচিয়ে দিলেন তাহলে তখন তাঁকে ঠিক বিশ্বাস করব।" অবশ্য মুখে না বললেও মনে মনে অনেকে এই রকম ভেবে থাকে। এটি সব চেয়ে খারাপ জিনিস, শ্রদ্ধা বিশ্বাসের ঠিক বিপরীত। যেন হীন ধরনের লেনদেনের কথা "এটা যদি তুমি ক'রে দাও তবে তোমাকে বিশ্বাস করব, জানবো যে তুমি সত্যি আছো। এই কাজে সফল হলে তখন তোমার পরে আস্থা আসবে।" অনেকে এমন ক'রে থাকে। অনেকে বলে "আমার এই সুখবিহীন দুর্ভাগা জীবনে কেমন ক'রে বলি যে ভগবান আছে?" অর্থাৎ তারা নিজেরই ব্যক্তিগত চাহিদার দিক থেকে ভগবানকে দেখে।

প্রশ্ন আর যদি আস্থা থাকে তাহলে কি আপনা হতেই সাহায্য মেলে?

উত্তর এমন কি কণামাত্র আন্তরিকতা থাকলেও মেলে। কেউ যদি যথার্থই আন্তরিকভাবে ভগবানকে ডাকে (সেই সঙ্গে যেন সে ভিতরে ভিতরে না বলে, "দেখা যাক এতে ফল হয় কি না"—সেটা খাঁটি জিনিস হয়না), আর যদি আন্তরিক ভাবেই তাঁর সাড়া পেতে চায়, তাহলে তাকে অপেক্ষা করতে হয়, সে সাড়া ঠিক আসবেই। আর যদি মনকে নীরব রেখে শান্ত হয়ে থাকো তাহলে দেখতে পাবে কেমন ভাবে সাহায্য আসছে।

প্রশ্ন না, দেবতারা কোথা হতে আসেন?

উত্তর: ও কথার মানে কি? কোথা হতে তারা জন্মালো? সব কিছুই এসেছে সেই এক আদি পরাৎপর থেকে, দেবতারাও তাই।

এ বিষয়ে একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে, ছেলেদের কাছে গল্প বলার মতো সেটা বলছি, তাহলে বুঝতে পারবে।

ভগবান একদিন চাইলেন নিজেকে বাইরে অভিব্যক্ত করতে, যাতে নিজেকেই বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রকাশিত দেখে আনন্দ পান। তাই তিনি প্রথমে তাঁর মূল চেতনাকে বাইরে প্রক্ষেপ করলেন (অভিব্যক্ত করলেন) যার শক্তিতে বিশ্বের সৃষ্টি হয়। সেই চেতনা থেকে গোড়াতে চারটি প্রধান প্রধান ব্যক্তিসত্তা গড়ে উঠল—তারা হলো প্রেমসত্তা (বা আনন্দ-সত্তা), প্রাণসত্তা, আর আলো এবং জ্ঞানসত্তা, এবং সত্যসত্তা। এঁদের তখন অসীম শক্তি, কারণ বুঝতেই পারো, এরাই প্রথম ভগবৎ বিভূতি। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই আপন ক্ষমতা পেয়ে মদগর্বে গর্বিত হয়ে ভুলে গেল যে তারা ভগবানের অংশ মাত্র, বিভূতি মাত্র। তাইতে অনেক কিছু ব্যাপার ঘটল: যে আলোকসত্তা বা জ্ঞানসত্তা সে মূল থেকে পৃথক বোধ করে ভাবলে যে সেই বুঝি মূল দিব্যচেতনা, সে ছাড়া কোনো কিছু নেই, এই বিপরীত ভাব নিয়ে থাকতে থাকতে সে অন্ধকার নিশ্চেতনার মধ্যে ডুবে গেল। প্রাণসত্তা ভাবলে যে সে ছাড়া

বুঝি আর কিছু নেই, সে অন্য কারো দাস নয়, এই বিপরীত ভাব নিয়ে তার পরিণতি হলো মৃত্যুতে। সত্যসত্তা ভাবলে যে সে ছাড়া আর কোন সত্য নেই, এই থেকে সে মিথ্যায় পরিণত হলো। আনন্দসত্তা (প্রেম) ভাবলে যে সেই হলো পরমানন্দ, সে ছাড়া আনন্দ নেই, তাই সে ঐ বিপরীত ভাব থেকে দুঃখে নিরানন্দে পরিণত হলো। এমনি ক'রে যে সৃষ্টি সুন্দর হবার কথা তা হয়ে উঠল কুৎসিত। অতঃপর ভগবানের সেই সৃষ্টিচেতনা (তাকে তোমরা জগন্মাতা বলতে পারো) যখন দেখলেন যে কাজটা ভালো হলোনা, তখন ভগবানের কাছে সাহায্য চেয়ে তিনি বললেন, "এই তো ব্যাপার দাঁড়িয়েছে, এখন কি করা যাবে?" ভগবান বললেন, "আবার নতুন কাজ শুরু করো, কিন্তু এবার যাদের গড়বে তারা যেন অমন স্বাধিকার-প্রমত্ত হয়ে না ওঠে, তারা যেন তোমার সংস্পর্শে আমার বশ হয়ে থাকে।" তখন জগন্মাতা সৃষ্টি করলেন দেবতাদের, তারা নম্র ও বাধ্য হয়ে থেকে জগৎ গড়ে তুললে। তখন কিন্তু আগেকার সেই বিভূতিদের সঙ্গে এই দেবতাদের লড়াই বেধে গেল, তাই জগৎ হয়ে দাঁড়াল যুদ্ধক্ষেত্র, এখানে দুঃখ কষ্ট তমিস্রা প্রভৃতি প্রকট হয়ে উঠল। যারা আগে জন্মেছিল তারা তখন এখানে চেপে বসেছে, তারাই এখানে বিশৃঙ্খলার ব্যাপার ঘটাচ্ছে, আর দেবতাদের কেবল সেই সব অশুভ জিনিসগুলোর সংশোধন করতে হচ্ছে। এইভাবে দেবতারা এলেন। এঁরা হলেন দ্বিতীয় বিভূতি।

প্রশ্ন : মা, ঐ চারজনের যে অমন পরিবর্তন হলো, তা কি দৈবাৎ না ইচ্ছাকৃত?

উত্তর : না, দৈবাৎ হবে কেন? গল্পের মধ্যেই বলা আছে যে ভগবান তখন চেয়েছিলেন মুক্ত স্বাধীনসত্তার সৃষ্টি, যারা তাঁর থেকে বেরিয়েছে তারা আপন খুশিতে তাঁর সঙ্গে মিলে থাকবে, আপনা হতেই বশ্যতার সঙ্গে কাজ করবে, জগৎ হবে মুক্ত জগৎ। সেই নিয়মে তোমরাও প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্তে স্বাধীন, যে যেমন ইচ্ছা চলতে পারো, ভালো ইচ্ছায় চলো তো ভালো হবে, মন্দ ইচ্ছা করলে মন্দ হবে। এখনও সেইরকম হচ্ছে।

কিন্তু এ গল্প উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবেও বোঝা যায় আবার ছেলেদের গল্পের মতোও বোঝা যায়। যদি রূপক ছেড়ে গভীর প্রতীকের অর্থে তলিয়ে দেখ তাহলে এর প্রকৃত মর্ম বুঝবে আর ভিতরকার রহস্যও জানতে পারবে।

প্রবাদে বলে যে এমন "দৈবাৎ" হয়ে গেছে, এর চেয়ে অন্য রকমও হতে পারতো। কিন্তু হয়েছে এইরকম। সেই সব প্রাথমিক সত্তা পরাৎপরের সর্বশক্তি নিয়েই এসেছিল, ভগবান হতে স্বতন্ত্র কিছু নয়, তাঁরই বহির্বিকাশ মাত্র, তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে এই অভিব্যক্তির দ্বারা কত অসংখ্য রকমের সম্ভাবনা ঘটতে পারে। কিন্তু তাতে এই রকম সম্ভাবনাই ঘটে গেল, যদিও অন্য রকমও হতে পারতো। তদ্ভিন্ন একথা কেউই বলতে পারেনা যে এই বিশ্বটি ছাড়া আর কোনো বিশ্ব নেই, যা হয়তো সম্পূর্ণ আলাদা রকমের,

যার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানিনা, যা হয়তো আমাদের মতো এমন দুঃখদুর্দশাপূর্ণ নয়। আর যদিও বাহ্যদৃষ্টিতে একে দুঃখপূর্ণ দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু ভিতরের দৃষ্টিতে দেখলে তখন আর এমন মনে হবেনা। কেবল দৃষ্টিভঙ্গীর তফাৎ মাত্র।

প্রশ্ন : না, আপনি বলেছেন "আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে দেখলে তাতে ভগবানের অদৃশ্য শত্রুরা প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে, আর যখন আমার কোনো ক্ষতি করতে না পারে তখন আঘাত হানে দেহের উপর, কিন্তু ভগবৎ-কৃপা আমাদের সহায় থাকাতে তাদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়।" এই সব অদৃশ্য শত্রু কারা?

উত্তর : সে ঐ আদি সত্তা চারজন, যাদের কথা এই মাত্র বললাম। ওদের ভিতর থেকেও আবার অসংখ্য বিভূতি বেরিয়েছে, তাদের থেকে আরো অনেক রকম ফ্যাকড়া বেরিয়েছে। সেই সব লক্ষ লক্ষ সত্তা তাদের নিজের যুক্তিতে চেষ্টা করে তাদেরই রাজ্যকে বহাল রাখতে, এখানে যাতে আর কেউ না রাজত্ব করে। ভারতে এদের বলে অসুর, অর্থাৎ তামসিক সত্তা। এরা উল্টো পথে চলে। কেউ কেউ মত বদলায়। গীতায় সে কথা বলেছে। কেউ কেউ ভালো হলেও অন্যেরা তাতে রাজী নয়, তারা মরবে তবু বদলাবে না। কাজেই ওদের মধ্যে রকমফের আছে, কেউ বা এরকম কেউ অন্যরকম।

প্রশ্ন : যারা নিজেদের মত বদলেছে তারা কারা?

উত্তর ও, তোমার সেটা মনে আছে। একজন মত বদলেছে ও সহায়ক হয়েছে। সে হলো চেতনা ও আলোর সত্তা।

প্রশ্ন তার বদল হলে তো বিপত্তিও আপনা হতে দূর হবে।

উত্তর নিশ্চয়, কিন্তু তার শক্তি যে রয়েছে, সে প্রচণ্ড শক্তি।

প্রশ্ন আপনি বলেছেন চেতনা নিশ্চেতনায় পরিণত হয়েছে। সে নিশ্চেতনাও তো যাবে।

উত্তর হাঁ, আবার যে হবে চেতনা ও আলো, আগে যা ছিল।

প্রশ্ন : তাই কি সে আবার হয়েছে?

উত্তর কিন্তু আমি যে একমিনিট আগেই বললাম, ইতিমধ্যে তার অসংখ্য রকম ফ্যাকড়া বেরিয়েছিল। সে নিজে তার মত বদলালেও ফ্যাকড়াগুলি সকলে বদলায়নি। তারাও তো মুক্ত, স্বাধীন, তাই হয়তো কতক বদলেছে, কতক বদলায়নি। বেশির ভাগই তাই।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক হলো "মিথ্যার প্রভু" যে নিত্যই সত্যের বিপরীতে চলে। বাস্তবের জগতে তার প্রতাপ অপরিসীম। যারা দেখেছে তারা বলে সে অসাধারণ, আর নিজেকে সে বলে "সর্বজাতির কর্তা"। তার শক্তি দুর্দান্ত, অজেয়। কয়েকটি রাজ্যের প্রভুত্ব পেয়ে সে সকল মানুষের শাসনকর্তা বনেছে। গত দুটি বিশ্বযুদ্ধ সেই ঘটিয়েছে। সে বলেছে কখনই তার মত বদলাবে না, যদিও জানে তাকে মরতে হবে—তবু যতটা বিলম্ব হয়। তার কথা, নিজে ধ্বংস হবার আগে সে সমস্ত ধ্বংস করবে। সুতরাং সকল বিপদই সম্ভব হতে পারে।

প্রশ্ন : না, গত ফেব্রুয়ারির বাণীতে আপনি বলেছিলেন, "পৃথিবীতে নতুন আলো আসবে," এবং ঠিক তার পরেই (৫ই মার্চ) স্ট্যালিনের মৃত্যু হলো। ওর কিছু তাৎপর্য থাকতে পারে?

উত্তর : সামান্য। স্ট্যালিনের মৃত্যুতে (যা হিটলারের মৃত্যুর চেয়ে বেশি কিছু নয়) জগতের অবস্থা কিছুই বদলায়নি। তার চেয়ে আরো বেশি কিছু দরকার। এ যেন খুনী ব্যক্তিকে গিলোটিন করার মতো, তার মাথাটা কেটে নিলেও আত্মাটা রয়ে গেল বাইরে। সেই তার প্রাণসত্তা বাইরের কোনো নরম বুদ্ধি দর্শকের উপর ভর করে, আর তার মাথায় তখন খুন চাপে। এমনি অনেক তরুণ-অপরাধীকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানা গেছে—"খুন করবার ইচ্ছা তোমার কখন হলো?" তারা বলেছে—"একজনের গিলোটিন হওয়া দেখার পর থেকে।"

সুতরাং এর কিংবা ওর মৃত্যুতে কোনো লাভ নেই, ও একটা ঘটনা মাত্র, কিন্তু আসল কাজ হয় অন্যত্র। ও যেন, তুমি একটা শার্ট গায়ে কোনো গর্হিত কাজ ক'রে শার্টটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, "আর অমন কাজ করব না," কিন্তু তার পর অন্য শার্ট গায়ে দিয়ে আবার সেই কাজই করতে থাকলে।

প্রশ্ন : প্রাণসত্তার যদি মৃত্যুতে পরিণতি হলো, তাহলে সে নিজে মরেনা কেন।

উত্তর : কারণ নিজেকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখে। তুমি ঠিক কথা বলেছ, সেইজন্য সে নিজে পৃথিবীতে নেমে আসে না, প্রাণজগতেই থাকে যেখানে মৃত্যু নেই। এই বাস্তবের রাজ্যে মৃত্যু আছে তাই এখানে সে জন্মাতে আসে না।

প্রশ্ন : স্ট্যালিন যেমন ছিল তেমন কি সে আগের থেকেই ছিল?

উত্তর : স্ট্যালিন? সে বোধকরি ঠিক মানবসত্তা ছিল না, অর্থাৎ তার কোনো চৈত্যা ছিল না। ভগবৎবস্তু অবশ্যই ছিল—কারণ সব কিছুতেই তা থাকবে—কিন্তু সুগঠিত চৈত্যসত্তা নিশ্চয়ই ছিল না। বোধকরি সে প্রাণজগতের কোনো সত্তা ছিল। আর তাই হিটলারের সঙ্গে তার অনেক পার্থক্য। হিটলার ছিল মানুষ, দুর্বলচিত্ত,

ভাবপ্রবণ—ছিল এক ছোট জাতের কবী (কেউ বলে নুচি), কিংবা ক্ষুদ্র-ক্ষুলনাটার, তার ক্ষুদ্র বিবেক, সে ভাবালু, দুর্বলমনা। কিন্তু তার উপরে কোনো অদৃশ্য আত্মার ভর হয়েছিল। সে ছিল স্পিরিটের ভর হবার পক্ষে উপযুক্ত মিডিয়ম, ভর হলে তার নৃগারোগের মতো ফিট্ হতো। ঐরূপ ভরের দরুণ তার মধ্যে একটা শক্তি এসেছিল, খুব উচ্চশক্তি নয়। সেই শক্তির কাছে কিছু জানতে হলে তখন সে আপন প্রাসাদে ঢুকে "ধ্যানে" বসে তার নিজের "ভগবানকে" ডাকতো, অর্থাৎ সেই সর্বজাতির প্রভু। তার কাছে সে আলো পেতো। তার ছিল রুপালী পোষাক, সোনালি ডানা, জমকালো চোখধাঁধানো আলো। সে আলো বাস্তব নয়, কেবল হিটলার দেখতে পেতো যখন মিডিয়ম হতো। তখনই তার ফিট্ হতো। সে ছটফট করে শুয়ে থেকে কার্পেটের উপর মুখ রগড়াতো। তার কাছের লোকরা সেকথা জানতো, আর ঐ যে সর্বজাতির প্রভু সেও একটা বিভূতি মাত্র, তবে প্রবল শক্তিমান।

প্রশ্ন হিটলারের যখন ধ্বংস হলো তখন কি ভগবৎ শক্তির তাতে ক্ষতি হলো?

উত্তর তুমি কি বলছ? ধ্বংস হয়ে যাবে কোথায়? তোমরা রামায়ণের গল্প জানো, শেষে রাবণের কি পরিণতি হলো? তার সেই ব্যক্তিত্বটাই কেবল সে বিলীন ক'রে দিয়েছিল।

প্রশ্ন : রাবণের মৃত্যুর পরে তার কি হলো সে কথা কোথাও বলা হয়নি।

উত্তর : বলা হয়নি? আমি তো শুনেছি। সে নিজেই ঐরূপ অংশ বেছে নিয়ে পরমাত্মায় মিশে গেল, তার কোনো স্বতন্ত্র সত্তা এবং ব্যক্তিত্ব আর রইল না। যাবার আগে নিজের অংশটা সে অভিনয় ক'রে গেল, ভগবানের শত্রুর অংশ নিয়ে, কারণ মিত্ররূপী ভক্তের চেয়ে শত্রুরূপী হলে ভগবানের কাছে আরো শীঘ্র যাওয়া যায়। কারণ ভগবান যখন দেখেন যে যথেষ্ট হয়েছে তখন তাড়াতাড়ি তাকে কাছে টেনে নেন। ভগবান ছাড়া সে যাবে কোথা, সবই তো ভগবানের। তাই আপন ব্যক্তিত্ব নাশ ক'রে সে ভগবানে বিলীন হলো।

তা ছাড়া কোনো কিছুই তো নষ্ট হয় না, কেবল আকৃতিটাই যায়, কিন্তু উপাদান সবই থেকে যায়। সনস্তই শাশ্বত, কারণ সনস্তই ভগবানের, তার বাইরে কিছু যেতে পারে না, কেবল আকৃতিটাই যায়। ওতেই আসে মৃত্যুর ধারণা, কিন্তু তার উপাদান সবই রয়ে যায়।

অতএব ঐ সকল সত্তারা শেষে অনন্তে গিয়ে তার সঙ্গে এক হয়ে যায় (ব্যক্তি চেতনাকে ত্যাগ ক'রে), ব্যক্তিত্ব হারিয়ে অমর হয়, আত্মদানের চেয়ে এটাই তারা পছন্দ করে।

প্রশ্ন : কেন?

উত্তর : হয়তো গর্ব হেতু। এদের গোড়া থেকেই গর্ব থাকে, সকল ধর্মেই তাই বলে। আপন শক্তিমত্তা ও বিশেষত্বের গর্ব।

প্রশ্ন : আপনি বললেন ঐ চারটি হলো ভগবানের বিভূতি, তাহলে তাদের আলাদা চেতনা কেন?

উত্তর আলাদা চেতনা? চেতনা তো একমাত্রই, দ্বিতীয় নেই। তাঁর অংশ বিভূতিতে তাঁর সকল গুণই রইল, কিন্তু তারা যখন স্বপ্রধান স্বাধীন হলো, তখন তারা তাদের ইচ্ছামত মূলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেও পারে কাটতেও পারে। শক্তি পেয়ে তাদের প্রাধান্য জন্মালো, দেখলে যে আপন শক্তিতে যা খুশি তাই করতে পারে, যদিও ঐকাসূত্র থেকে যায়। তাই এখানেও দেখা যায় যে চূড়ান্ত অপরাধীর মধ্যেও একটু কিছু দিব্য আলো থাকে। তোমরা হয়তো বিবেকানন্দের লেখা পড়েছ,—"নিদারুণ নিষ্ঠুর পাপীকেও বলবে, জাগো আলোর সন্তান, দীপ্ত হয়ে ওঠো।"

এখনই তোমাদের ছেলেভুলানোর মতো গল্পটা বললাম। কিন্তু জিনিসটাকে দেখতে হবে আধ্যাত্মিক দিক থেকে। বাস্তবের নয়। যেমন হওয়ার কথা তেমন এখানে হয় না।

কিন্তু তবু এখানেও যা ঘটে কিছু কিছু তা অনেকটা প্রতীকের মতো প্রায় ঐরকমই। মায়ের পেট থেকে শিশু প্রথম যখন জন্মায় তখন সে বস্তুত তার মায়েরই অংশ হয়ে বেরিয়েছে। তখন থেকে কয়েক ঘন্টা, কয়েক দিন, এমন কি মাস দুই পর্যন্ত সে স্বতন্ত্র সত্তা হলেও সম্বন্ধ সূত্রে অবিচ্ছেদ্যভাবে মায়ের অংশ রূপেই থাকে, যা মায়ের দেহ থেকে নির্গত। কিন্তু সেই শিশু যখন বড়ো হয়ে ওঠে তখন সে সম্পূর্ণ আলাদা, সে এক স্বাধীন সত্তা, মায়ের অংশ হলেও সম্পূর্ণ অন্যরকম।

সেই বিভূতিদের বেলাতেও এমনি একই কথা, কেবল এ ব্যাপার হলো বাস্তবের স্তরে আর সে ব্যাপার সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে। উপরে যেটা হয় এখানেও তা প্রতীকের মতো হয়ে থাকে।

কখনো কি তোমরা এমন কথা বলোনি "অমুক ছেলেটার বাপ মা এমন ভালো। কত সরল, সুন্দর, সৎচরিত্র, আর তাদের ছেলে এমন নচ্ছার দুরাত্মা হলো কেন?" এতে তোমরা অবাক হও বটে, কিন্তু অসম্ভব কিছুই নয়। এটা আর সেটা একই কথা। সবই নির্ভর করে সত্তার আভ্যন্তর গঠনের উপর। দুটি সত্তা কখনো সমান হয় না, কারণ দুজনের গঠন একরকম নয়। যার ভিতরকার উপাদানগুলি যেমন ভাবে সংস্থিত হয়েছে সে তেমনি-ভাবে গড়ে উঠবে—যেমন দেহকোষগুলির বিভিন্ন সংস্থাপনার ফলে বাইরের চেহারাও বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। নিত্যই তোমরা চোখে দেখছ বলে তাই দেখাই তোমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা একই রকম। ছেলে বাপ মায়ের থেকে আলাদা রকম হলে তা যেমন স্বাভাবিক বলে মনে হয় ওটাও তাই। ভগবানের থেকে নির্গত বিভূতি যদিও তাঁরই একটা অংশ তথাপি সে তাঁর সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়, কাজেই সে তার থেকে স্বতন্ত্র। আর যেহেতু সে স্বতন্ত্র সেই হেতু তার ভিতরকার ব্যাপারও আলাদা।

যাক এই নিয়ে যথেষ্ট বলা হলো। প্রায় দর্শনতত্ত্বের মধ্যে চলে গেলাম।

পুনর্দর্শনায় আবার ছেলেমেয়েরা।

—শ্রীমা

পথের কথা

২৪ মার্চ, ১৯৭২

মা : কাল সকালে প্রথম আমি আমার দেহ দেখলাম—জানিনা তা অতিমানস দেহ কিংবা তার মধ্যবর্তী অবস্থা কিনা (কি বলি ?)—তবে নতুন দেহ বটে, লিঙ্গপরিচয় বিহীন, নারীও নয় পুরুষও নয়।

আর খুব শুভ্র সাদা। আমার গায়ের চামড়া সাদা বলে কিনা তা জানিনা। আর ক্ষীণ গঠন (ইঙ্গিত)—তবে দেখতে সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতি। এই প্রথম দেখলাম। এমন হবে তা আগের থেকে জানা ছিল না।

২৫ মার্চ, ১৯৭২

ভক্ত : কাল বললেন আপনার দেহ দেখার কথা, মধ্যবর্তী অবস্থাতে।

মা হাঁ, আমি নিজেকে ঐরূপ দেখলাম। আয়নাতে দেখা নয়, নিজের থেকেই দেখলাম (মাথা হেঁট করে নিজেকে দেখলেন) এইরকম ভাবে।

প্রথমেই দেখলাম, ভোর ৪টায় সময়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে, আয়না ধরে নয়। বেশ মনে আছে, মাথায় ছিল একটা ঘোমটা, দেখলাম বুক থেকে কোমর পর্যন্ত (ইঙ্গিত), যা দেখলাম তা পুরুষও নয় নারীও নয়।

আর দেখতে সুন্দর যদিও ক্ষীণ আকৃতি, কিন্তু রোগা চেহারা নয়। গায়ের চামড়া সাদা—এই আমারই মতো। আর লিঙ্গ লক্ষণগুলো সব অদৃশ্য হয়েছে। বুকের জিনিস-গুলো কিছু নেই (ইঙ্গিত) এমন কি পুরুষের যেমন থাকে তাও নেই।

খুব স্বাভাবিক বোধ হলো তাই তখন বিশেষ মনোযোগ দিইনি। রাত্রে সেই আমার প্রথম দেখা। গত রাত্রে কিছু দেখিনি, তার আগের রাত্রে সেই একবার মাত্র।

ভক্ত : কিন্তু সেটি তো আপনার সূক্ষ্মদেহ ?

মা তাই নিশ্চয়, সূক্ষ্মদেহের ঐরূপ চেহারা।

ভক্ত : কিন্তু স্থূলদেহে তা ঘটবে কেমন ক'রে ?

মা তা বলতে পারিনা সে কথা জানিনা।

যা স্পষ্ট দেখলাম তাতে খাদ্য জহমের বা মলত্যাগের কোনো প্রক্রিয়াগুলো থাকবে না। কিন্তু তা হবে কেমন ক'রে ?

অবশ্য এখনই আমার খাদ্যগ্রহণ উত্তরোত্তর অন্যরকম হচ্ছে (যেমন গুঁকোজ খাওয়া, যা হজম করতে হয় না), কিন্তু দেহটা বদলাবে কেমন ক'রে ? তা জানিনা, বলতে পারি না।

স্বাভাবিক ভেবে ভালো ক'রে তখন নজর দিইনি, তাই ওর বিশদ বর্ণনা করতে পারছি না। তবে সে দেহ পুরুষ বা নারী নয়, আর বাইরের থেকে দেখতে বেশ তরুণ বয়সের মতো (ইঙ্গিত) খাড়া কাঁধ আছে, কাঠামো তেমনি।

তবে আমি নিজেকেই দেখেছি। মাথায় ঘোমটার আচ্ছাদন ছিল। দেখে কিছু আশ্চর্য হইনি, স্বাভাবিকই বোধ হয়েছে। নিশ্চয় সূক্ষ্মদেহ ঐ রকমই হবে।

ভক্ত কিন্তু সমস্যা এইখানে যে সূক্ষ্ম থেকে তা স্থূলে আসবে কেমন ক'রে।

মা হাঁ, বাস্তবিক তা হবে কেমন ক'রে? বোধ করি প্রথমে বনমানুষ শিম্পাঞ্জি থেকে যেমন ক'রে মানুষ তৈরি হয়েছিল।

ভক্ত তা নয় মা, তার চেয়ে অনেক বেশি কথা। কারণ এখনও শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মধ্যে নানা বিষয়ে খুব বেশি তফাৎ নেই।

মা এখানেও খুব বেশি তফাৎ ছিল না। এমনি কাঁধ ছিল (ইঙ্গিত), হাত ছিল, পা ছিল, দেহ ছিল, মনুষ্যাকৃতি ছিল। সবই একরকম, কিন্তু

ভক্ত : হাঁ, কিন্তু শিম্পাঞ্জি ও মানুষেরও মধ্যে দৈহিক ক্রিয়া একই রকম।

মা তা ঠিক কথা বটে।

ভক্ত : দুজনেই খেয়ে হজম করে, দুজনেই শ্বাসগ্রহণ করে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে...

মা শ্বাস নেওয়া নিশ্চয়ই ছিল, কাঁধ বেশ চওড়া (ইঙ্গিত)। কেবল বুকটা নারী বা পুরুষ নয়, সোজা গড়ন। আর পেটের গঠন পাতলা ঝাঘু রকমের একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ আকৃতি মাত্র, এখনকার দেহের মতো তা কাজ করে না। দুটি জিনিসে সম্পূর্ণ পার্থক্য প্রথমত সে দেহে প্রজননের কোনো সম্ভাবনা নেই, আর দ্বিতীয়ত খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাকেরও সম্ভাবনা নেই। অবশ্য এখনকার যা খাদ্য তা শিম্পাঞ্জির মতোও নয় আর প্রথম যুগের মানুষের মতোও নয়, সম্পূর্ণ আলাদা। এখন প্রশ্ন, কেমন ধরনের খাদ্য চাই যার জন্য হজমের জটিল প্রক্রিয়া দরকার হবেনা। তা একেবারে তরলও নয়, আর কঠিনও হবে না। তার পর মুখ ও দাঁতের কথা, জানিনা তা কি রকম হবে। চিবোবার তো দরকার হবে না, সুতরাং দাঁতের দরকার নেই, তবে তার বদলে অন্যরকম কিছু থাকবে। জানিনা, বলতে পারিনা মুখটা কেমন ছিল, কিন্তু খুব বেশি তফাৎ বলে মনে হয়নি। তবে যা খুব বদলাবে তা শ্বাসক্রিয়ার ব্যাপার, তারই উপর সব কিছু নির্ভর করবে।

ভক্ত : হাঁ, শ্বাসের সঙ্গেই তো সে শক্তি অর্জন করবে।

মা হাঁ। হয়তো এর মধ্যবর্তী স্তরের জীবেরা জন্মাবে, তারা বেশিদিন কিন্তু

টিকবেনা। যেমন শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মধ্যবর্তী অবস্থা হয়েছিল। কিন্তু জানিনা, কখনই যা হয়নি এমনি একটা কিছু হবে।

(নীরব রইলেন)

ভক্ত আমার মনে হয় যে এবার একটা উপলব্ধির সময় এসেছে।

মা হাঁ, কিন্তু তা কেমন ক'রে?

ভক্ত : সে কথা বলতে পারিনা।

মা এই দেহটা (দেখিয়ে) কি বদলাবে? নিশ্চয় বদলাবে, নতুবা সেই মানুলি পদ্ধতিতে আবার ভেঙে গড়তে হবে। জানিনা—জীবনের মেয়াদকে তো বাড়ানো যায়, তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে—কিন্তু কিছু বলতে পারিনা।

ভক্ত : আবার বোধ হয় রূপান্তরের চাইতে ঐ সূক্ষ্মদেহই বাস্তবে পরিণত হবে।

মা ও, কিন্তু তা কেমন ক'রে?

ভক্ত কেমন ক'রে বদলাবে তা জানিনা, কিন্তু এটার থেকে ওটা হওয়ার চেয়ে ওটাই বরং এর স্থানে এসে পড়বে। কেমন ক'রে আসবে তা জানিনা।

মা (নীরব থেকে) হাঁ, ওদিন রাত্রে যা দেখলাম সেই চেহারাই যদি বাস্তবে পরিণত হয়, কিন্তু কেমন ভাবে হবে? (ধ্যানে মগ্ন হয়ে তার পরে) আমি কিছুই জানিনা, আশ্চর্য কথা যে আমি কোনো কিছুই জানিনা।

(নীরব থেকে)

ভক্ত মা, শ্রীঅরবিন্দের "রূপান্তর" নামক একটি কবিতায় আছে—

"শ্বাস চলে মোর সূক্ষ্ম ধারার ছন্দে
সারা দেহ মোর দিব্যের তেজে বন্দে"—

হাঁ, শ্বাসক্রিয়াই হলো প্রধান কথা।

২ এপ্রিল, ১৯৭২

(কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে মায়ের কথা, প্রথম ইংরেজী ও পরে ফরাসীতে)

মা বীরত্বের সময় এসেছে।

বীরত্ব বলতে সাধারণত যা বোঝায় তা নয়; ভিতরে বাহিরে সম্পূর্ণ এক হয়ে যাওয়া এই ভাবে যারা বীরত্বের সংকল্প নেবে পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে, ভগবান তাদের সহায় হবেন।

তোমরা যে এই সময়টিতে পৃথিবীতে এসেছ তার কারণ এক সময় তোমরা তাইই চেয়েছিল—সে কথা তোমাদের স্মরণ নেই কিন্তু তা আমি জানি—সেইজন্যেই তোমরা এখানে এসেছ। এখন তোমরা কর্তব্যের উচ্চশিখরে উঠতে প্রয়াস করো, সকল দুর্বলতা ও সংকীর্ণতাকে জয় করো। তোমাদের অহংজ্ঞানকে বলো যে তার দিন এখন আর নেই। অহংশূন্য একটা জাতি আমরা গড়তে চাই যাদের মধ্যে অহংএর বদলে আসবে দিব্য চেতনা। সেই দিব্যচেতনা জাতিকে উন্নীত করবে, অতিমানস সত্তা জন্মগ্রহণ করবে।

১২ এপ্রিল, ১৯৭২

মা ভক্তের হাতে ছাপানো কার্ড দিলেন মায়ের ফটো সম্বলিত, নিচে লেখা—"ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষের কোনো ইচ্ছা টিকতে পারেনা, এসো আমরা নির্বন্ধ সহকারে একান্তভাবে ভগবানের ইচ্ছার অনুসরণ করি, তাতে জয় অবশ্যম্ভাবী।"—শ্রীমা

মা আশ্চর্য যে মানব প্রকৃতি কেমন ক'রে তার প্রতিরোধ করে। সাধারণ মানুষদের প্রকৃতি জয়ের রাস্তা জানতে পেরেও আপন মতলবে পরাজয়ের রাস্তা বেছে নেয়। আমি ক্রমেই দেখছি—যা বিশ্বাস করা যায়না—এমন নিছক নিরেট বোকামি, দেখে বিশ্বাস করা যায়না। প্রবল শক্তির চাপ নেমে নেমে যাচ্ছে (ভঙ্গী) গভীর অবচেতনের দিকে।

অবচেতনের মধ্যে যে সব অবাক কাণ্ড হচ্ছে আমি রাত্রির পর রাত্রি ধরে তাই দেখছি—শক্তির চাপের ধারা সেখানে অপ্রতিহত ভাবে নেমে চলেছে।

আর মানুষের অবচেতনা চেঁচিয়ে বলছে "না, না, এখন নয়, এত শীঘ্র নয়।" ওরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা চাই, এই সাধারণ অবচেতনার বিরুদ্ধে।

তাদের প্রতিরোধের ফলে নানা দুর্গতি এসে পড়ে, তখন লোকে বলে, "দেখতো কত কাজ হলো, এই জিনিস এসে গেল।" কি নিদারুণ বোকামি।

ভগবানকে আঁকড়ে থাকা চাই। দেখতে কি পাওনা, তার কি যথেষ্ট কারণ নেই? কিন্তু সে বলে: "দেখ দেখ, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে..., ওঃ! এ কেবল প্রতিরোধ নয়, এ হলো বিকার! হাঁ, বিকার!

ভক্ত: হাঁ মা, তাই, স্পষ্ট বিকার। দেখাই যাচ্ছে।

মা: বিকারে বিগড়ানো।

ভক্ত: মনে হয় যেন কিছুতেই বশ্যতা মানতে চায়না।

মা না, যদি শুনতে না পেতো তাহলে বরং ভালো ছিল; কিন্তু যখন শুনতেই বাধ্য হয়, তখন তার জবাব হয়, "আমি কেয়ার করিনা"। ঐ একই উত্তর। "তুমি তাহলে নির্বোধ হবে"। "আমি তা গ্রাহ্য করিনা।" তোমার সব কাজ বিনষ্ট হবে।"—"আমি গ্রাহ্য করি না।" সকল যুক্তির একই উত্তর—"গ্রাহ্য করিনা।"

যদি তুমি অনুভবে জানো যে সকল কিছু ভগবানই করছেন, তাহলে অটল বিশ্বাসে বলতে পারো "তোমাদের তর্কযুক্তির কোনো দাম নেই; ভগবানকে জেনে তাঁর সান্নিধ্যে থাকার যে পরমানন্দ তা সকল কিছুকে ছাপিয়ে যায়—সৃষ্টি বলো, জীবন বলো, সুখ বলো, সাফল্য বলো, সমস্ত ছাপিয়ে (আঙুল তুলে) সেই একমাত্র"!

তখন সব কিছুই হয়ে যায় ঠিক, সবেরই সমাধান।

সেই জিনিসই যেন প্রকৃতির ভিতরকার সমস্ত মলকে আলোর দিকে আলোর মধ্যে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে যাতে সমস্তই নিঃশেষ হয়ে যায়। আর ভিতরকার যা কিছু শুভেচ্ছা তাকেই আঁকড়ে থাকে।

একটা সময় আসে যখন তা পরমাশ্চর্য, কিন্তু তার আগে ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন কষ্টের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে হয়।

ভক্ত: ঠিক বলেছেন, একটা সময় আসে, তখন মনে হয় সব ঝেঁটিয়ে বেরিয়ে যাবে।

মা (হেসে) তা নয়, তা নয়, সব প্রতিরোধই ঝেঁটিয়ে বেরিয়ে যাবে কিন্তু...

(নীরব থেকে)

কিন্তু আমি আরো বেশি ক'রে জানছি যে একটি মাত্র উপায় রয়েছে...(হেসে) ছবির মতো স্পষ্ট মনের উপর চেপে বসা। "চুপ রহো"। মনকে চুপ করানো, এই একমাত্র উপায়। মনের উপর চেপে বসে চুপ ক'রে থাকো (ভঙ্গী)।

(নীরব থেকে)

অবচেতনের মধ্যে পূর্বেকার প্রলয় সমূহের স্মৃতি রয়ে গেছে, তাতেই সর্বদা বোধ হতে থাকে যে প্রলয় হবে, সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

কিন্তু সত্যের দৃষ্টিতে দেখতে জানবে যে একরূপ অভিব্যক্তি ঘুচে গিয়ে আরো সুন্দরতর অভিব্যক্তি আসবে। ক আমাকে বলেছিল যে এটি হলো সপ্তম অভিব্যক্তি আর এইবারেই শেষ। আমি শ্রীঅরবিন্দকে সে কথা বললাম, তিনি তা সমর্থন ক'রে বললেন—এইবারেই অতিমানসের দিকে রূপান্তর ঘটবে। কিন্তু তার জন্য মনকে নীরব করতে হবে; তাই থেকে একটা অনুভব আসে (হেসে) যেন এক শিশু মনের মাথার উপর বসে হাত পা ছুঁড়ছে (ইঙ্গিত), আঁকলে বড় মজার ছবি হবে। এই আমাদের পার্থিব মন গাল ফুলিয়ে (ইঙ্গিত) ভাবে, সেই বুঝি সব চেয়ে জরুরী আর অপরিহার্য, আর ঐ শিশুটি মাথায় চড়ে বসে খেলা করে।

না গো ছেলে, আমাদের বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস এলে তখন বলি: আমরা দিব্যজীবন চাই—অথচ তাতে ভয়ও পাই। যখন ভয় ঘুচিয়ে দিয়ে আন্তরিক হতে পারি...তখন আসে সত্যিকার পরিবর্তন।

আমরা বলি, এমন জীবন আর চাইনা (হেসে) অথচ আমাদের ভিতরকার একটা কিছু অংশ তাকেই আঁকড়ে থাকে। কী হাস্যকর। থাকি সেই মামুলী মনোভাবকে আঁকড়ে কিন্তু এই পুরানো ধারা মুছে যাওয়া চাই—কিন্তু তাতেই আমরা ভয় পাই।

আর আমাদের মনের মাথার উপর সেই দিব্য শিশুটি বসে খেলছে! এ ছবি যদি আমি আঁকতে পারতাম তাহলে বেশ হতো।...এতই আমরা বোকা যে গম্ভীর হয়ে বলতে পারি "ভগবান ভুল কাজ করছে, এটা ঠিক হচ্ছেনা।" কী হাস্যকর কথা গো ছেলে!

(নীরব থেকে)

আমার তরফ থেকে এ কথা বলতে পারি যে, এর সব চেয়ে উত্তম প্রতিকার হলো (যা সব চেয়ে সহজ) পূর্ণ আন্তরিক ভাবে তাঁকে বলা তোমার যেমন ইচ্ছা, তোমার যা খুশি। তার পরেই বোধ আসবে। কিন্তু মন তোমার তা বুঝবে না, তার মাথার মধ্যে নেই (মস্তকে ইঙ্গিত)—এ কথা বলা, তুমি যা চাও, তুমি যা চাও।

৬ মে, ১৯৭২

(মা "অন্তর্দৃষ্টির" ভাবে বসে আছেন)

ভক্ত : মা, কিছু কি দেখছেন?

মা তোমাকে আগেই বলেছি যে এক স্থিরপাগর্ভ শক্তি যেন ক্রমাগত চাপ দিচ্ছে (ভঙ্গী), তার কোনো বাস্তব রূপ নেই কিন্তু তা বিপুল ভারী।

ভক্ত : হাঁ, হাঁ।

মা তা চাপ দিচ্ছে জড়ের উপর, যাতে বাইরে না বেরিয়ে তা ভিতরে ভগবানের দিকে ফিরতে বাধ্য হয়। তার ফলে দুর্গতি অপরিহার্য হয়ে ওঠে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার সমাধানও এসে যায়, এমন অবস্থা আপনা হতে এসে পড়ে যেন অঘটন ঘটার মতো। যেন দুটি প্রান্ত আরো চূড়ান্ত হয়ে ওঠে, ভালো যা তা আরো ভালো, মন্দ যা তা যা তা আরো মন্দ। সেই প্রাণশক্তির চাপে জগতে এমন ঘটছে, তাই আমার বোধ হলো।

ভক্ত : হাঁ, এটা বোধগম্য।

মা হাঁ, তাই মনে হয়। (আঙুল তুলে) আর দেখবে, যা মামুলী ঘটনা তা তীব্র হয়ে ওঠে; অবস্থার বিপর্যয়ে অশুভ ইচ্ছার কাজ তীব্র হয়ে ওঠে, অথচ সেই সঙ্গে অদ্ভুত অসাধারণ রকমের নিরাকূলও ঘটে যায় মরণাপন্ন মানুষ বাঁচে, জটিলতার জট হঠাৎ ঘুচে যায়।

ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাই। যারা জানে ভগবানকে কেমন ক'রে...(কি বলব?) অর্থাৎ ভগবানকে ঐকান্তিক ভাবে ডাকে, যারা জানে যে তাই হলো একমাত্র গতি, যারা

নিজেকে নিতান্তভাবে সমর্পণ করে, তাদের তখন (হাত ফাঁক ক'রে) কয়েক মিনিটেই আশ্চর্য জিনিস ঘটে যায়। তুচ্ছের বেলাতেও তাই, এর মধ্যে ছোটোবড়ো লঘুগুরু ভেদ নেই। সকল মূল্যই বদ্‌লে যায়। যেন জগতের চেহারাই পাল্‌টে যায়।

(নীরব থেকে)

অতিমানসের অবতরণে কেমন জিনিস হবে তারই যেন একটা আভাস। যা ছিল মামুলী তাই হয়ে উঠবে চরম। যা সামান্য ভুল তার পরিণাম হচ্ছে গুরুতর, আর অল্প কিছু সত্য আশ্পৃহার ও ঐকান্তিকতার ফল হচ্ছে অত্যাশ্চর্য। দুই দিক দিয়েই মূল্যবৃদ্ধি। সামান্য দোষের কুফল হচ্ছে অনেকটা, আর অল্প আশ্পৃহা ঐকান্তিকতার ফল হচ্ছে চমকপ্রদ। মূল্যবৃদ্ধি স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে।

ভক্ত মা, আপনি বলছেন দোষ ভুল করার কথা—জানিনা এটা আমার ভ্রান্তি কিনা, কিন্তু আমার এ ধারণা ক্রমশ বদ্ধমূল হচ্ছে যে দোষ বা ভুল কোনোটাই সত্য কিছু নয়। ও একটা—কি বলব—পথ মাত্র, আশ্পৃহার ক্ষেত্রকে বাড়িয়ে দেবার উপায় মাত্র।

মা হাঁ, ঠিক তাই। কথাটা এই যে জগতের সচেতন অগ্রগতির পক্ষে সবই ইচ্ছিত। চেতনা প্রস্তুত হচ্ছে ভগবানের দিকে যেতে। আর এ কথা খুবই সত্য যে আমরা যাকে দোষ বলি তাও তো সাধারণ মানব চেতনারই অন্তর্গত।

ভক্ত একমাত্র দোষ হতে পারে—যদি ভগবৎ বিষয়ে ইচ্ছা না থাকে। কিন্তু যখন থেকে কেউ সেই ইচ্ছা মনে নেয়...

মা যা বললে সেটাও দোষ নয়—তা হলো নির্বোধিতা।

এ তো সোজা কথা। সমগ্র সৃষ্টির কাজ হলো সৃষ্টির মধ্যে ভগবানের অভিব্যক্তি ঘটানো, তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর যা কিছুই সে করুক, তথাকথিত ভুল ভ্রান্তি প্রভৃতি সব কিছু নিয়ে, সবই হচ্ছে এই সৃষ্টিতে ভগবানকে অভিব্যক্ত করবার জন্য অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু মানুষ যাকে "ভগবান" বলে, বলে যে "এটা নয় ওটা", তেমন কোনো ছকবাঁধা জিনিস নয় ' সমগ্রকে জড়িয়ে একটা অসীম শক্তি ও জ্যোতি। বস্তুত সেই অসীম শক্তি এখন জগতে নতুনভাবে নেমে এসেছে, সে নিশ্চয় এবার অভিব্যক্তিযোগ্য হয়ে নিজেকে অভিব্যক্ত করবে।

আমি তো মীমাংসাতে এসেছি। আমি দেখেছি এবং জেনেছি এবং লক্ষ্য করেছি যে যাকে আমরা অতিমানস বলি, সেই এ সৃষ্টিকে সেই উচ্চশক্তির গ্রহণের জন্য স্পর্শচেতন ও গ্রহিষ্ণু ক'রে তুলছে। তাকেই আমরা দিব্য বলি, ভগবান বলি, (অর্থাৎ আমরা যেমন তার তুলনাতে)...এবং তারই চাপ আসছে সকল কিছুতে, আরো স্পর্শচেতন ও "গ্রহিষ্ণু" ক'রে তোলার জন্য। কি বলা যায়? যা অদৃশ্য ও অস্পর্শ তাকে আমরা বলি অবাস্তব (সাধারণ মানুষের কাছে)। আমরা বলি যেটা নিরেট বাস্তব আর যেটা

তা নয়, অথচ সেই অদৃশ্য শক্তি অবাস্তব হলেও তা পার্থিব বাস্তবের চেয়ে আরো বেশি বাস্তব ও শক্তিধর।

অতিমানস সম্ভাবের পক্ষে তাই হলো আশ্রয় ও নিরাপত্তা। দৃশ্যতঃ বাস্তব তো নয়ই, কিন্তু জড়ের উপর তার শক্তি অপরিসীম। তাই এখন দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা উত্তরোত্তর স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যাকে বলি "ভগবান" তার দ্বারা সেই শক্তি যখন ক্রিয়া করে তখন সব কিছুকে নাড়া দিয়ে বস্তুতে বিভ্রাট ঘটিয়ে দেয়, বস্তুদের পরিণতি পাল্টে দেয়—জড়শক্তির চেয়ে তার শক্তি অনেক বেশি। এই কথাটাই নতুন ও অবোধ্য, তাই সাধারণ চেতনাতে বিপর্যয় ঘটায়। যা ছিল তা নয়, একটা নতুন কিছু ব্যাপার।

আমাদের যা কিছু বিবেক বুদ্ধি যুক্তিতর্ক বাস্তববোধ, সব কোথায় হারিয়ে গেল। তার আর কোনো জোর নেই, বাস্তবতার সে তেজ নেই। একেবারে নতুন জগৎ।

(নীরব থেকে)

এই নতুন শক্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহসত্তার খাপ খাচ্ছে না, তাই হচ্ছে যত কিছু বিঘ্ন পীড়া ও বিশৃঙ্খলা। কিন্তু কেউ গ্রহিষ্ণু হলে হঠাৎ দেখা যায় সে হয়ে ওঠে অজেয়। এই ক্রমশ দেখছি যে সমগ্র চেতনা (স্থূলচেতনা) যদি শক্তিকে নিতে পারে তাহলে সে হয় প্রবল বলী ও অজেয়।

(চোখ বুজে) কিন্তু একটা বিশেষ শর্ত আছে : অহংএর দখল খতম করতে হবে। অহংএর স্থলে চাই দিব্যচেতনা—যাকে শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং বলেছেন—"অধিমানস চেতনা" আমরাও তাই বলব, যাতে ভুলবোঝা না হয়, কারণ "দিব্য" কথাটি বললেই লোকে মনে করে "ভগবান" তাতেই সব মাটি হয়। কিন্তু তা তো নয় (মুষ্টিবদ্ধ ক'রে)—এই অতি-মানস জগতের অবতরণ কাল্পনিক নয় একেবারেই, এ হলো অতি বাস্তব শক্তি (হেসে) কিন্তু বস্তুর সাহায্যে নয়। জগতে নামলে সে অন্য জগতের চেহারা নেবে।

(নীরব থেকে)

আমার এই দেহ অনেকবারই বোধ করেছে একটা অস্বস্তি ও উদ্বেগ ; তখন যেন চেতনার মধ্যে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেছে "ভয় কেন করো ? এই হলো নবচেতনা।" অনেক বারই যখন ও কণ্ঠস্বর এলো তখন আমি বুঝলাম।

(নীরব থেকে)

বুঝে দেখ, এই কথাই মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে বলে—"তা অসম্ভব, যা নাকি কখনই হয়নি"। সে কথার এখন সমাপ্তি। ঐরূপ বলতে যাওয়া এখন বোকামি। বরং বলা উচিত, এতকাল হয়নি বলেই তা হবে। এই নতুন জগৎ, নতুন চেতনা, নতুন শক্তি, এ শুধু সম্ভব নয়, কিন্তু উত্তরোত্তর স্পষ্ট অভিব্যক্ত হয়ে উঠবে, নতুন জগৎ আসছে বলেই, কখনো তা হয়নি বলেই। হয়নি অতএব এবার হবে।

(নীরব থেকে)

কথাটা চমৎকার, কখনো হয়নি বলেই এবার তা হচ্ছে।

(দীর্ঘক্ষণ ধ্যানে থেকে)

বস্তু কিছু নয়, কিন্তু বস্তুর চেয়েও সুস্পষ্ট নিয়েট!

ভক্ত : হাঁ, তার প্রবল চাপ যেন চূর্ণ ক'রে দেবার মতো।

মা ঠিক তাই, চূর্ণ করে দেবার মতো। তাই...

কিন্তু যা কিছু গ্রহিষ্ণু নয় তাই সেটা বোধ করে, কিন্তু যা গ্রহিষ্ণু হয় তা যেন আরো বেড়ে বিস্তার পেতে থাকে।

ভক্ত : হাঁ, দুই রকমই আশ্চর্য।

মা অথচ দুইই হয় একসঙ্গে।

ভক্ত : হাঁ, মনে হয় যেন ফেঁপে ফেঁপে শেষে ফেটে যাবে, আবার সেই সঙ্গে মনে হয় যেন একরকম প্রবল চাপে চূর্ণ হয়ে যাবে।

মা হাঁ, কিন্তু যে বাধা দেয় তাকেই প্রবল চাপটা লাগে, অর্থাৎ যে গ্রহিষ্ণু নয়। কিন্তু যদি নিজেকে খুলে দাও তাহলে যা হয় তা আশ্চর্যভাবে অসাধারণ। আমাদের শত শতাব্দীর যা অভ্যাস তাই ওরূপ বাধা দেয়, তার বেলাতেই অমন হয়, কিন্তু যখন সে নিজেকে খুলে দেয় তখন হয় কেবল ব্যাপকতর বিস্তার...তা হয় পরমাশ্চর্য। হাঁ, ঠিক তাই...*

—শ্রীমা।

---

* Bulletin of S. A. I. C. E. থেকে। অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের যোগ

সুধা কর

(২৯)

এখনকার আলোচনা অহংতত্ত্বকে নিয়ে—কি করে 'অহং'এর বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। কর্মযোগে অহন্তার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার সময় দেখেছি যে, কর্মে উৎসাহ ব্যগ্রতা এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা থেকে যে অহং বুদ্ধি জাগে, তাকে আঘাত পেতে হয়। কিন্তু আমি কাজ করি না, কে যেন আমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছে এই বোধে জেগে উঠে সমত্বের বোধে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলে অহং বিলুপ্ত হয়ে যায়। "আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল"—এই "আমি" থেকে কি করে মুক্ত হওয়া যায়, সেই আলোচনা করতে অহংতত্ত্বের সমগ্র আলোচনা করে শ্রীঅরবিন্দ যোগে অহংএর রূপান্তর ও তার স্থান নির্দেশ করে দেখিয়েছেন।

মানুষের উপাদান বিশ্লেষণ করে তিনি দেখেছেন দেহ প্রাণ ও মনের ত্রিপুটি নিয়ে তার কর্ম, তার জীবন। সাংখ্য ও বেদান্ত ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এ মনুষ্যদেহ পাঞ্চভৌতিক—পঞ্চভূতে গড়া, আবার তার পিছনে রয়েছে তন্মাত্র। প্রাণকে বিশ্লেষণ করলে ইন্দ্রিয়-গোলক ও সেইরকম পাঁচটি যেমন দেখা যায়, তেমনি আছে পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী সূক্ষ্ম করণশক্তি। এর পরের তত্ত্বগুলি হচ্ছে মন অহং মহত্তত্ত্ব প্রকৃতি এবং পুরুষ। মূলে রয়েছে পুরুষ-প্রকৃতি। এ প্রকৃতি কিন্তু পুরুষেরই শক্তি, তাই তারও বিকার নেই। প্রকৃতি বা প্রধান সমস্ত কিছুর উৎস, "গিন্নিদের ন্যাতাকোতার হাঁড়ি"। সবকিছুই সেখানে মিশে একাকার হয়ে থাকে। যেমন কিনা ভূমি-মাটি, তাতেই সব কিছু উৎপন্ন হয়, কিন্তু যখন দেখি আলাদা আলাদা জিনিষ কিভাবে উৎপন্ন হয়, তখন তাকে বলা হয় বিকৃতি, প্রকৃতিরই বিকৃতি কিনা বিচিত্র প্রকাশ। কাজেই প্রকৃতি অব্যক্ত, তিনি প্রধান এবং তত্ত্বত তা পুরুষ-প্রকৃতির ঊর্ধ্বে।

সাংখ্যদর্শন বলছেন যে প্রকৃতির কবলিত পুরুষকে মুক্ত করতে, তাতে প্রথমে প্রকৃতি থেকে তাকে আলাদা করে বুঝে নিতে হয়। গীতা উপনিষৎ বলেছেন প্রকৃতিই শক্তি। তাঁকে মহত্তত্ত্ব বলে যখন দেখা হল, তা থেকে অহং বেরিয়ে এল মহত্তত্ত্বের বিকার হয়ে আর এই অহংতত্ত্বের বিকার হল মন এবং তা থেকে পঞ্চভূত—ব্যোম মরুৎ তেজ অপ কিতি পর্যন্ত উদ্ভূত।

শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে পেয়েছি যে, আমি আমি যখন করি তখন এক আমিই বহু হয়ে যাই আর অহংএর বোধ হয়, অহং দেখা দিল। আবার যখন সব অহং গুটিয়ে আসে এক হয়ে যায়, তখন যা দেখা দেয় সেটা হল মহত্তত্ত্ব। যেমন সব মানুষের মধ্যেই অহং আছে

কিন্তু মহামানব যিনি হন, তাঁর যে "অহং" তার মধ্যে সব "আমি" মিলে মিশে যায়। তাই আমার "আমি"কে যদি সত্যকার বৃহৎ করতে পারি, তখন মহত্তর বোধ যাবে, তখনই সবাইকে আপন করা যাবে, সবই আমার আমিতে পরিণত হল। কাজেই এই 'অহং'এর সবটাই মহত্তর।

সাংখ্যদর্শন অহংতত্ত্বের গুণকেই বলেছেন অভিমান। শুধু প্রাণীরই নয়, জড় বস্তুতেও অভিমান আছে। যে যা সে তাই থাকতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, নিজের খোলে গুটিয়ে থেকে যেতে চায় শামুকের মত: এই হল অভিমানের লক্ষণ। পরমাণুর কেন্দ্রে বা যে কোনও অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশে এই অভিমান নিহিত রয়েছে, নিজের স্বভাব সে কোনমতেই ছাড়তে চায় না। যে কোনও একটা নির্দিষ্ট ধারা ও রীতি অনুযায়ী তার পরিণতি যেন আপনা থেকেই হয়ে চলে। এই তন্ত্রজড় থেকে প্রাণ মন পর্যন্ত ঐ অহংএরই বিকাশ ঘটিয়ে চলছে, এটা শ্রীঅরবিন্দ দর্শনে আমরা পেয়েছি। আমার দেহের মধ্যে জীবকোষগুলি একটা সংঘাত সৃষ্টি করে নিজেদের মধ্যে একটা নিয়মাধীন হয়ে থাকে, যাকে বলা যায় স্বভাবে থাকা স্বচ্ছন্দে থাকা। এইভাবে অহং ও মহত্তত্ত্ব যেন দুটি শক্তি-প্রবাহ পরস্পরের সঙ্গে একটা অচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। অহংএ যা গুটিয়ে যায় মহতে তা বিস্তৃত ব্যাপ্ত হয়ে যায়। গুটিয়ে আসার কালে আলাদা আলাদা মন হয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। এই রকম করে যে অহং ক্রমে ছোট হয় আর নীচে নেমে যায় সেটা জীবনের যেন একটা ফাঁকি, দুর্দৈব। 'আমার' বলে যা-ই চাই, যাকেই বাঁধতে যাই, তা শেষ পর্যন্ত আমাকে ছোট করে ফেলে, সঙ্কীর্ণতা দেখা দেয়। কিন্তু সকলের সব মন মিললে হয় মহামানবের মন, সে মনে সবার আশ্রয়। তাই মন নিয়েই যখন চেতনার ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করি, সে দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখব সৃষ্টির মূলেই তো অহং রয়েছে। শৈবদর্শনে এই চিত্রটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট; সেখানে দেখানো হয়েছে সৃষ্টির প্রারম্ভে অহম্ ও ইদম্ একই সঙ্গে থাকে। "আমি আছি" এই হল অহংএর বোধ, আর তা ছাড়া সবই যা কিছু আমার বাহিরে বিষয় বলে দেখছি, সবই ইদম্। যতই ইদমকে আত্মসাৎ করা যাবে, ততই অহং বড় হতে হতে ক্রমে ইদম্‌কে গ্রাস করবে। উপনিষদে সর্বাত্মভাব বলে বোঝানো হয়েছে আত্মা বা আমিই সব। এই অবস্থায় চেতনা ঊর্ধ্বাভিসারী, মহত্তত্ত্বের কাছাকাছি। কবির গানে এই ধ্বনি পাই যখন শুনি "কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি, সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি"।

ইদম্‌এর তীব্র আকর্ষণ আছে। সৃষ্টির অভিব্যক্তিতে ইদম্ বড় হতে হতে দেহ প্রাণ মন আর অহম্ ছোট হতে হতে ক্রমে যেন শামুকের খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তখন ইদম্ অহংকে গ্রাস করে রেখেছে, সেই বড় আর মধ্যে ছিটে ফোঁটা করে অহং। প্রকৃতির কারখানায় পশুপাখী ইত্যাদি সব জীবের মধ্যেই অহং ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই অহম্ ইদম্‌এর দ্বারা গ্রস্ত, তার মুক্তি হবে কিসে? শৈবদর্শনের পরিভাষায় বলতে হয় "পূর্ণাহন্তা" হলেন অহম্‌এর বিশুদ্ধ রূপ। ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ যে অহন্তা সে তার বৃহৎরূপে পূর্ণাহন্তা, তা

থেকেই আবার বলা যায় পরাহন্তা হলেন "শিবোহম্।" এই ভাবে দেখলে অহংএর উজান ধারায় "পরাহন্তা"য় তার মুক্তি, তার চলার পথে অহম্‌কে কেন্দ্রে রেখে যে ভাবে চেতনা অভিব্যক্ত হয়ে চলে, শ্রীঅরবিন্দ তার বিচার করে দেখিয়েছেন।

দেহ-প্রাণ-মন নিয়ে এই যে অহং বাহিরে গুটিয়ে আছে এমন করে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা এবং এই কারণেই অহংএ অহংএ গুঁতোগুঁতি, তা থেকে অভিমান অহঙ্কার...আমি বড়, এই সব ভাব পেয়ে বসেছে। কিন্তু অন্তরাবৃত হতে পারলে অহংএর শুদ্ধ রূপ দেখা দিতে আরম্ভ করে—যাকে আমরা জানি চৈত্যসত্ত্ব (Psychic entity) বলে, তার সঙ্গে রয়েছে হৃদয়ের গভীরে সত্যকার যোগ। আর বাহির নিয়ে ঐ ইদম্‌গ্রস্ত যে অহং সে বাঁধা রয়েছে ভোগ ও অহঙ্কার নিয়ে। তার মধ্যে যখন ভালবাসা জাগে তখন ওই চৈত্যসত্ত্ব অহংকে নিয়েই উজান ধারায় ব্যাপ্ত হয়ে চলে। এই ব্যাপ্তির বোধই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ অহন্তায় পরিণত হয়, যেন উধাও হয়ে যায়। তখন তাকে ধরে থাকে এক অনন্তের বোধ। কাজেই সেই অহন্তার ব্যাপ্তিতে তখন আর কূলকিনারা পাওয়া যায় না। শ্রীঅরবিন্দ বলছেন সেই মহৎ জ্যোতিতে (Cosmic Ego) অহং হারিয়ে যায়। যেখানে হারায় সাংখ্য তাকেই বলেছেন অব্যক্ত। তাই বলে মনে কোরোনা যেন হারালেই সব হয়ে গেল। ঐ যে দানাবাঁধা ছোট 'আমি'টি, সেই "আমি" ভাবকে বৃহৎ জ্যোতি মহত্তত্ত্বে ফেলে দিতে পারি, তারপর কি হয়?

সাংখ্য দর্শন "দ্রষ্টা"কে কিন্তু কখনও হারাতে দেন না। জ্যোতিতে তোমার সব গলে হারিয়ে যাক কিন্তু মাথা তুলে দেখে যাও, উপদ্রষ্টা যে তুমিই! বৈষ্ণবরা যে বলেন "এ আমি তোমার দাস, এ আমি তো তোমার", সেই তিনি কি করেন দেখ।...তখন ওই যে শুদ্ধ অহং, তাকে নিয়ে এক সাধনার ধারা খুলে যায়। অহং বড় হতে হতে আকাশময় আলোয় ছড়িয়ে গেল, কিছুই থাকল না, কিন্তু চৈত্যপুরুষ যদি জেগে থাকেন! তাহলে সেই জ্যোতির সমুদ্রে নক্ষত্র ফুটে ওঠে যে! নুনের পুতুল সমুদ্রে গলে যায় আবার সেই নুন জমে পাথরও হয়ে যেতে পারে। তখন বলতে পারি অহং তাঁকেই পায়, আমার এই অহং কার? তাই তো আমার অহঙ্কার এই জোর তখন আসে। শ্রীঅরবিন্দ চৈত্যসত্তাকে এই ভূমিকাও দিয়েছেন। পরমহংসদেব বলতেন "এই আমি কি যায়? যায় না। তবে থাক শালা দাস আমি হয়ে"। এও চৈত্যপুরুষেরই ভাব, তার অহং শুদ্ধ একক ঘনীভূত হয়ে অব্যক্তে মিলে যায়, আর তাই হল আত্মতত্ত্ব। সেখানে এই মহালয়টি ও মহানিলনটি সংঘটিত হয়। এই চৈত্যসত্তা বা শুদ্ধ অহংই হল জীব। যতই গুটিয়ে যায়, ততই নিগৃহিত হতে হতে চৈতন্য জমাট বেঁধে বিশ্বঘন হয়ে যায়। ভ্রূমধ্যে চেতনা একাগ্র সংহত হলে দৃষ্টি প্রসারিত হয় অব্যক্তে, আজ্ঞা-চক্রের ধ্যানে আত্মবোধ ধীর ও স্থির হতে হতে বিশ্বতে পরিণত হয়; এই পথ ধরে একাগ্র চিত্তের ধ্যানে আত্মাকে পাওয়া যায়।

জৈনদর্শনেও দেখতে পাব দ্রষ্টার নিরতিশয় অস্তিত্ব—তাঁরা দেখেছেন মুক্তজীবই আকাশে তারা হয়ে যেন জেগে থাকে। আবার এমনও তো সেখানে হতে পারে যে ঐসব

"তারা"ই সূর্য হয়ে যায় কিম্বা শুধু আকাশ হয়ে আততত হয়ে গেল। একটি বিন্দু (তারা), সূর্য বা আলোছড়ানো আকাশ এই তিনরকমের ভাব দিয়ে প্রকাশ হতে পারে। চৈত্যপুরুষ রূপান্তরিত হয়ে হল চিন্ময় পুরুষ তারপর উত্তানে তুরীয় সত্তায় পর্যবসান, এই হল উত্তান পথের ধারা। তারও পরের কথা তুর্যাতীতের অবস্থা, কিন্তু তা ধরতে দীর্ঘকাল লেগে যেতে পারে। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সে আর এক পর্ব।

*

অহংএর বন্ধন কোথায়? অহং নীচে নেমে পাষাণ কারায় বন্দী হয়ে আছে, তাই আমরাও নীচে বাঁধা পড়ে গেছি গুণ অর্থাৎ দড়ি দিয়ে। তিন গুণের মধ্যে তমোগুণের ধর্মই অভিমান, এই বাঁধনটিই সবচেয়ে জোরালো অবুঝ কঠিন নিগড়। আমরা যখন রজঃ গুণের ধর্মে প্রাণচঞ্চল হই, তখনই ঐ বাঁধনদশা থেকে মুক্ত হবার জন্য ছটফটানি আসে। আবার এই আমিই যখন দীপ্তমনা বা সাত্বিকধর্মী তখনও কিন্তু বাহিরের অস্তিত্বে রজোগুণ ও তমোগুণের ভেতরেই তৃতীয় গুণ সত্বের প্রভাবে থাকি—এই হল ইহজীবনসর্বস্ব অহং কেন্দ্রীণ ভোগজীবন। এখান থেকেই অপর একটি রাস্তা অন্তর্মুখে খুলে যায়; সেখানেও অহং কিন্তু সেটা যোগের অহং। বাহির থেকে ভেতরে চোখ মেলে সেই 'আমি' পথ চলে।

অহংকেন্দ্রীণ যে ভোগজীবনের কথা বলা হল, তারও দুটো ধারা দেখতে পাওয়া যায়। সুস্থ দেহ উচ্ছল প্রাণশক্তি দীপ্ত মন নিয়ে আমি ভোগ করতে চাই। মৃত্যু আসবে জানি, বয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ফুরিয়ে শেষ হয়ে যাব। দেহ ভস্মীভূত হয়ে গেলে পুনরাগমনের অর্থই বা কি রইলো আর ফিরেই বা আসছে কোথায়? অতএব চার্বাক মতে "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ—" ইত্যাদি। এই হল জড়বাদে ভোগীর চরম কথা। দ্বিতীয় ধারাটিতে যদিও ভোগের জীবনই চায় কিন্তু সেখানে ভোগীরা শুধু নিজের কথা একার ভোগের কথা ভাবে না। এ যুগে সবার ভোগের কথা ভাবাটা বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবতাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণভাবে এই ভোগীমানুষেরই দর্শন, যোগীর দর্শন নয়। তারা অভ্যুদয় চায় উন্নতি চায়, কিন্তু মনুষ্যসমাজের উন্নতি তো আর একজনের উন্নতি হলেই হতে পারে না, এই ভাবনায় তারা কোন বড় আদর্শ বড় ভাবের কাজ নিয়ে মেতে থাকতে চায়। এর ফল ভাল হলেও এতে মানুষের মূল্য উন্নীত হয় না। আবার জোট নিরপেক্ষ হয়েও জড়বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই অহংএরই বুদ্ধি খুলে যায় আর এক দিকে সেটা এই যে, "আমি" মরে গেলেও আমার বংশ বা আমার সৃষ্টি তো চলতেই থাকবে, জীবধারা তো আর বন্ধ হবার নয়। বংশপরম্পরা ধরে জীবকোষের অবিচ্ছিন্ন ধারা অহংকেন্দ্রগুলিকে বহন করে চলে, তার তো বিনাশ নেই। সেই ধারার ধারক তো 'আমি'ই, ঐ ভাবে আমি বেঁচে থাকি ইত্যাদি। কিন্তু বোধ জাগলে পরে একেও কাটিয়ে যেতে হয়, না হলে দেখা যায় এই সব জড়বাদী দর্শনের একটা বিপরিণাম হতে পারে। যতই একার হতে চাই, সমাজগত ভাবে বা বংশধারা ধরে জোট বাঁধতে চাই, শেষ পর্যন্ত অহংএ অহংএ গুঁতোগুঁতি লেগে যায়।

একজন বড় হলে অপরের বড় হওয়াটা প্রাণীজগতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। "আনন্দমঠে" দুর্ভিক্ষের যে চিত্র দেওয়া হয়েছে, সেটা এই রকম দেহগত প্রাণের খাই-খাই ভাব; এই বুভুক্ষা কাটিয়ে উঠতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

এরপর আসে অন্যপথের কথা। অধ্যাত্মজীবনে আমরা যে পথে চলতে চাই, মনকে ছাড়িয়ে বিজ্ঞানের সেই সত্যের জ্যোতির পথে চিন্ময় আলোয় চলা শুরু হলে আর একটা দিগন্ত উদ্ভাসিত হতে থাকে, উপনিষৎ যাকে বলেছেন শ্রেয়। এই শ্রেয়ের পথেরও একটা তীব্র আকর্ষণ আছে, তার ডাক যখন আসে তখন ভোগ-জীবন আনুনি লাগে। সে অভিজ্ঞতা না হলে, মনের অবস্থা সে রকম না হলে এ শুধু বলে বোঝানো যায় না। এ অবস্থায় জগৎ-সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য আসে এটাও ঠিক, কিন্তু তাতে জগৎ বা সংসার কিছুই তো নস্যাৎ হয়ে যায় না। উর্ধ্বতন লোকে একটা সমৃদ্ধ বলিষ্ঠ ও বৃহৎ ভূমি থেকে জগৎ যেন নতুন রূপ ধরে নব আবির্ভাবের মত বেরিয়ে আসে। তাই অধ্যাত্মবোধের সঙ্গে নব-জন্মের কথা চিরনবীনতার কথা বলা হয়ে থাকে। ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হলে বিনাশের বা লয়ের পর নতুন ধর্মের পুনরায় প্রতিষ্ঠা হয়। ধর্মের অর্থ অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ দুই-ই। তাই উর্ধ্বলোক বা অনন্ত জ্যোতির্লোক থেকে যদি অভ্যুদয়কে মোহন করে আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তবেই নিঃশ্রেয়সকে পূর্ণ করে পাওয়া হবে। প্রাচীন ভারতে এই দুইকে মেলানোই ছিল সাধনার মূল কথা। এই জীবনেই যদি জীবনোত্তরকে নিয়ে চলা লক্ষ্য হয়, তাহলে অর্থ কামকে ধর্মের শাসনে রাখতে হয়। না হলে মোক্ষের বা ওদিকে শুধু অর্থ কামের সাধনায় জীবন একপেশে হয়ে পড়তে পারে। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার যে পথ শ্রীঅরবিন্দ তাকে ফিরিয়ে এনেছেন ও তাকে সমৃদ্ধ ও বহুগুণে সম্পূর্ণ করে ধরিয়ে দিতেছেন। ওই নিঃশ্রেয়সকে লাভ করলে অহংতত্ত্বকে ঠিক ঠিক বোঝা যাবে, তার আগে অহং কিছুতেই সোজা পথে যেতে চায় না।

আত্মচৈতন্যকে জাগ্রত করে "সদা" সমনস্ক শুচি থেকে আমার "আমি"কে জানতে হবে। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণমূর্তির একটা কথা উল্লেখ করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি বলেছেন অকপটভাবে নিজেকে নিজের কাছে বের করে দাও। এ ভাবে নিজেকে দেখতে শিখলে দেখি, এক আমি চলে প্রবৃত্তির তাড়নায়, আবার এক আমি বিচার করে। আমার সব কিছুর সাক্ষী আমিই। তখন দেখি প্রকৃতি জড়িয়ে আছে বলে কষ্ট পাই। তা থেকে আলাদা হয়ে থাকলে শান্ত ও সুস্থির থাকা যায়। তিতিক্ষায় সব কিছুতে আটল থাকায় অভ্যস্ত হলে অহংএর শুদ্ধ রূপ ধরা পড়ে। তাতে মলিনতা থাকলেও সেই কাঁচা আমি থেকে পাকা আমি যে সাক্ষী দ্রষ্টা, সেই আমিতে স্থিত হওয়ার জন্য অনেক যত্ন করে অভ্যাস করতে হয়। এর জন্য একটা নৈতিক উন্নত মান ধরে রাখতে হয় এবং সেগুলি বজায় রাখতে যুদ্ধ করতে হয়, "যুধ্যস্ব বিগতজ্বর"। এই সাক্ষী অহংই জীবাত্মা।

এখন এই সাক্ষী অহংএর স্বভাবই হল ব্যাপ্তির বোধে আতত হওয়া। একদিকে ঘনপিনদ্ধ হয়ে ক্রমে গুটিয়ে যেন কিছুর মধ্যে জড়াচ্ছে, অপরদিকে আবার তেমনি সর্বব্যাপ্ত

হয়ে সবকে ধরে আছে। কঠোপনিষৎ এই প্রথম অবস্থাকে বলেছেন জ্ঞানাত্মা। মহা-সমুদ্রে যেন অর্ণবিত দীপপুঞ্জ, সকলের সঙ্গে সকলের গভীর যোগ, অতলে জ্বলছে অধুমক জ্যোতি—আত্মদীপ। ব্যক্তিচৈতন্য এই জ্যোতিতে একাত্ম হলে ব্যাপ্ত বৃহৎ হয়ে বিশ্বাত্মার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, এই অনুভবকে সদ্‌ব্রহ্মের উপলব্ধি বলে বর্ণিত করা যায়। সদ্‌ব্রহ্মকেও যেন ছাপিয়ে বিশ্বাতীত তুরীয় অনুভব পর্যন্ত অহংএর একটা তুরীয় বোধ (Transcendent ego) বজায় থাকে। বৌদ্ধদর্শনে এর ভাল পরিচয় পাওয়া গেছে।

আবার এমনও হতে পারে যে জীবাত্মা সূর্যের আলোয় আকাশ জুড়ে সূর্য ছুঁয়ে সূর্যস্বর ভেদ করে আবার নিজের নীড়ে ফিরে এল। ব্যক্তিচৈতন্য বিশ্বচৈতন্য ও তুরীয় নৈর্ব্যক্তিক হয়েও পুরুষ বিরচণ করেন। এইভাবে আত্মবাদ শূন্যবাদ পুরুষবাদ এই তিনরকমভাবে অহংমুক্তির পথ খুলে গেছে। কিন্তু মানুষী তনু আশ্রিত তাঁকে ভূতভাব-মহেশ্বর রূপে যখন দেখা নেলে !...থৈ থৈ করছে চারিদিকে অতল অসীম সমুদ্র, সেখানে যে দ্রষ্টা তার নুনের পুতুল গলে গিয়ে জমে পাথর বনে গেছে—চিদঘন বিগ্রহরূপ ধরেছে। চৈতন্যই জমাট বেঁধে বস্তুর চিন্ময় রূপধারণ করেছে, আলোয় আলো হয়ে গেছে। এমন হতে পারলে অর্থাৎ ওই তিনটি ভাব বিশ্বাতীত তুরীয়, বিশ্বগত সর্বাত্ম ও নৈর্ব্যক্তিক ব্যক্তিত্ব এই তিনটি ভাব একসঙ্গে বহন করে পুরুষ যখন বিচরণ করেন, তখনই আত্মার পরিপূর্ণতা এবং অহংএর বন্ধন থেকে যথার্থই মুক্তি ঘটে।* (ক্রমশঃ)

---

* অনির্বাণের ভাষণ অবলম্বনে

যুগের সমস্যা ঃ শ্রীঅরবিন্দের সমাধান

রামেশ্বর শ'

জাতীয় জীবনের মগ্ন-চৈতন্যে যে একটি দুর্লক্ষ্য শক্তির ক্রিয়া চলেছে তাকে কোন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ধরবার চেষ্টা না করে যদি আমরা শুধুই তার উপরিতলের রূপ বিশ্লেষণ করি, তা হলে সহজেই মনে হবে—বিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতের জাতীয় জীবন এক বিস্ময়-কর দ্বিধা-বিভক্তির মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে. একদিকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও সামাজিক অবক্ষয় জনজীবনকে এনেছে চরম বিপর্যয়ের মুখে, অন্যদিকে আগের শতাব্দীর নব-জাগ-রণের উত্তরাধিকার উন্নতির সবুচ্চ শীর্ষ স্পর্শ করেছে। শুধুই বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে জাতির এই দ্বিমুখী পরিণামের অনেক ছবিই পরপর ভেসে উঠবে। মনে পড়বে দীর্ঘকালের ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ফলে বিশ শতকে যখন জাতীয় জীবন প্রায় রক্তহীন হয়ে এসেছিল, তখনই আঘাত এসে লাগল দু'টি বিশ্বযুদ্ধের। এই আঘাতে ক্রনিক-শোষণক্লিষ্ট জাতি যেন সামগ্রিক বিনষ্টির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। এর সঙ্গে ১৯১৮-১৯ সাল থেকে ভারতে ক্রমে ক্রমে শিল্পায়নের সূত্রপাত হওয়ায় জীবনে যান্ত্রিকতার প্রভাব, শক্তি-অঞ্চলের প্রসার সাধারণের অস্বাস্থ্য ও অস্বস্তি বাড়িয়ে তোলে। তার উপরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি ও শিক্ষিত বেকারের সমস্যা বিশ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই এতখানি দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে এবিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে তখনই 'সপ্রু কমিটি' গঠিত হয়। দারিদ্র্য ও অন্নাভাব ১৮৯৯-১৯০০ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। এই দুর্ভিক্ষের ভস্ম-তিলক মাথায় নিয়েই আমরা বর্তমান শতাব্দীতে পদার্পণ করি। তারপরে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও পরে, ১৯২০, ২৮ সালের দুর্ভিক্ষ এবং সকলের চেয়ে বড় ১৯৪৩ সালের কুখ্যাত পঞ্চাশের মন্বন্তর শুধু বৈষয়িক জীবন নয়, আমাদের সামাজিক এবং নৈতিক জীবনকেও বিপর্যস্ত করে দেয়। এ ছাড়া কয়েক বছর অন্তর-অন্তরই বাংলা তথা ভারতের বুকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের পৈশাচিক লীলা জনজীবনকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। এইভাবে ব্রিটিশের শোষণ, দু'-দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, শিল্পায়ন ও যান্ত্রিকতা, ব্যাধি ও বেকারত্ব, দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে বিশ শতকের প্রথমার্ধে আমরা যেমন জর্জরিত, তেমনি অন্যদিকে এই দুর্দিনের মধ্যেই ভারতের জাতীয় আত্মা যেন মরিয়া হয়ে জেগে উঠে—১৯০৫এর বঙ্গ-ভঙ্গকে উপলক্ষ্য করে জাতীয় ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব হয়। দেশপ্রেমের এই মহান্ সাধকের সাধনায় 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে সঞ্চারিত হয় নবতর শক্তি। অগ্নি-যুগের সেই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধ করে, কার সাধ্য ? তারপর থেকেই বিভিন্ন পর্যায় ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত চলে

এই জাতীয় আত্মারই মুক্তি-সাধনা। এ ছাড়া বিশ শতকের এই প্রথমার্ধের চলন দুদিনের মধ্যেও কষ্টির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্ময়কর বিকাশ দেখা দেয়—বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র ও রমণ, কাব্যে রবীন্দ্রনাথ, শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, এবং সর্বোপরি যোগে, দর্শনে, রাষ্ট্রনীতি-সমাজতত্ত্ব—কাব্যসাহিত্যের নবতর দিগন্ত সন্ধানে শ্রীঅরবিন্দ এই বিকাশকে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে দেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সংস্কার ও সম্প্রসারণ ছাড়াও নানা রকমের অভিনব পরীক্ষা-নিরীক্ষাও লক্ষ্য করা যায়। আর এই পর্বে স্বাবলম্বনের জন্যে নারীসমাজের জাগরণ ও আত্মসচেতনতা এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে অবহেলিত সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান উল্লেখযোগ্য জাগরণচিহ্ন বহন করে।

এইভাবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের ইতিহাসকে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়, এই সময়টা একদিকে যেমন দুঃখ-দারিদ্র্য-ভাঙনের মধ্যে আমরা কাটিয়েছি, তেমনি অন্যদিকে স্বদেশী জাগরণ, স্বাধীনতা সংগ্রাম, শিল্পে-সাহিত্যে-বিজ্ঞানে নব-নব বিকাশও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে এও মনে হবে যে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা এক ভিন্নতর যুগে এসে পড়েছি। এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে স্বদেশের সেবায় নিরহঙ্কার আত্মত্যাগের অগ্নিশিখাটি যেন নিভে যেতে লাগল। এই শতকের প্রথমার্ধে স্বাদেশিকতার সাধনা যাঁরা করেছিলেন, দ্বিতীয়ার্ধে এসে আমরা তাঁদের মহৎ উত্তরাধিকারকে ধারণ করার সামর্থ্য যেন হারাতে লাগলাম। শতাব্দীর প্রথমার্ধে জাতীয়-জীবনে যে দ্বিধাবিভক্তি ছিল, দ্বিতীয়ার্ধে সেটিও আর রইল না। ভাঙনের পাশাপাশি সেই সাংগঠনিক প্রয়াস, শোষণের মুখোমুখি সেই মুক্তির সাধনা এখন আর নেই। এখন যেন শুধুই অবক্ষয়, অপমৃত্যু, সামাজিক শৈথিল্য, রাজনৈতিক ক্ষমতাস্পৃহা, সাংস্কৃতিক অনুর্বরতা! এ জীবন যেন হয়ে উঠেছে শুধুই 'পোড়ো জমি'—'Waste Land': আর আমরা হয়ে উঠেছি 'ফাঁপা মানুষ'—'Hollow Man'

আমাদের বর্তমানের ক্রমিক অবনতির এই যে চিত্র আমাদের আপাতদৃষ্টির সামনে ভেসে উঠে তাতে একথাও স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আমাদের আজকের দুরবস্থা একদিনে সংঘটিত হয় নি, এর জন্যে সমাজের কোন একটিমাত্র ঘটনা বা একটিমাত্র ব্যক্তিকেও দায়ী করা যায় না। তাই সাধারণ মানুষ শুধু বাহ্যদৃষ্টিতে সমস্ত কিছুকে যখন দেখে, তখন সে এই যুগ-সমস্যায় আতঙ্কিত, এর জটিলতায় বিহ্বল হয়ে পড়ে। আজ তার মনে হয়, দেশের এই নিদারুণ দুরবস্থায় চারিদিকে অন্ধকার, শুধুই নৈরাশ্য। জলাশয়ের জল যখন দূষিত হয়ে যায়, তখন সেই জলাশয়ের যে-ঘাট থেকেই জল তুলি না কেন, সে জল দূষিতই। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, রাজনীতি—সমাজের যে-ঘাট থেকেই আজ ব্যাকুল আগ্রহ অঞ্জলি ভরে তৃষ্ণার জল তুলছি, দেখছি সর্বক্ষেত্রেই এই আত্মঘাতী বিষ-স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। তাই যে সংখ্যা-গরিষ্ঠ প্রাকৃত-জন শ্রীঅরবিন্দকে এখনো শুধু বিপ্লবী 'অরবিন্দ ঘোষ' বলে জানেন, কিংবা বড় জোর তাঁকে 'ঋষি অরবিন্দ' বলে তাঁর সঙ্গে সশ্রদ্ধ দূরত্ব বজায় রেখে চলেন, অথচ তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার কথা অল্প-স্বল্প জানেন বা শুনেছেন, বর্তমান

যুগসমস্যায় তাঁদের মনে বিরাট প্রশ্ন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই আজকে শ্রীঅরবিন্দের শতবার্ষিকী-লগ্নে অনেককেই প্রশ্ন করতে শুনি আমাদের এই সর্বব্যাপী নৈরাশ্যের যুগে শ্রীঅরবিন্দের সুমহান্ আশাবাদী জীবন-দর্শনের তাৎপর্য কতটুকু? তিনি যে বলেছিলেন বিবর্তনের ফলে মানুষের মধ্যে 'মনে'রও উপরের একটি চেতনা 'অতিমানসে'র বিকাশ হবে, আজকের এই চরম অধোগতির মধ্যেও কি তার কোন সম্ভাবনা আছে? নানা দিকে পোড়-খাওয়া এই জীবনে তাঁর পূর্ণযোগ সাধনার আধার আমাদের মধ্যে কৈ? অতিমানস চেতনার আবির্ভাবের ফলে মানুষের মধ্যে থেকে পাশব বৃত্তি সব খসে যাবে, মানবজাতি দেবজাতিতে পরিণত হবে, তার কোন আভাস পাচ্ছি কি? সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাশবিক বৃত্তিই বরং আরো বেশি তাণ্ডব-নৃত্য শুরু করে দিয়েছে!—এমন দিনে শ্রীঅরবিন্দের আশাবাদ মানব-নিয়তির সামনে যে নির্মম ব্যঙ্গের মতো শোনায়। শ্রীঅরবিন্দের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি যদি নির্ভুল হয়, তবে আজকের এই যে বিকৃতি ও বিপর্যয়, শুধু পাশবিক কেন, পৈশাচিক বৃত্তিরও এই যে মাতামাতি দাপাদাপি, এর অর্থ কি? উপযোগিতা কি? যুগের এই সমস্যার কি সমাধান তিনি দিয়েছেন?

শুধু বাহ্য দৃষ্টি দিয়ে নয়, যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আমাদের জীবন ও জগতের বিবর্তনের ধারাটি একটু তলিয়ে দেখি, তা হলেই বুঝতে পারব, প্রকৃতির রাজ্যে নবসৃষ্টির অর্থই হল তার অন্তরের যা অবিনশ্বর উপাদান তাকে বজায় রেখে তার দেহ থেকে পুরাতনের খোলসটি ছেড়ে ফেলা, নতুনকে বরণ করা এবং নিজের ভিতর থেকে নতুনতর সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু সাপের খোলসটি ছাড়ার আগে সেটি পুরু হওয়া চাই, পাকা হওয়া চাই। প্রকৃতিও যে খোলসটি ছাড়ে তাকে সে আগে পুরু করে নেয়, পুষ্ট করে নেয়। তাই যে সব বৃত্তিকে সে চিরকালের মতো ঝেড়ে ফেলতে চায়, তাদের বিদায়ের আগে তাদের সে পুষ্ট করে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দ এর মধ্যে দেখেছেন এক নবজন্মের শুভ ইঙ্গিত। প্রকৃতির এই ক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করে তিনি লিখেছেন

"ক্রমবিকাশের কোন একটি বিশেষ পর্ব যখন শেষ হইতে চলিয়াছে তখন দেখা যায় তাহার ভিতর হইতে যে সব জিনিস চলিয়া যাইবেই, ঠিক সেইগুলিই নূতন বল সঞ্চয় করিয়া ফিরিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, মানুষের ব্যষ্টিগত ও ব্যক্তিগত কোন গভীর সংস্কার বা তীব্র প্রেরণাকে তাড়াইতে হইলে, আগে সে জিনিসটি ভোগের দ্বারা নিস্তেজ করিয়া আনিতে হয়, এবং শেষে সংযমের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার দ্বারা তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া দিতে হয়।" (শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্তের অনুবাদ, 'কালি-কলম', ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত)।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অনন্যসুলভ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, মানুষের জীবনের যত বিকৃতি, যত স্খলন, তার মূলে প্রধানত তিনটি বৃত্তি ক্রিয়াশীল—ক্ষমতাস্পৃহা, অর্থলোভ আর যৌনকামনা "...power, wealth, sex...have the strongest attraction for the human ego and the Asura and are most

generally misheld and misused by those who retain them." (Sri Aurobindo : 'The Mother,' Ch. IV). সুতরাং মানুষের পূর্ণ দেবায়ন সাধন করার জন্যে এই তিনটি বৃত্তির মূলে সর্বাগ্রে কুঠারাঘাত করা দরকার। এই জন্যে প্রথমে এদের 'ভোগের দ্বারা নিস্তেজ' করে 'শেষে সংযমের দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উদাসীনতার দ্বারা' প্রকৃতি এদের ঝেড়ে ফেলতে চাইছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের পরবর্তী ধাপে এদের আর কোন স্থান নেই, তাই চলে যাবার আগে এরা 'নতুন বল সঞ্চয়' করে ফিরে দাঁড়িয়েছে। এই কারণে আজ সারা পৃথিবীতেই দেখছি এই তিনটি বৃত্তির প্রচণ্ড আস্ফালন। যুগের জীবনকে এরা প্রধানত তিন দিক থেকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। রাজনীতিতে ক্ষমতার লড়াই, অর্থনীতিতে অর্থকেন্দ্রিক সংগ্রাম—যাকে আধুনিকেরা বলছেন 'শ্রেণীসংগ্রাম—সমাজনীতিতে যৌনবৃত্তির কূলপ্লাবন—সাহিত্যে যার ঘটেছে ব্যাপক প্রতিফলন। অবশ্য এই তিন বৃত্তি প্রাচীন কালে ছিল না, আজই হঠাৎ দেখা দিয়েছে, এমন নয়। 'কামিনী-কাঞ্চনের কথা ভেবে পিতামহেরা কম শঙ্কিত ছিলেন না, আর রাজায়-রাজায় ক্ষমতার লড়াই কোন্ কালে ছিল না? কিন্তু এত কাল জীবনও ছিল, এসব বৃত্তিও ছিল তার অঙ্গীভূত হয়ে। আজ জীবন যখন এদের ঝেড়ে ফেলতে চাইছে, তখন এরাও সমুখ সমরে অবতীর্ণ। এর কারণই হল এদের শেষ বিদায়ের দিন আসন্ন, চলে যাবার আগে এই যুদ্ধং দেহি হুংকার। এবং এই চরম মুহূর্তে আমাদেরও রুখে দাঁড়ানো ছাড়া অন্য পন্থা নেই। এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে আমাদের দিব্য-সারথি যে নির্দেশটি দিয়েছেন সেটি হল :

> "যুদ্ধ যতই কঠোর হোক, একমাত্র উপায় এখনই ও এইখানেই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যুদ্ধ সাঙ্গ করা।"
>
> —শ্রীঅরবিন্দ 'যোগসাধনার ভিত্তি' ১৩৫৭, পৃঃ ৫৫

সুতরাং আমাদের সমাজজীবনের চারদিকে এই যে সামগ্রিক ভাঙন ও বিনষ্টির কালো ছায়া দেখা দিয়েছে, হয় তো এটা প্রকৃতিরই নির্মম বিধান। এই নির্মম বিধানটি যদি এড়াতে চাই, তা হলে একমাত্র উপায় হল—প্রকৃতির অন্তরের নির্দেশটি কান পেতে শোনা, স্রষ্টার হাতে তাঁর নতুন সৃষ্টির জন্যে নরম নমনীয় উপাদান হয়ে থাকা যাতে তিনি যে ছাঁচে ইচ্ছা সেই ছাঁচেই আমাদের ঢালতে পারেন। সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁরই শরণাগত হতে হবে যাতে আমাদের পুরানো ধর্ম-সমাজ-নীতি-আদর্শের কোন ছাঁচ তাঁর কাজে বাধা না দেয়। এ ছাড়া প্রকৃতির সেই নির্মম বিধান, সেই ভাঙন ও বিনষ্টি এড়াবার অন্য কোনো পথ নেই—নান্যঃ পন্থা...

34-2665 Gram :

For Quality

Printing and Card Board Box Marketing

Contact

Universal Card Board Box Factory

54, EZRA STREET.
CALCUTTA—1

আমার দৃষ্টিতে
শ্রীঅরবিন্দের দি লাইফ ডিভাইন

শম্ভু ভদ্রের অনুবাদ

প্রথম খণ্ড :	প্রথম চার অধ্যায়	দাম—২·০০
দ্বিতীয় খণ্ড :	পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়	২·০০
তৃতীয় খণ্ড :	সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়	২·০০
চতুর্থ খণ্ড :	নবম ও দশম অধ্যায়	২·০০
পঞ্চম খণ্ড	একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়	২·০০
ষষ্ঠ খণ্ড.	ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়	২·০০
সপ্তম খণ্ড :	পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ অধ্যায়	২·০০

(নিয়মিতভাবে খণ্ডে খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে)

—প্রাপ্তিস্থান—

চট্টোপাধ্যায় ব্রাদার্স
১৩১-১ এ-বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

অথবা

শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২

It is the darkest nights that prepare the greatest dawn.
—Sri Aurobindo

Universal Box Manufacturers

Card Board Box Manufacturers
Printers & Block Makers
149, Sri Aurobindo Sarani
Calcutta-6
(Old No.—80/1/8, Grey Street)
Gram : UNIBOX Phone :

It is in a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing interest in life. There is no other satisfying way.

—Sri Aurobindo

Howrah Iron and Steel Works Ltd.

90, BENARAS ROAD,
HOWRAH.
Phone : 66-2434

আপনার সঞ্চয়

—তা যত অল্প
বা বেশি হোক না কেন
তার থেকে
আপনার আয়

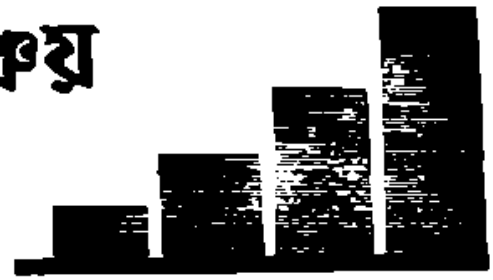

আরও বাড়িয়ে তুলুন

UIB

কয়েকটি
পরিকল্পনা

৭¾%
সুদ পেতে হ'লে
৫ বছরের অধিক মেয়াদী
ফিক্সড্
ডিপোজিটে
লগ্নী করুন।

প্রতি মাসে ১০৲
সঞ্চয় ক'রে ৭ বছর
পরে ১০৯৫৲
রেকারিং ডিপোজিট
এ্যাকাউন্ট
খুলে পেতে পারেন।

১০০৲ টাকার
ক্যাশ সার্টিফিকেট
কিনলে
২০ বছর পরে
৪২৫৲ টাকা
পাবেন।

পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস : ৭, ওল্ডকোর্ট হাউস, কলিকাতা-১
টেলিফোন : ২৩-১৭৮৪ (৩ লাইন)

Progressive/UIB- 13/70

COMPLETE WORKS
OF
SRI AUROBINDO

Centenary Volumes

De Luxe *Rs. 1000.00*
Popular *Rs. 750.00*

SRI AUROBINDO ASHRAM PRESS

PHONE : 47-2869

S. N. PAUL & CO.

High Class Brick Manufacturers & Contractors

Brick Field:
SREEPORE BAGHARGHOLE
P. O. BONHOOGHLY, 24 PARGANAS

Head Office:
34/1, Puddapukur Road
CALCUTTA 20